Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৮তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০১৫

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৫ সংখ্যা

মাসিক

আত-তাহরীক

১৮তম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা এপ্রিল ২০১৫

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

আহলেহাদীছ তাবলীগী ইজতেমা

‘ইজতেমা’ অর্থ সম্মেলন। আরবীতে বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটি ইসলামী সম্মেলন। অতঃপর ‘আহলেহাদীছ’ বলার মাধ্যমে এর অর্থ হবে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ সংগঠন কর্তৃক প্রচারিত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ-এর আলোকে জীবন গড়ায় বিশ্বাসী ঈমানদার মুসলমানদের সম্মেলন। যা প্রতি বছর একবার তার সাথী ও অনুসারীদের একত্রিত করে। যার মাধ্যমে তারা উদ্বুদ্ধ হয় এবং নতুনভাবে এগিয়ে যাবার প্রেরণা লাভ করে। দেহ-মন ঈমানী জ্যোতিতে আলোকিত হয় ও সেই আলোকে জীবন পথে পদচারণা করে। ‘তাবলীগ’ অর্থ পৌঁছে দেওয়া, প্রচার করা। ইসলামকে তার যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গরূপে জাতির সম্মুখে পেশ করাই হ’ল ‘আহলেহাদীছ তাবলীগী ইজতেমা’র মৌলিক উদ্দেশ্য।

জাতির নিকটে এ সংগঠনের পরিষ্কার বক্তব্য হ’ল, ‘আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবেনা প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ। থাকবেনা ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ’। নেতৃবৃন্দের প্রতি এ সংগঠনের আকুল আবেদন, ‘সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর’। জনগণের প্রতি দরদভরা আহ্বান, ‘আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি’। এ সংগঠনের তাবলীগী ইজতেমায় মানুষকে ‘তাওহীদে ইবাদাত’-এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। যাতে মানুষ শয়তানের দাসত্ব ছেড়ে আল্লাহ্র দাসত্ব করে। যাতে মানুষ রাজনীতির নামে আল্লাহ্র দাসত্ব বাদ দিয়ে মানুষের দাসত্ব না করে। আল্লাহ্র বিধান ছেড়ে মানুষের মনগড়া বিধানের মাধ্যমে নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত না হয়। যাতে মানুষ ইসলামের শোষণমুক্ত ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক অর্থনীতি ছেড়ে রক্তচোষা পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী অর্থনীতির যাঁতাকলে পিষ্ট না হয়। যাতে মানুষ ধর্মের নামে ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা ও অলৌকিক কিচ্ছা-কাহিনীর ফাঁদে ফেলে মৃত মানুষের দাসত্ব না করে এবং আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে নিজেদের মনগড়া অন্ধ

বিশ্বাস ও সামাজিক কুসংস্কারের গোলামী না করে। এক কথায়, মানুষ যেন তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হয় এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝকে অগ্রাধিকার দেয়।

আহলেহাদীছ ইজতেমার উপরোক্ত দাওয়াত দৃঢ়চিত্ত প্রকৃত ঈমানদারগণের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত হানে। হোনায়েন যুদ্ধে বিপদগ্রস্ত রাসূল (ছাঃ)-এর ডাকে যেমন ভক্ত ছাহাবীগণ এমনকি বাহন ছেড়ে পায়ে হেঁটে দৌড়ে চলে এসেছিলেন, স্বচ্ছ ঈমানের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী ষড়যন্ত্রে বিপদগ্রস্ত মুমিন নর-নারীগণ তেমনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অমিয়বাণী শুনে পথ পাওয়ার জন্য আহলেহাদীছ ইজতেমায় ছুটে আসে। বহু মানুষ তাদের লালিত বিশ্বাস ও গোঁড়ামি ছেড়ে তওবা করে ফিরে আসে আল্লাহ্র পথে। এভাবে জান্নাত থেকে নেমে আসা আদম সন্তান যখন জান্নাতী রাস্তার সন্ধান পায়, তখন সবকিছু ছেড়ে সে এপথেই চলে আসে। আহলেহাদীছ তাবলীগী ইজতেমার সফলতা এখানেই।

এই ইজতেমায় শ্রোতা হিসাবে সকল মানুষের প্রবেশাধিকার রয়েছে, যদি তিনি আল্লাহ্র পথের হেদায়াত কামনা করেন। দেশে প্রচলিত অগণিত ইজতেমা ও সম্মেলনের মধ্যে এই ইজতেমার পৃথক বৈশিষ্ট্য সমূহ রয়েছে। এই ইজতেমা মানুষকে ফিরক্বা নাজিয়াহ্র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানায়। যারা শুরুতেই জান্নাতী হবে। শিরক ও বিদ‘আতে নিমজ্জিত মুসলমানরা জাহান্নামের শাস্তিভোগ শেষে কালেমার বরকতে আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে জান্নাতী হবেন। কিন্তু আহলেহাদীছগণ শিরক ও বিদ‘আত মুক্ত জীবন-যাপনের মাধ্যমে শুরুতেই জান্নাতী হওয়ার দৃঢ় আশা পোষণ করেন। সেই সাথে তারা অন্য ভাইদেরকেও স্বচ্ছ জীবনের প্রতি আহ্বান জানান। বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা উক্ত আহ্বান জানানোর একটি মহতী সুযোগ।

আহলেহাদীছগণ ক্বিয়ামত অবধি হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে এবং মানুষকে হক-এর পথে আহ্বান জানাবে। স্বার্থান্ধ মানুষ সর্বদা বাধা সৃষ্টি করলেও আল্লাহ্র রহমতে এ দলই চির বিজয়ী থাকবে। আর প্রকৃত বিজয় হ’ল আখেরাতের বিজয়। দুনিয়ার বিজয় নয়। সংখ্যা ও শক্তি কখনোই সত্যের মাপকাঠি নয়। সত্য সেটাই যা আমাদের রবের কাছ থেকে আসে। আর তা হ’ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। যার অনুসারী প্রথম দল হ’লেন ছাহাবায়ে কেরাম। অতঃপর তাঁদের শিষ্য তাবেঈনে এযাম। অতঃপর তাঁদের শিষ্য তাবে তাবেঈগণ এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসারী আহলেহাদীছগণ। এ নাম আমাদের বৈশিষ্ট্যগত নাম। যা অন্য মুসলমান থেকে আমাদের স্বতন্ত্র করে দেয়। যেমন সর্বত্র বাতিলপন্থী থেকে হকপন্থীরা স্বতন্ত্র থাকে।

আহলেহাদীছগণ কখনোই চরমপন্থী বা শৈথিল্যবাদী হন না। তারা সর্বদা মধ্যপন্থী হন ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেন। পরিবর্তিত যেকোন পরিস্থিতিতে তারা দৃঢ়চিত্ত থাকেন। পরিস্থিতি তাদেরকে পরিবর্তন করতে পারে না। বরং তারাই পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করেন। তারা কখনোই পরাজিত হন না। বরং সর্বদা বিজয়ী থাকেন। হক-এর দাওয়াত দিতে গিয়ে যেকোন নির্যাতনকে তারা হাসিমুখে বরণ করেন এবং তাকে আল্লাহ্র পরীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করেন। তারা স্রোতে ভেসে যান না, বরং স্রোতকে পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। তাই তাদেরকে সর্বদা সংগ্রামী জীবন যাপন করতে হয়। আর সেজন্যই তারা আল্লাহ্র হুকুমে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ইমারতের অধীনে সংঘবদ্ধ থাকেন। ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ এ দেশে ফিরক্বা নাজিয়াহ্র সাংগঠনিক রূপ মাত্র। আহলেহাদীছ তাবলীগী ইজতেমা তাদেরই বার্ষিক কেন্দ্রীয় মিলন মেলা। জান্নাত পাগল সকল মানুষকে অত্র ইজতেমায় স্বাগত জানানো হয়।

বর্তমানে রাজশাহী কেন্দ্র থেকেই এ দাওয়াত বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হচ্ছে। দেশে ও প্রবাসে জানা ও অজানা সকল মানুষের নিকট এ ইজতেমার উদাত্ত আহ্বান, আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি’। আসুন! জান্নাতের পথে ফিরে চলি। আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল কর- আমীন! *(স.স.)*।

দ্বীনের উপর দৃঢ়তা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ- نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ- نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ-

অনুবাদ : 'নিশ্চয় যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। অতঃপর তাতে অবিচল থাকে। তাদের উপর ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর'। 'ইহকালীন জীবনে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা দাবী করবে'। 'সেটি হবে আপ্যায়ন ক্ষমাশীল ও দয়াবানের পক্ষ হ'তে' *(ফুছ্ছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩০-৩২)*।

ইস্তেক্বামাত (الاستقامة) অর্থ দৃঢ়তা, স্থিরতা। এখানে অর্থ আল্লাহ্র দ্বীনের উপর এখলাছের সাথে দৃঢ় থাকা। তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। সুখে-দুখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর খুশী থাকা ও তাঁর উপর ভরসা করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার জন্য আল্লাহ ও তাঁর বিধানসমূহের উপর ইস্তেক্বামাত বা দৃঢ়চিত্ততা সর্বাপেক্ষা যরূরী। এটা হবে বিশ্বাসে, কথায় ও কর্মে। বিশ্বাসে দৃঢ়তা না থাকলে কথায় ও কর্মে দৃঢ়তা থাকে না। সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ ছাক্বাফী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কথা বলে দিন যে, আপনার পরে আমাকে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে না হয়। জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ 'তুমি বল আমি আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতঃপর এর উপর দৃঢ় থাক'।[1] অর্থাৎ তুমি স্রেফ আল্লাহ্র উপরে ভরসা কর। অন্যকে শরীক করো না। আর আল্লাহ্র বিধান সমূহ মেনে চলার ব্যাপারে দৃঢ় থাক। দুনিয়াবী স্বার্থের সাথে আপোষ করো না। আল্লাহ বলেন, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ- 'তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিচার-ফায়ছালা কামনা করে? অথচ দৃঢ় বিশ্বাসীদের নিকট আল্লাহ্র চাইতে উত্তম ফায়ছালাকারী আর কে আছে?' *(মায়েদাহ ৫/৫০)*।

এতে বুঝা গেল যে, বিশ্বাসের মধ্যে এখলাছ না থাকলে কথা ও কর্ম কোনটাই আল্লাহ্র কাছে কবুল হবে না। বান্দার কাছেও প্রথমদিকে চটকদার মনে হ'লেও অবশেষে তা কবুল হবে না। ফলে ঐ ব্যক্তি ইহকালে ও পরকালে ব্যর্থ হবে।

চার প্রকারের মানুষ :

সমাজে চার ধরনের মানুষ রয়েছে। দৃঢ় বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, কপট বিশ্বাসী ও শিথিল বিশ্বাসী। অবিশ্বাসীরা দিশাহীন পথিক। ওরা পথভ্রষ্ট। ওদের আচরণ পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট। কপট বিশ্বাসীরা সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানী। এরা বলে এটাও ঠিক, ওটাও ঠিক। এরা মানুষের ঘৃণার পাত্র। এরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে। শিথিল বিশ্বাসীরা ভীরু ও কাপুরুষ। এরা সর্বদা অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। সমাজে এদের সংখ্যাই বেশী।

প্রথমোক্ত লোকেরাই সমাজের নেতা ও পরিচালক। তারা যদি প্রবৃত্তি পূজারী হয় ও তার উপর দৃঢ় থাকে, তাহ'লে তারা হয় হঠকারী ও সমাজ ধ্বংসকারী। পক্ষান্তরে তারা যদি আল্লাহভীরু হয় এবং আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের উপর দৃঢ় থাকে, তাহ'লে তারা হয় সমাজের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। অনেক সময় অনেক দ্বীনদার মানুষকে চরমপন্থী হ'তে দেখা যায়। এটা হয়ে থাকে তাদের দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে। এদের থেকে বেঁচে থাকার জন্য রাসূল (ছাঃ) উম্মতকে সাবধান করে গেছেন'।[2] শৈথিল্যবাদীদের অবস্থা আরও করুন। উভয় দল হ'তে দূরে থেকে সর্বদা মধ্যপন্থী আহলুল হাদীছ হ'তে হবে।

আল্লাহ তাঁর পথকে 'মুস্তাক্বীম' বলেছেন। যার অর্থ সরল ও সুদৃঢ়। তিনি বলেন, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ- 'আর এটিই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ করে দেবে। এসব বিষয় তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা (ভ্রান্ত পথ সমূহ থেকে) বেঁচে থাকতে পার' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।

আল্লাহ্র পথ সুদৃঢ়। যা ভঙ্গুর নয়, পরিবর্তনশীল নয়, বরং সদা মযবুত এবং অপরিবর্তনীয়। যা কারু অনুগামী হবে না। বরং সবাই তার অনুসারী হবে। যা যুগের হাওয়ায় পরিবর্তন হয় না। বরং যুগকে সে পরিবর্তন করে। অতএব ছিরাতে মুস্তাক্বীমের অনুসারীদের জন্য দ্বীনের উপর ইস্তিক্বামাত বা দৃঢ়তা অপরিহার্য। নইলে তার উক্ত দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে।

বস্তুতঃ দ্বীনের উপর দৃঢ়তাই হ'ল মূল বস্তু। এটা ব্যতীত কোন কিছুই অর্জিত হয় না। এজন্য আল্লাহ তার নবীকে নির্দেশ দেন, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ- 'অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ

১. আহমাদ হা/১৫৪৫৪; মুসলিম হা/৩৮ 'ঈমান' অধ্যায়।

২. বুখারী হা/৩৩৪৪।

সেভাবে দৃঢ় থাক এবং যারা তোমার সাথে (শিরক ও কুফরী থেকে) তওবা করেছে তারাও। আর তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের সকল কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন' *(হূদ ১১/১১২)*।

আবু বকর (রাঃ) একবার রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। জওয়াবে তিনি বললেন, شَيَّبَتْنِى هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلاَتُ وَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ– 'আমাকে বৃদ্ধ করেছে সূরা হূদ, ওয়াক্বি'আহ, মুরসালাত, নাবা, তাকভীর প্রভৃতি সূরাগুলি।'[৩] অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকতে গিয়ে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ সমূহ যথাযথভাবে পালন করতে গিয়ে শয়তানের মোকাবিলায় দৃঢ়চেতা মুমিনকে প্রতি পদে পদে জিহাদ করতে হয়। এভাবেই সে আল্লাহ্‌র পথে মুজাহিদ হিসাবে শহীদী মৃত্যু বরণ করে। যেভাবে আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেন, সেভাবেই সে খুশী থাকে। যদিও সে মৃত্যু তার ঘরের বিছানায় হয় (وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হ'ল সে ব্যক্তি শহীদ এবং যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় মৃত্যু বরণ করল সে ব্যক্তি শহীদ'।[৪]

দুনিয়াবী লাভ :

ইস্তেক্বামাতের দুনিয়াবী লাভ হ'ল ফেরেশতারা তার বন্ধু হবে। যারা আল্লাহ্‌র হুকুমে সর্বাবস্থায় তাকে সাহায্য করবে। আর ফেরেশতা যার সাহায্যকারী হবে, দুনিয়া তার গোলাম হবে। বিভিন্ন বিপদাপদে মুমিন-মুত্তাক্বীগণ অলৌকিকভাবে আল্লাহ্‌র গায়েবী মদদ পেয়ে থাকেন। যা ইতিপূর্বে তাদের কল্পনায়ও ছিল না। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন' *(তালাক্ব ৬৯/৩)*। তিনি বলেন, كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ 'আর এভাবেই আমাদের কর্তব্য হল ঈমানদারগণকে নাজাত দেওয়া' *(ইউনুস ১০/১০৩)*। অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে ও সেই সাথে ঈমানদার নর-নারীকে নিশ্চিত সান্ত্বনাবাণী শুনিয়েছেন যে, সকল যুগে এটাই আল্লাহ্‌র রীতি ও কর্তব্য যে, তিনি ঈমানদারগণকে নাজাত দেন ও কাফের-বেঈমানদের ধ্বংস করেন। সাময়িকভাবে মিথ্যা জয়ী হলেও সত্য চিরকাল বিজয়ী।

পরকালীন লাভ :

দুনিয়াবী জীবন শেষে আখেরাতের পথে যাত্রার পূর্বক্ষণে মৃত্যুকালে ফেরেশতারা এসে বলবে, لاَ تَخَافُوا 'ভয় পেয়োনা'। ইতিপূর্বে তুমি আল্লাহ্‌র জন্য এখলাছের সাথে নেক আমল করেছ। এখন তুমি তার প্রতিদান পাবে। তারা বলবে وَلاَ تَحْزَنُوا 'চিন্তান্বিত হয়ো না'। দুনিয়ায় যে সন্তান-সন্ততি রেখে যাচ্ছ, আল্লাহ্‌র হুকুমে আমরাই তাদের পৃষ্ঠপোষক হব। তাছাড়া যেসব গোনাহ তোমার রয়েছে, সব আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ তুমি জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের আগেই দেওয়া হয়েছে'।

কুরআনের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত হাদীছ দু'টিতে পাওয়া যায়। (ক) আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ. قَالَ لَيْسَ ذَاكَ كَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حُضِرَ جَاءَهُ الْبَشِيرُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ فَلَيْسَ شَىْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ لَقِىَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْفَاجِرَ أَوِ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ جَاءَهُ بِمَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرِّ أَوْ مَا يَلْقَاهُ مِنَ الشَّرِّ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ–

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাতকে ভালবাসে, আল্লাহ তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ অপসন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাতকে অপসন্দ করেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা সবাই মৃত্যুকে অপসন্দ করি। তিনি বললেন, মৃত্যুকে অপসন্দের বিষয়টি নয়। বরং মুমিনের কাছে যখন মৃত্যু এসে যায়, তখন মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন সুসংবাদদাতা ফেরেশতা তার নিকটে আগমন করে, ঐ বস্তু নিয়ে যা তার নিকটে পৌঁছানোর যোগ্য। তখন তার নিকটে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাতের চাইতে প্রিয়তর বস্তু আর কিছুই থাকেনা। অতঃপর আল্লাহ তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন। পক্ষান্তরে পাপাচারী অথবা অবিশ্বাসী ব্যক্তির যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ফেরেশতা তার নিকটে মন্দ কিছু নিয়ে আগমন করেন। তখন সে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাতকে অপসন্দ করে। ফলে আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপসন্দ করেন'।[৫]

(খ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন,

---

৩. তিরমিযী হা/৩২৯৭, সনদ জাইয়িদ; হাকেম হা/৩৩১৪, হাদীছ ছহীহ।
৪. মুসলিম হা/১৯০৯; মিশকাত হা/৩৮১১।
৫. আহমাদ হা/১২০৬৬, সনদ ছহীহ।

الْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلاَئِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوا : اخْرُجِى أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِى الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اخْرُجِى حَمِيدَةً وَأَبْشِرِى بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هَذَا فَيَقُولُونَ فُلاَنٌ. فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِى الْجَسَدِ الطَّيِّبِ ادْخُلِى حَمِيدَةً وَأَبْشِرِى بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ. فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِى فِيهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ–

‘মৃত্যু পথযাত্রী সৎকর্মশীল মুমিনের নিকট ফেরেশতারা হাযির হয়ে বলেন, বেরিয়ে এস হে পবিত্র আত্মা! যা পবিত্র দেহে ছিল। বেরিয়ে এস প্রশংসিতভাবে। সুসংবাদ গ্রহণ কর শান্তি ও সুগন্ধির এবং সেই প্রতিপালকের যিনি ক্রুদ্ধ নন। এভাবেই তারা বলতে থাকবেন। অবশেষে রূহ বেরিয়ে আসবে। অতঃপর তাকে নিয়ে তারা আসমানে চলে যাবেন। তখন তার জন্য দরজা খোলার অনুমতি চাওয়া হবে। বলা হবে, কে এই ব্যক্তি? ফেরেশতারা বলবেন, অমুক। বলা হবে পবিত্র আত্মার প্রতি মারহাবা। যা পবিত্র দেহে ছিল। প্রবেশ করুন! প্রশংসিতভাবে। সুসংবাদ গ্রহণ করুন! শান্তি ও সুগন্ধির এবং ঐ প্রতিপালকের যিনি ক্রুদ্ধ নন। এভাবেই তাকে বলা হবে। অবশেষে তারা সেই সর্বোচ্চ স্থানে উপস্থিত হবেন, যেখানে মহান আল্লাহ রয়েছেন’...।[৬]

যায়েদ বিন আসলাম বলেন, এইভাবে ফেরেশতাগণ তাকে সুসংবাদ দিবেন তার মৃত্যুর সময়, তার কবরে এবং তাকে পুনরুত্থানের সময়’। এমনকি তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেওয়া ও সেখানে গিয়ে তার সেবা-যত্ন করা সবই ফেরেশতারা করবেন।

কয়েকজন দৃঢ়চিত্ত মুমিনের দৃষ্টান্ত

(১) খোবায়েব বিন ‘আদী : ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে প্রেরিত ১০ জন মুবাল্লিগ দলের তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। দাওয়াতকারীরা বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তাদের সবাইকে হত্যা করে। খোবায়েব ও যায়েদ বিন দাছেনাকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা না করে মক্কায় কাফেরদের নিকট বিক্রি করে দেওয়া হয়। সেখানে তাদেরকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়। শূলে চড়ার আগে খোবায়েব দু’রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করেন এবং বলেন, ‘আমি ভীত হয়েছি’ এই অপবাদ তোমরা না দিলে আমি দীর্ঘক্ষণ ছালাত আদায় করতাম। তিনিই প্রথম এই সুন্নাতের সূচনা করেন। অতঃপর তিনি কাফেরদের প্রতি বদ দো‘আ করেন এবং মর্মন্তুদ কবিতা পাঠ করেন। তাঁর পঠিত দশ লাইন কবিতার বিশেষ দু’টি লাইন ছিল নিম্নরূপ-

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا + عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي
وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ + يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

‘আর আমি যখন মুসলিম হিসাবে নিহত হই তখন আমি কোন পরোয়া করি না যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমাকে কোন্ পার্শ্বে শোয়ানো হচ্ছে’। ‘আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই আমার মৃত্যু হচ্ছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার খণ্ডিত টুকরা সমূহে বরকত দান করতে পারেন’।[৭]

মৃত্যুর পূর্বে খোবায়েবের শেষ বাক্য ছিল- اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ بَلَّغْنَا رِسَالَةَ رَسُولِكَ، فَبَلِّغْهُ الْغَدَاةَ مَا يُصْنَعُ بِنَا– ‘হে আল্লাহ, আমরা তোমার রাসূলের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছি। এক্ষণে তুমি তাঁকে আমাদের সাথে যা করা হচ্ছে, সে খবরটি কাল সকালে পৌঁছে দাও’।

ওমর (রাঃ)-এর গবর্ণর সাঈদ বিন আমের (রাঃ) যিনি খোবায়েবের হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তিনি উক্ত মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণ করে মাঝে-মধ্যে বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। তিনি বলতেন, খোবায়েবের নিহত হবার দৃশ্য স্মরণ হ’লে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। আল্লাহ্‌র পথে কতবড় ধৈর্যশীল তিনি ছিলেন যে, একবার উহ্ পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। বন্দী অবস্থায় তাঁকে থোকা থোকা আঙ্গুর খেতে দেখা গেছে। অথচ ঐসময় মক্কায় কোন আঙ্গুর ছিল না’।

(২) যায়েদ বিন দাছেনাহ : তাকে হত্যার পূর্বে আবু সুফিয়ান তাকে বললেন, তুমি কি এটাতে খুশী হবে যে, তোমার স্থলে আমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করি এবং তুমি তোমার পরিবার সহ বেঁচে থাক? তিনি বলেন, وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا الْآنَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ تُؤْذِيهِ– ‘আল্লাহ্‌র কসম! আমি চাই না যে, আমার স্থলে মুহাম্মাদ আসুক এবং তাকে একটি কাঁটারও আঘাত লাগুক’। হারাম এলাকা থেকে বের করে ৬ কিঃ মিঃ উত্তরে ‘তানঈম’ নামক স্থানে তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়।[৮]

(৩) খাব্বাব ইবনুল আরাত : বনু খোযা‘আ গোত্রের জনৈকা মহিলা উম্মে আনমার-এর গোলাম ছিলেন। তিনি কর্মকারের কাজ করতেন। প্রথম দিকের ইসলাম প্রকাশকারী এবং ষষ্ঠ মুসলমান ছিলেন। মুসলমান হওয়ার অপরাধে মুশরিক নেতারা তার উপরে লোমহর্ষক নির্যাতন চালায়। নানাবিধ অত্যাচারের মধ্যে সবচাইতে মর্মান্তিক ছিল এই যে, তাকে

৬. ইবনু মাজাহ হা/৪২৬২; মিশকাত হা/১৬২৭, ‘জানায়েয’ অধ্যায়।

৭. বুখারী হা/৩০৪৫, ৩৯৮৯; ইবনু হিশাম ২/১৭৬।
৮. বিস্তারিত দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩৫৮-৫৯ পৃঃ।

Contents

জ্বলন্ত লোহার উপরে চিৎ করে শুইয়ে বুকের উপরে পাথর চাপা দেওয়া হয়েছিল। ফলে পিঠের চামড়া ও মাংস গলে অঙ্গার নিভে গিয়েছিল। নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গমন করেন। তখন তিনি কা'বা চত্বরে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে কাফেরদের বিরুদ্ধে বদ দো'আ করার জন্য আকুলভাবে দাবী করেন। তখন উঠে রাগতঃস্বরে রাসূল (ছাঃ) তাকে দ্বীনের জন্য বিগত উম্মতগণের কঠিন নির্যাতন ভোগের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং বলেন, كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ- 'তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহের লোকদের মাথার মাঝখানে করাত রেখে দেহকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। কিন্তু তা তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাদের দেহ থেকে লোহার চিরুনী দিয়ে গোশত ও শিরাসমূহ হাড্ডি থেকে পৃথক করে ফেলা হয়েছে। তথাপি এগুলি তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। মনে রেখ, 'আল্লাহর কসম! অবশ্যই তিনি এই ইসলামী শাসনকে এমনভাবে পূর্ণতা দান করবেন যে, একজন আরোহী (ইয়ামনের রাজধানী) ছান'আ থেকে হাযারা মাউত পর্যন্ত একাকী ভ্রমণ করবে, অথচ সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে না। অথবা তার ছাগপালের উপরে নেকড়ের ভয় করবে। কিন্তু তোমরা বড়ই ব্যস্ততা দেখাচ্ছ'।[৯] এ হাদীছ শোনার পরে তার ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) একদিন খাব্বাবকে ডেকে বলেন, তোমার উপরে নির্যাতনের কাহিনী আমাকে একটু শুনাও। তখন তিনি নিজের পিঠ দেখিয়ে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার পিঠ দেখুন। আমাকে জ্বলন্ত লোহার আগুনের উপরে চাপা দিয়ে রাখা হ'ত। আমার পিঠের মাংস গলে উক্ত আগুন নিভে যেত'। তখন ওমর (রাঃ) বলেন, এরূপ দৃশ্য আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি'। তিনি ছিফফীন ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধে আলী (রাঃ)-এর পক্ষে ছিলেন। ছিফফীন যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরে আলী (রাঃ) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বদর-ওহোদসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন'।

পরবর্তীতে খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ)-এর কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আলী (রাঃ) তার জন্য দো'আ করে বলেন, رَحِمَ اللهُ خَبَّابًا، لَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِبًا، وَهَاجَرَ طَائِعًا، وَعَاشَ مُجَاهِدًا، وَابْتُلِيَ فِي جِسْمِهِ أَحْوَالاً، وَلَنْ يُضَيِّعَ اللهُ أَجْرَهُ- 'আল্লাহ রহম করুন খাব্বাবের উপর, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আগ্রহের সাথে, হিজরত করেছিলেন আনুগত্যের সাথে, জীবন যাপন করেছেন মুজাহিদ হিসাবে, নির্যাতিত হয়েছেন দৈহিক ভাবে বিভিন্ন অবস্থায়। অতএব কখনোই আল্লাহ তার পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না'।

ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর আমলে যখন মুসলমানদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তখন অগ্রবর্তী মুহাজির হিসাবে খাব্বাব (রাঃ)-এর জন্য বড় অংকের রাষ্ট্রীয় ভাতা নির্ধারণ করা হয়। যাতে তিনি বহু সম্পদের অধিকারী হন এবং কূফাতে বাড়ি করেন। এসময় তিনি একটি কক্ষে অর্থ জমা রাখতেন। যা তার সাথীদের জানিয়ে দিতেন। অতঃপর অভাবগ্রস্তরা সেখানে যেত এবং প্রয়োজনমত নিয়ে নিত। তিনি বলতেন, وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَمْلِكُ دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَإِنَّ فِي نَاحِيَةِ بَيْتِي فِي تَابُوتِي لأَرْبَعِينَ أَلْفِ وَافٍ. وَلَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا- 'আমি যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম, তখন আমি একটি দীনার বা দিরহামেরও মালিক ছিলাম না। আর এখন আমার সিন্দুকের কোণায় চল্লিশ দীনার জমা আছে। আমি ভয় পাচ্ছি আল্লাহ আমার সকল নেক আমলের ছওয়াব আমার জীবদ্দশায় আমার ঘরেই দিয়ে দেন কি-না!'। মৃত্যুর সময় তাকে পরিচর্যাকারী জনৈক সাথী বললেন, أَبْشِرْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَإِنَّكَ مُلاَقٍ إِخْوَانَكَ غَدًا- 'হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কেননা কালই আপনি আপনার সাথীদের সঙ্গে মিলিত হবেন'। জবাবে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ذَكَّرتموني أقواماً، وإخواناً مَضَوْا بِأُجُورهم كُلِّهَا لَمْ يَنالُوا مِن الدُّنيا شَيْئًا- 'তোমরা আমাকে এমন ভাইদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, যারা তাদের সম্পূর্ণ নেকী নিয়ে বিদায় হয়ে গেছেন। দুনিয়ার কিছুই তারা

৯. বুখারী হা/৩৬১২, ৬৯৪৩; মিশকাত হা/৫৮৫৮।

পাননি'। আর আমরা তাঁদের পরে বেঁচে আছি। অবশেষে দুনিয়ার অনেক কিছু পেয়েছি। অথচ তাঁদের জন্য আমরা মাটি ব্যতীত কিছুই পাইনি। এসময় তিনি তার বাড়ি এবং বাড়ির সম্পদ রাখার কক্ষের দিকে ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন, মদীনায় প্রথম দাঈ ও ওহোদ যুদ্ধের পতাকাবাহী মুছ'আব বিন উমায়ের শহীদ হওয়ার পর কিছুই ছেড়ে যায়নি একটি চাদর ব্যতীত। অতঃপর তিনি তার কাফনের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা হামযার জন্য এতটুকু কাফনও জুটেনি। মাথা ঢাকলে পা ঢাকেনি। পা ঢাকলে মাথা ঢাকেনি। অতঃপর সেখানে ইযখির ঘাস দিয়ে ঢাকা হয়েছিল'। তিনি ৩৭ হিজরীতে ৬৩ বছর বয়সে কূফায় ইন্তেকাল করেন।[১০]

এখানে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, নির্যাতিত এই মানুষটিকে কঠিনভাবে ধমক দেওয়ার পরেও তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে দলত্যাগ করেননি। বরং তার ঈমান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সম্পদ লাভে তিনি খুশী হননি। বরং বিগতদের তুলনায় নিজেকে হীন মনে করেছেন।

জান্নাতে আল্লাহ্র সম্ভাষণ :

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا- خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا- 'ঐ সকল ব্যক্তিকে তাদের ছবরের বিনিময়ে জান্নাতে কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সেখানে সম্ভাষণ ও সালাম জানানো হবে'। 'সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসাবে সেটি কতই না উত্তম' *(ফুরক্বান ২৫/৭৫-৭৬)*।

আল্লাহ জান্নাতীদের উদ্দেশ্যে সেদিন বলবেন, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ- ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً- فَادْخُلِي فِي عِبَادِي- وَادْخُلِي جَنَّتِي- 'হে প্রশান্ত আত্মা!'। 'ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে, সন্তুষ্ট চিত্তে ও সন্তোষভাজন অবস্থায়'। 'অতঃপর প্রবেশ কর আমার বান্দাদের মধ্যে'। 'এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে' *(ফজর ৮৯/২৭-৩০)*।

এখানে মুমিনদের হৃদয়কে 'নফ্সে মুত্বমাইন্নাহ' বা প্রশান্ত আত্মা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ অবিশ্বাসীরা যতই দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস ও বিত্ত-বৈভবের মধ্যে জীবন যাপন করুক না কেন, তারা হৃদয়ের প্রশান্তি হ'তে বঞ্চিত থাকে। পক্ষান্তরে প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি সুখে-দুখে সর্বদা আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেন এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকেন। এই সকল ঈমানদারগণের আলোকিত হৃদয়কে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ এখানে 'প্রশান্ত আত্মা' বলে সম্বোধন করেছেন। যা ঈমানদার নর-নারীর জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এক অতীব স্নেহময় আহ্বান। এর চাইতে মূল্যবান উপঢৌকন মুমিনের জন্য আর কি হ'তে পারে?

বস্তুতঃ দুনিয়াপ্রেমের শয়তানী ধোঁকার অন্ধকার কেটে গিয়ে আল্লাহপ্রেমের জ্যোতি যখন হৃদয়ে বিচ্ছুরিত হয়, তখন ঈমানের দ্যুতিতে মুমিন এতই শক্তি লাভ করে যে, জীবনকে সে তুচ্ছ মনে করে। প্রেমাস্পদ আল্লাহ্র সাথে মিলনের জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ফেরাউনের কঠোরতম শাস্তিকে তাই তুচ্ছ জ্ঞান করে তার সতীসাধ্বী স্ত্রী আসিয়া মৃত্যুর আগে আকুল কণ্ঠে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেছিলেন, رَبِّ ابْنِ لِيْ عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ- 'হে আমার পালনকর্তা! আমার জন্য তোমার নিকটে জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম হ'তে এবং এই যালেম কওমের হাত থেকে মুক্তি দান কর' *(তাহরীম ৬৬/১১)*।

ইস্তিক্বামাত হাছিলের উপায় সমূহ :

(১) প্রতি ছালাতে আল্লাহ্র নিকটে ছিরাতে মুস্তাক্বীম প্রার্থনা করা। যেটি সূরা ফাতিহাতে করা হয়ে থাকে।

(২) আল্লাহ্র নিকটে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের তৌফিক কামনা করা। কেননা আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত এটি পাওয়া সম্ভব নয়।

(৩) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ব্যতীত অন্যদিকে মুখ না ফিরানো। কেননা শিরক ও বিদ'আতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিল করা যায় না।

(৪) দ্বীনের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। এজন্য আল্লাহভীরু তাওহীদপন্থী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হ'তে হবে।

(৫) নেককার সাথী ও সংগঠন তালাশ করা ও তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকা *(তওবা ৯/১১৯; ইউসুফ ১২/১০৮; যুখরুফ ৪৩/৬৭)*।

(৬) আল্লাহ বিরোধী সকল চিন্তা ও কর্ম থেকে বিরত থাকা। এজন্য বাতিলপন্থী সাহিত্য ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া পরিহার করতে হবে।

(৭) সর্বদা আল্লাহ্র নিকট তওবা, ক্ষমা প্রার্থনা ও আত্মসমালোচনা করা।

এগুলি মুমিনকে দ্বীনের উপরে দৃঢ় থাকতে সহায়তা করবে এবং পথভ্রষ্টতা থেকে দূরে রাখবে *ইনশাআল্লাহ*।

১০. বিস্তারিত দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ১৩৩-৩৪ পৃঃ।

১৬ মাসের মর্মান্তিক কারা স্মৃতি

*অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম**

[২০০৫ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২০০৬ সালের ৮ই জুলাই। ১ বছর ৪ মাস ১৪ দিন]

ফেব্রুয়ারী আসলেই কেন যেন মনের কোণে জেগে ওঠে তৌহীদি শিহরণ। জান্নাত পিয়াসী মানুষের অন্তরে উত্থিত হয় অগ্রযাত্রার আলোড়ন। জান্নাতের পথযাত্রী যুব কাফেলার জীবনে জাগে অফুরন্ত জাগরণ। ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী বাংলার তরুণ ও যুবকদের পথের দিশারী হিসাবে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পদযাত্রা শুরু হয়। এই মাসেই অধিকাংশ সময় সংগঠনের বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যে কারণে ফেব্রুয়ারীকে ভোলা যায় না।

২০০৫ সালের ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারী ছিল আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর ১৫তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার ধার্য তারিখ। এ মাসের প্রথম থেকেই সারা দেশে সাজ সাজ রব পড়ে যায় তাবলীগী ইজতেমায় যোগদানের জন্য। কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল হিসাবে আমাকে দু'দিন আগেই যেতে হবে। তাই ২২ তারিখ মঙ্গলবারেই আমি রাজশাহী পৌঁছে গেলাম। নওদাপাড়া মাদরাসার দিকে নযর পড়তেই দেখি বহু পুলিশের আনাগোনা। জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, ইজতেমার নিরাপত্তার জন্য আমরা এসেছি।

অতঃপর রাত যত বেশী হয়, নিরাপত্তা বেষ্টনী তত বৃদ্ধি পায়। আমি দারুল ইমারতে বসে ইজতেমার অনুষ্ঠানসূচী তৈরী করছি। ইতিমধ্যে ঘড়ির কাটা রাত দেড়টার ঘরে। হঠাৎ করে আমার রুমে এসে একজন পুলিশ বলল, আমীরে জামা'আত কোথায় আছেন? বললাম, কেন? আপনাদের ইজতেমার অনুমতি বাতিল হয়েছে। এক্ষুণি কমিশনার স্যারের নিকট যেতে হবে। সরল মনে আমি মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে ডাকতে উপর তলায় তাঁর বাসায় যাচ্ছি। পিছনে তাকিয়ে দেখি, পুলিশের কয়েকজন বড় অফিসার আমার সাথে। আমীরে জামা'আত লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় দরজা খুললে একজন অফিসার সালাম দিয়ে বলল, কমিশনার স্যার আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তাঁর সাথে একটু দেখা করতে যেতে হবে। আমীরে জামা'আত বললেন, সকালে যাব। আমি কমিশনার ছাহেবের সাথে এখন কথা বলে নিচ্ছি। তখন আরেক অফিসার সালাম দিয়ে বললেন, স্যার আমাদের কিছু করার নেই, উপরের নির্দেশ। স্যার বুঝতে পারলেন, এরা তাঁকে গ্রেফতার করতে এসেছে। তাই আমাকে কিছু না বলেই ভিতরে গিয়ে পোষাক পরিবর্তন করে দ্রুত চলে এলেন।

অতঃপর স্যার পুলিশের সাথে চলে গেলে আমি বিমর্ষ অবস্থায় নীচে অফিসে বসে আছি। এমন সময় কয়েকজন পুলিশ এসে বলল, স্যার একা একা কেমন করে ফিরে আসবেন তাই আপনাকেও সাথে যেতে বললেন। আমি তাদের সাথে বেরিয়ে পড়লাম। আম চত্বরে যেতে যেতে দেখি, মারকাযের প্রতিটি পয়েন্টে পুলিশ। ছাদে, গাছের উপরে, মসজিদের কোণায় সর্বত্র পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ, যেন রণক্ষেত্র।

একজন পুলিশ অফিসার মোবাইলে বলছেন, কেমন ইনফরমেশন! আমরা তো দেখছি সবাই সহজ-সরল মানুষ। একজন রাগ করে বললেন, যতসব বাজে কথা আমাকে বলা হ'ল। তারা খুব দুর্ধর্ষ, বহু অস্ত্র মজুদ আছে তাদের কাছে। দু'চার, দশ ঘণ্টা যুদ্ধ হ'তে পারে। প্রস্তুতি নিয়ে যাবেন। এখন দেখছি সব ভুয়া কথা। ভুল ইনফরমেশন। যত...সব...'। এই বলে তিনি রাগে গর গর করতে করতে গাড়িতে এসে বসলেন।

অতঃপর তারা আমাকে ও সালাফী ছাহেবকে পৃথক গাড়িতে বোয়ালিয়া থানায় নিয়ে গেল এবং ওসির কক্ষে বসিয়ে রাখল। পরে জানলাম যে, আমীরে জামা'আত ও আযীযুল্লাহকে এক গাড়িতে রাজপাড়া থানায় নিয়ে গেছে। পরদিন সকালে আমাদের কোর্ট হাজতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে আমরা বারান্দায় চারটি চেয়ারে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ বসে আছি। হাজতের চারপাশে মানুষের উপচেপড়া ভিড়। সবাই অপলক নেত্রে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। দু'একজনের চোখ দিয়ে নীরবে অশ্রু বইছে। হঠাৎ মানুষের ভিড় ঠেলে আমাদের সামনে এগিয়ে এসে সালাম দিলেন এক নওজোয়ান। দীর্ঘদেহী উক্ত যুবকের চেহারায় ফুটে উঠেছে বিষাদের চিহ্ন। মনে বইছে আবেগ আর প্রতিবাদের প্রবল ঝড়। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে উঠল, 'স্যার! চিন্তা করবেন না। জোট সরকার কোন ক্ষতি করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ! জানতে চাইলাম, তিনি কে? উত্তর আসলো 'খায়রুযযামান লিটন'।

জীবনে কোর্ট-কাচারীতে যাইনি। তাই কোর্ট হাজতের বারান্দায় আমরা চারজন চারটি চেয়ারে বসে ভাবছিলাম, হয়তবা ভুল করে আমাদের ধরে এনেছে, যামিনে ছেড়ে দিবে। বিকালে গিয়ে ইজতেমার কাজ শুরু করব। হঠাৎ মাইকের আওয়ায, 'নওদাপাড়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন কর্তৃক আয়োজিত তাবলীগী ইজতেমার পারমিশন বাতিল করা হয়েছে। ইজতেমা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে'। মাইকের প্রতিটি আওয়ায আমার বুকে যেন শেল বিদ্ধ করছিল, অন্তরে চরম আঘাত হানছিল। হৃদয়কে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলছিল। সহ্য করতে না পেরে বললাম, 'ইজতেমা বন্ধ'? সালাফী ছাহেব উত্তর দিলেন 'ইজতেমা বন্ধ করার জন্যই তো আমাদের এখানে আনা হয়েছে'।

আমীরে জামা'আত বললেন, 'চক্রান্ত আরো গভীরে'। বিষণ্ন বদনে, ভাবনার চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে। এমন সময় পুলিশের আহ্বান স্যার চলেন। কোথায়? বলল, স্যার চলেন। উঠলাম প্রিজন ভ্যানে। আমাদের সোজা নিয়ে গেল জেলখানায়। গেইটে ঢুকতেই জেলার ছাহেব হাযির। ডেপুটি জেলার মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ছাত্র। বলা হ'ল, একটু ভাল জায়গায় ব্যবস্থা করো। খাতায় নাম-ঠিকানা লেখা, সই-স্বাক্ষর করার পর জেল পুলিশ ও একজন পুরাতন কয়েদীর (ম্যাট) হাতে আমাদের তুলে দিয়ে বলা হ'ল, ৬ সেলের ৪নং

---

* *সাধারণ সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।*

Contents

কক্ষ। ম্যাট সোহরাব কিছুটা ইতস্তত করছিল। কারণ পরে বুঝলাম যে, এটিই হ'ল রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের সবচাইতে নিকৃষ্ট বলে পরিচিত সেল। এখানে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী বন্দীদের প্রথমে এনে রাখা হয়। আমরাও এখন জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধের চারদলীয় জোট সরকারের দৃষ্টিতে অনুরূপ দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী আসামী। তাই আমাদের স্থান এখানেই হয়েছে। জানালা বিহীন পুরাতন জীর্ণ-শীর্ণ এই সেলটি ম্যাটের বর্ণনা মতে ১০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৬ ফুট প্রস্থের। যার দরজা মোটা লোহার রড দিয়ে তৈরী। বাহিরে উঁচু দেওয়ালের উপরে কাটাতার দিয়ে মোড়ানো। যাতে কোন আসামী দেওয়াল টপকে বেরিয়ে যেতে না পারে। ভিতরে দুই ফুট উঁচু দেওয়াল ঘেরা টয়লেট। বসলে মাথা দেখা যায়। একজন টয়লেটে গেলে অন্যদের পিছন ফিরে বসে থাকতে হয়। ১৯০৮ সালে তৈরী এই জরাজীর্ণ কক্ষে ঢুকিয়ে জনপ্রতি তিনটি করে পুরাতন কম্বল দিয়ে দরজা তালা মেরে দিল। সাথে ১টি করে এ্যানামেলের উঁচু থালা ও বাটি দিল। যাওয়ার সময় কয়েদীটি বলল, 'স্যার একটি কম্বল দিয়ে বালিশ তৈরী করবেন, একটি দিয়ে বিছানা ও একটি গায়ে দিবেন। স্যার চিন্তা করবেন না, জেলে না আসলে বড় হওয়া যায় না। আসি স্যার! সকালে দেখা হবে'।

লোকটি চলে গেলে আমরা বিছানা ঠিক করতে লাগলাম। রুমের দেওয়ালে লোনা ধরে গেছে। প্লাস্টার খসে খসে পড়ছে। এত ছোট রুমে চার জন শোয়া কঠিন। শু'লে দেওয়ালে পা ঠেকে। সেই সাথে শুরু হ'ল মশক বাহিনীর হামলা। অগণিত মশার ভনভনানী ও ফাঁক পেলেই প্রচণ্ড কামড়। কিছুক্ষণের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। থালা দিয়ে আমি বাতাস করে মশার হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। এভাবেই ফজরের আযান হ'ল।

আমীরে জামা'আতের ইমামতিতে ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর তিনি এক হৃদয়গ্রাহী দরস পেশ করলেন। দরসটি ছিল সময়োপযোগী ও মনগলানো। আমার যতদূর মনে পড়ে 'তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না তোমরাই বিজয়ী। যদি তোমরা ঈমানদার হও' সূরা আলে ইমরান ১৩৯ আয়াতের উপরে তিনি দরস পেশ করেছিলেন। এ সময়ে তিনি বললেন, নূরুল ইসলাম আমাদের আন্দোলন আল্লাহ কবুল করেছেন। নবী-রাসূলগণের ন্যায় আমাদের উপরও নির্যাতন নেমে এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের ঈমানের পরীক্ষা নিচ্ছেন। তোমরা ভীত হয়োনা। সে যুগে যেমন নবীগণ প্রচলিত কোন মনগড়া বিধানের সঙ্গে আপোষ করেননি, আমরা তেমনি সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষকে স্রেফ আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানিয়েছি। আমরা নেতাদের বলেছি 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'। এর কারণে আমরা সকল দল ও মতের নেতাদের বিরাগভাজন হয়েছি। আমাদের পূর্বসূরী আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ জেল-যুলুমের সম্মুখীন হয়েছেন। বাতিলপন্থীদের হাতে অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করেছেন। ফাঁসিতে জীবন দিয়েছেন। কিন্তু ঈমান হারাননি। আমাদের অবস্থাও অনুরূপ হ'তে পারে। অতএব তোমরা যেখানেই থাক না কেন, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলবে না এবং আল্লাহ্‌র উপরে তাওয়াক্কুল হারাবে না। আমাদের চারজনের কথা যেন একই রকম হয়। নূরুল ইসলাম! হয়তবা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। চার জনকে চার জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। ভয়-ভীতি দেখিয়ে বা নির্যাতন করে মিথ্যা কথা বলিয়ে নিতে চাইবে। খবরদার মরবে, কিন্তু ঈমান হারাবে না'।

সালাফী ছাহেব আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। তাই পরের দিন তাকে কারা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হ'ল। আমরা তিনজন আরো একদিন ঐ কক্ষে থাকলাম। ২য় দিন সকালে বের হ'লে পাশের কক্ষের বন্দীদের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। দু'একজন বয়স্ক ছাড়া সবই তরুণ। তাদেরকে খুব হাসি-খুশী দেখলাম। আযীযুল্লাহর সঙ্গে ওদের ভাব জমে গেল। ওরা খুশী মনে বলল, আমাদের কোন ভয় নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের সাহায্যে আছেন। পত্রিকার হৈ চৈ থামানোর জন্য আমাদের ৬৭ জনকে ধরে এনেছে। সত্বর মুক্তি পাব'। আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। জেএমবি হওয়া সত্ত্বেও এরা মুক্তি পাবে? হ্যাঁ। পরে যখন আমরা নওগাঁ জেলে, তখন জানতে পারলাম যে, এদের ৪০ জন একদিনে এবং তার দু'সপ্তাহ পরে বাকী ২৭ জন মুক্তি পেয়েছে। হ্যাঁ, একেই বলে আইওয়াশ।

তৃতীয় দিন স্যারকে হাসপাতালে নেওয়া হ'ল। থাকলাম আমি এবং আযীযুল্লাহ। এ দিন সোহরাব এসে সালাম দিয়ে আমাদের হাতে একটি করে টিকিট (আমল নামা) ধরিয়ে দিল। তাতে আমাদের নামে যে সমস্ত মামলা দেওয়া হয়েছে তার তালিকা ও ধারা লেখা আছে। সোহরাব বিশ বছর ধরে মিথ্যা মামলায় সশ্রম কারাদণ্ডের আসামী। ধারাগুলি তার মুখস্থ। কোন ধারায় কত বছরের জেল হবে, কোন ধারায় ফাঁসি হবে সে ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে। আমাদের দু'জনকে আর এক সাথে না রেখে আযীযুল্লাহকে পাশের রুমে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

আমাদের টিকিট দেখে সে বলল, বড় স্যারের হবে ৩৮০ বছর, হুযুর স্যারের (সালাফী ছাহেবের) হবে ২৩০ বছর, আর আপনাদের হবে ১৮০ বছর করে। শুনে তো চক্ষু ছনাবড়া। বেটা বলে কি? সে বলল, স্যার চিন্তা করবেন না। এসব ধারা হ্যালোতে হ্যান্ডকাপ পরায়, আবার হ্যালোতে খসে যায়। স্যার চিন্তা করবেন না! কিছুই হবে না। আপনারা আল্লাহওয়ালা মানুষ, আল্লাহ আপনাদের পরীক্ষা করছেন। আপনাদের ঈমান ইবরাহীম (আঃ)-এর মত, না ঈসমাঈলের মত? মূসা (আঃ)-এর মত, না ঈসা (আঃ)-এর মত? না-কি আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মত? যার মত ঈমান হবে তাঁর সাথে জান্নাতে যাবেন। ভাবলাম, মূর্খ সোহরাব কতই না গভীর জ্ঞানের মানুষ! সে আমাকে কৌশলে তাহাজ্জুদ ছালাতের উপদেশ দিয়ে গেল।

৪র্থ দিন নাশতা শেষ না হ'তেই বাবু এসে সালাম দিল। অতঃপর ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে তার সাথে দরবার হলে গিয়ে হাযির হলাম। দেখলাম সেখানে সালাফী ছাহেব ও আযীযুল্লাহকে ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তারা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে সালাফী ছাহেবের চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরে পড়ল। আমিও চোখের পানি রুখতে পারলাম না। এসময় আমাকেও ডাণ্ডাবেড়ী পরানো হ'ল।

সোহরাব ম্যাট সান্ত্বনা দিয়ে বলল, স্যার ধৈর্য ধারণ করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে, সব অভ্যাস হয়ে যাবে।

তারপর আমাদের তিন জনকে একদল পুলিশ মাইক্রোতে নিয়ে রওনা হ'ল। কোথায়, কেন? কিছুই বুঝতে পারছি না। মাইক্রো দ্রুতগতিতে নাটোর হয়ে কুষ্টিয়া পাড়ি দিল। তখন আমাদের দায়িত্বশীল এসকর্ট অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কোথায় যাচ্ছি? তিনি বললেন, গোপালগঞ্জ কারাগারে। আগামীকাল সেখানে আপনাদের বিরুদ্ধে কোটালীপাড়া ব্রাক অফিসে ডাকাতি মামলার হাযিরা আছে।

অফিসার শাহ আলম অত্যন্ত ভদ্রলোক। তিনি বুঝতে পারছেন, আমরা ভয় পাচ্ছি। তাই আমাদের স্বাভাবিক করার জন্য টুকিটাকি প্রশ্ন ও আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন। প্রথম প্রশ্ন : বলুন তো ছালাত শেষে আপনারা দলবদ্ধ মোনাজাত করেন না কেন? সালাফী ছাহেব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন। তাতে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হ'লেন। ছালাতের পার্থক্যমূলক সমস্ত কথাগুলোই আলোচনা হ'ল। তারপর রাজনীতি, অর্থনীতি, সঊদী আরবের সাথে আমাদের কতটা মিল ইত্যাদি প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি কৌশলে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়ে গেলেন। কথায় কথায় সফরটা ভালই হ'ল। গোপালগঞ্জ জেলখানায় পৌঁছতে রাত ৮-টা বেজে গেল। তার আগে থানায় নিয়ে আমাদের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা সারা হয়।

জেলখানায় পৌঁছলে জেলার সালাফী ছাহেবকে বললেন, হুযুর আপনারা পরিস্থিতির শিকার। দুঃখ করবেন না। আমি আপনাদের জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি। আপনাদের কোথায় যে থাকতে দেই? এখানে মাত্র ২৫০ জন আসামীর থাকার জায়গা আছে। কিন্তু আছে এখন ৪৫০ জন। তারপরেও রাত্রে কোনভাবে বসে কাটানো যায় কি-না সেজন্য নিয়ে গেলেন 'আমদানী' ওয়ার্ডে। গিয়ে দেখি একদল ঘুমিয়ে আছে, আরেকদল দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছে। ৪ ঘণ্টা পরে ঘুমন্তদের দাঁড় করিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের ঘুমানোর জায়গা করে দিবে। এভাবে ঐ জেলখানায় রাত্রি যাপন করতে হয়। এখানে আবার আমরা তিনজন গিয়ে হাযির। জেলার আসামীদের ম্যাটকে ডেকে বললেন, এঁরা বিশিষ্ট ভদ্রলোক। একটু ব্যবস্থা করে দাও। ম্যাট দু'জনকে তুলে দিয়ে আমাদের বসার জায়গা করে দিল। আমরা কোন মতে বসলাম। কিন্তু খাবার কোথায়? জেলখানায় খাবার শেষ হয় বিকাল ৪-টায়। আর এখন রাত ৮-টা। একজন কয়েদী তার ব্যাগ থেকে দু'মুঠো চিড়া বের করে আমাদের দিয়ে বলল, চিবিয়ে পানি খেয়ে রাত কাটান। সকালে ব্যবস্থা হবে। আমি ও আযীযুল্লাহ খেতে আরম্ভ করলাম। সালাফী ছাহেব গামছার গাঁট থেকে এক টুকরা রুটি বের করে গালে দেওয়ার আগে বললেন, ঐ যে রাজশাহীতে সকালের নাশতা একটি রুটি চার ভাগ করে তিন ভাগ খেয়েছিলাম আর এক ভাগ রেখেছিলাম নিদানকালের জন্য। সেই সকালের এক টুকরা শুকনো রুটি সালাফী ছাহেব মড়মড় করে সামনের দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছিলেন। আর আমি কবিতা আবৃত্তি করছিলাম-

শুকনো রুটিরে সম্বল করে
যে ঈমান আর যে প্রাণের জোরে
ঘুরিছে জগৎ মন্থন করে
সে শক্তি আজ ফিরিয়ে আন।
আমাদের হাতেই উড়িবে দেশে
তাওহীদের ঐ জয় নিশান।

সালাফী ছাহেব শত দুঃখের মধ্যেও হেসে বললেন, আল্লাহ কবুল করুন-আমীন!

বসে ঢুলতে ঢুলতে ফজরের আযান কানে ভেসে আসল ১৬ ফুট উঁচু প্রাচীরের বাধা পেরিয়ে। জায়গার সংকীর্ণতার কারণে একজন একজন করে ছালাত শেষ করলাম। সকাল ৬-টার ঘণ্টা হ'লে লকাপ খোলা হ'ল। আমাদের বের করে হাতে একটি গরম রুটি দিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাইক্রো এসে হাযির। আবার রওনা। কোথায়, কে জানে? কোর্টে হাযির করা হ'ল না। অতঃপর কিছু দূর যেতেই ফেরিঘাট। বুঝতে পারলাম ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফেরি পার হয়েই আমাদের কালো কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে দেওয়া হ'ল। আতংকে শরীর শিউরে উঠল। ভাবলাম, হয়তবা এক এক করে ফাঁকা রাস্তার ধারে নামিয়ে ক্রস ফায়ারে দিবে। তিন জনের কথা বন্ধ হয়ে গেল। মনে মনে দো'আ ইউনুস পড়তে পড়তে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু না! মানুষের কোলাহল ও যানবাহনের শব্দ বেড়েই চলল। এক পর্যায়ে মাইক্রোর গতি কমে এল। আমাদের নামতে বলা হ'ল। এবার চোখ খুলে দেওয়া হ'ল। তাকিয়ে দেখি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থানা। তখন বেশ রাত।

থানা অফিসের আনুষ্ঠানিকতা সেরে আমাদের নেওয়া হ'ল একটা কক্ষে। সেখানে গোছগাছ শেষে আমরা শোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ পাশের কক্ষের দরজার গ্রিল থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠের আওয়ায এল, *লা তাহযান। ইন্নাল্লা-হা মা'আনা*। দু'তিন বার একই আওয়ায শুনে আমরা নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, পাশের কক্ষেই আছেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। আনন্দে মনটা নেচে উঠল। এই ভেবে যে, স্যার বেঁচে আছেন। তাঁকে মেরে ফেলেনি। *আলহামদুলিল্লাহ*। বারান্দায় কড়া পুলিশ প্রহরা। তাই বাংলায় কোন কথা বলার সুযোগ নেই। ফলে আমীরে জামা'আত কুরআনী আয়াতের মাধ্যমে আমাদের সান্ত্বনা দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, আমি ভালো আছি। দুশ্চিন্তা করো না।

পরের দিন স্যারের এসকর্ট অফিসারের মাধ্যমে আমাদের এসকর্ট অফিসার জানতে পারেন যে, একই দিন স্যারকে রাজশাহী কারাগার থেকে বিকেলে বের করে রাতে বগুড়া কারাগারে এনে রাখা হয়। পরদিন সকালে তাঁকে বগুড়া থেকে পুলিশের ভ্যানে করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থানায় আনা হয়। আমাদের পূর্বেই তাঁকে পাশের বড় কক্ষে একাকী রাখা হয়।

উল্লেখ্য যে, দু'টির অধিক ফৌজদারী মামলা থাকলে সেইসব বন্দীর পায়ে বেড়ী পরানো হয়। বিশেষ করে কারাগারের বাইরে নেওয়ার সময়। আমাদের ৬টি করে মামলা ছিল এবং স্যারের ১০টি মামলা ছিল বিভিন্ন যেলায়। আমাদের ডাণ্ডাবেড়ী পরানো হ'লেও স্যারের পরানো হয়নি। অতঃপর জেআইসিতে স্যারের ধমকের পর আমাদের বেড়ী খুলে

দেওয়া হয়। পরে ১৬ মাসের কারা জীবনে স্যারের কেস পার্টনার হওয়ার সম্মানে আমাদের আর ডাণ্ডাবেড়ী পরানো হয়নি। *আলহামদুলিল্লাহ*। আল্লাহ আমাদেরকে জেলখানার এই কঠিন কষ্ট থেকে বাঁচিয়েছেন।

পরদিন সকাল ৯-টার আগে আমাদের বের করা হ'ল। অতঃপর মাইক্রোতে উঠিয়ে চোখ বেঁধে নতুন গন্তব্যে নেওয়া হ'ল। অনেকক্ষণ পর মাইক্রো থামলে আমাদেরকে সিঁড়ি বেয়ে অনেক উপরে একটি কক্ষে নিয়ে চোখ খুলে দেওয়া হ'ল। কক্ষের ভিতর একটি লম্বা টেবিল, কয়েকটি চেয়ার। চতুর্দিকে শাস্তি দেওয়ার নানা রকম কলা-কৌশল দেওয়াল ঘেঁষে টাঙ্গানো আছে। গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানার এসকর্ট অফিসার আমার পাশে বসে আমাকে শাস্তি দেওয়ার নানান ধরনের যন্ত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। একটি স্টিলের সাদা চেয়ার, দাম ৯ লাখ টাকা। তৈরী আমেরিকায়। ঐ চেয়ারে বন্দীকে বসিয়ে হাত, পা চেয়ারের সাথে শক্ত করে বেঁধে বিদ্যুতের সুইচ টিপলেই সমস্ত দেহে বিদ্যুৎ সঞ্চালন হ'তে থাকবে। চরম ঝাঁকুনী হ'তে থাকবে। কষ্টে নাক-মুখ দিয়ে ফেনা বের হবে। তখন সে সত্য কথা বলতে বাধ্য হবে।

একটি ব্লাক বোর্ডে ছোট ছোট পিন আটকানো আছে। বন্দীর হাত, পা, দেহটা ভালভাবে ব্লাক বোর্ডের সাথে বেধে বোর্ডটিতে সুইচ দিলে তা চরকির মত ঘুরতে থাকবে। তার সাথে সাথে মানুষটিও ঘুরতে থাকবে। একবার মাথা নীচে পা উপরে, আবার পা নীচে মাথা উপরে উঠতে থাকবে। এতে প্রস্রাব, পায়খানা হয়ে যাবে। ফলে সে সত্য কথা বলতে বাধ্য হবে। এভাবে হরেক রকম যন্ত্রের সাথে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন। এটি ছিল সরকারের ভাড়া করা একটি বিল্ডিং-এর তৃতীয় তলা।

হঠাৎ এ সময় আমাদের এসকর্ট অফিসার আমাদের বললেন, দ্বিতীয় তলায় আপনাদের আমীর ছাহেবকে আনা হয়েছে। তিনি শুনতে পেয়েছেন যে, আপনাদের পায়ে বেড়ী পরানো হয়েছে। তাতে তিনি সিংহের মত গর্জে উঠে বলেছেন যে, আমার নায়েবে আমীরের পায়ে বেড়ী পরানো থাকবে, আর আমি আপনাদের সাথে কথা বলব? অসম্ভব, বেড়ী খুলে দিন'। তাঁর হুমকিতে জেআইসিতে উপস্থিত ২৩ জন দেশসেরা অফিসার চমকে গিয়েছেন। তারা সাথে সাথে আপনাদের বেড়ী খুলে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

আমরা বসে আছি। আর ভাবছি কখন কোন শাস্তির হুকুম হয়। কিন্তু না। দেখলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকা কারাগার থেকে বেড়ী খোলার চাবি এনে আমাদের বেড়ী খুলে দেওয়া হ'ল। পুলিশ অফিসাররা পরস্পর বলতে লাগল, দেখেছ সত্যের কি তেজ? এখানে যতবড় বাঘ আসুক না কেন, এই চেয়ারে বসলেই ভয়ে বিড়াল বনে যায়। অথচ ইনি দেখছি, এখানে এসে সিংহ হয়ে গেলেন। এরূপ সাহসী মানুষ আমাদের জীবনে এই প্রথম দেখলাম।

এসকর্ট অফিসার শাহ আলম ছাহেব আমার জীবন বৃত্তান্ত লিখছেন। এমন সময় দরজায় করাঘাত শুনে আমাকে তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়াতে বললেন। ১৫/২০ জন লোকের একটা দল এল। ঘরে ঢুকেই তারা বললেন, বসুন! একজন আমাকে হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল। আমি চেয়ারে বসে ভয়ে দো'আ ইউনুস পড়তে লাগলাম। জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের ইজতেমায় কত লোক হয়? বললাম লক্ষাধিক। তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা কি? বললাম, প্যাণ্ডেলেই। গালিব স্যার তো বললেন, দুই/তিন লক্ষ। তিনি কি তাহ'লে মিথ্যা বললেন? বললাম, স্যার দুই/তিন লক্ষ বলেননি, আমার বিশ্বাস। বললেন, আপনাদের মাসিক আয় কত? টাকা কোথায় পান? বললাম, ত্রিশটি যেলায় আমাদের কাজ হয়। কোন যেলা থেকে তিন শত, কোন যেলা থেকে পাঁচশত টাকা হারে এয়ানত আদায় হয়। তাছাড়া যাকাত, ফেৎরা, ওশর ইত্যাদি থেকে প্রায় ১ লাখের মত আয় হয়। নিট হিসাব অফিস সহকারী জানেন। বললেন, আমরা মোফাক্ষার ছাহেবকে ধরে এনেছি। তিনি তো বললেন, মাসে প্রায় দশ লক্ষ টাকা আয় হয়। বিভিন্ন যেলা সভাপতিদের বেতন দেওয়া হয়। লোকদের দান করার জন্য আমীরে জামা'আতকে মাসে এক লাখ করে টাকা দেওয়া হয়। আমি বললাম, এসব ভুল কথা। আমীরে জামা'আতকে আমরা কিছুই দেইনা। তাছাড়া আমাদের সহ যেলা সভাপতিদের কাউকে বেতন দেওয়া হয় না। আমাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব, রশিদ ও ভাউচার সবই ক্যাশ বইতে লিপিবদ্ধ আছে। তা দেখলে সঠিক হিসাব জানা যাবে। মৌখিক কথা ভুল হ'তে পারে। একজন প্রশ্ন করলেন আচ্ছা আপনারা ছালাত আদায় করেন তো হাত উঁচু করেন কেন? আবার আমীনও জোরে বলেন? আমি উত্তর দিচ্ছি এমন সময় একজন বললেন, চলেন স্যারের কাছে যাই। এই বলে সবাই আমার কাছ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমরা ছিলাম তৃতীয় তলায় আর স্যার ছিলেন দ্বিতীয় তলায়। ওখানে যা ঘটেছে, তা আমার পাহারাদার এক পুলিশের নিকট থেকে শুনলাম। সে বলল, স্যার এক মজার ঘটনা! আমীর স্যারকে ছালাতের কথা জিজ্ঞেস করলে, তিনি বুখারী-মুসলিমের পৃষ্ঠা নম্বর সহ বলতে লাগলেন। তারা স্যারের মুখ থেকে শুনে পাশের কক্ষে গিয়ে বঙ্গানুবাদ হাদীছের সাথে মিলিয়ে দেখেন সব ঠিক আছে। তখন বারিধারা মসজিদ থেকে আনা ওদের জনৈক আলেমকে বলল, আমাদের ছালাত কোন হাদীছে আছে? আলেম তা বলতে পারল না। তখন তারা বলল, বুখারী-মুসলিমে নেই তাহ'লে কোন হাদীছে আছে? পাহারাদার পুলিশ বলল, আমি ওদের কথা শুনে যারপর নেই খুশি হ'লাম। আমি কিন্তু আহলেহাদীছ। স্যার ভয় করবেন না, সত্যের জয় হবেই।

এভাবেই প্রথম দিনের রিম্যাণ্ড শেষে ক্যান্টনমেন্ট থানা হাজতে আমাদের ফিরিয়ে আনা হ'ল। হাজতে সম্মানজনক অবস্থায় রাখার চেষ্টা করা হ'ল।

ভয় ও শংকার মাঝে সারাদিনের রিম্যাণ্ড শেষে ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে থানায় ফিরে খানা শেষে সন্ধ্যার কিছু পরেই ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত ১-টার ঘণ্টা বাজার শব্দ কানে আসল। চোখ খুলে দেখি দরজার কাছে একজন পুলিশ ফিস ফিস করে কান্নার স্বরে বলছে, স্যার! রেডি হৌন, আমি সব ব্যবস্থা করেছি। স্যার আপনাদের পালিয়ে যেতে হবে। এখানে বহু লোককে ধরে এনে ক্রস ফায়ার দেয়। যদি আপনাদের ক্রস ফায়ার দেয়? স্যার আমার ভয় হচ্ছে। তাই আমি মাইক্রো রেডি করেছি। গেটের চাবি ম্যানেজ করেছি। আপনাদের

এখান থেকে বের করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। স্যার! দেরি করবেন না, তাড়াতাড়ি করুন। আমি বললাম, আমরা পালালে তোমার কি অবস্থা হবে? চাকরী যাবে, জেল-জরিমানা হবে জীবনও চলে যেতে পারে মিনতির স্বরে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে সে বলল। সে আরো বলল, স্যার আমি পরিণাম বুঝেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, একটি জীবনের বিনিময়ে যদি চার জীবন মুক্ত হয়, একটি প্রাণের বিনিময়ে যদি আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ আলেমদের প্রাণ বেঁচে যায়, তবে সেটাই হবে আমার পরকালে মুক্তির অসীলা। স্যার! দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি করুন। আমি তাকে খুবই বুঝানোর চেষ্টা করলাম যে, দেখ আমরা এমন ব্যক্তি বাংলাদেশে আমাদের লুকানোর কোন জায়গা নেই। যেখানে, যে গ্রামে যাব, সবাই চিনে ফেলবে। তুমি যাও আল্লাহ্র কাছে দো'আ কর। স্যার! আমি সব ব্যবস্থা করেছি, ঢাকাতেই থাকবেন। দুই/চার বছর থাকলেও কেউ চিনতে পারবে না কোন অসুবিধাও হবে না। স্যার! আপনাদের বাঁচানো আমার ঈমানী দায়িত্ব। আবুবকর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেজন্য তিনি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছেন। এখন নবী-রাসূল নেই, আপনারা ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া। আপনারাই বাংলাদেশে রাসূলের ছহীহ হাদীছ প্রচার ও প্রসারের কাজ করেন। তাই আপনাদের বাঁচিয়ে, পরকালে বাঁচার চেষ্টা করা আমাদের দায়িত্ব। স্যার! তালা খুলছি বেরিয়ে আসেন। ওনাদেরও ডাকেন। বললাম, না, আমরা লুকাব না। তুমি দো'আ করো, কোন ক্ষতি হবে না ইনশাআল্লাহ। ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। পরে জানলাম, একই কথা সে পাশের কক্ষে স্যারের কাছে গিয়েও বলেছে। কিন্তু তিনি কড়া ভাষায় না করে দিয়েছেন।

পরের দিন সকালে আবার যৌথ জিজ্ঞাসাবাদ সেলে গিয়ে দেখি সবার চেহারায় উৎফুল্লতা ভাব। তারা যেন নতুন কিছু পেয়েছে। বহু আকাঙ্ক্ষিত বিষয় জানতে মহা ব্যস্ত সবাই। আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া, মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা। এভাবে দশ দিনের রিম্যাণ্ড শেষে আবার গোপালগঞ্জে ফিরে আসলাম। জেলখানায় ঢুকতেই কয়েদী হযরত আলী সালাম দিয়ে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নির্দিষ্ট কক্ষে নিয়ে গেল। হযরত আলী জেলখানায় তখন ম্যাটের দায়িত্ব পালন করছে। উঁচু বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ। গলায় ঝুলছে চাঁদির তৈরী বিশাল তাবীয, শক্ত কালো সুতা দ্বারা বাঁধা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দেখে জল্লাদের মত মনে হয়। সে সকলের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণে আমাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে বলল। কিন্তু কে শোনে কার কথা? অধিকাংশ কয়েদীর মুখে বিড়ি। গন্ধে বমি হওয়ার উপক্রম। সালাফী ছাহেব কিছুক্ষণ চুপ থেকে কয়েদীদের উদ্দেশ্যে ধূমপানের অপকারিতা সম্পর্কে কুরআন-হাদীছের আলোকে বক্তব্য রাখলেন। গভীর আগ্রহে আলোচনা শুনে সবাই মুগ্ধ। তারপর আমার কথা শেষ না হ'তেই হযরত আলী ঘোষণা দিল এখন থেকেই আমরা এই হারাম খাদ্য পরিহার করলাম। বলার সাথে সাথেই যার কাছে যত বিড়ি ছিল সব ফেলতে লাগল। তাদের বিড়ি ফেলা দেখে মদ হারাম হওয়ার ঘোষণায় মদীনায় ছাহাবীদের মদের মটকা ভেঙ্গে ফেলার দৃশ্য মনে পড়ে গেল।

মাগরিবের ছালাতের সময় হয়ে গেল। আযান দিবে কে? হযরত আলী সুললিত কণ্ঠে আযান দিল। সালাফী ছাহেবের ইমামতিতে ঘরে অবস্থানরত কিছু হিন্দু বাদে সবাই ছালাতে দাঁড়িয়ে গেল। সবাই যেন এক শান্তির আলো ফিরে পেল। জেলার মন্তব্য করলেন, স্যার! আমি তিন বছর ধরে এখানে আছি। এত সুন্দর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কখনও দেখিনি। লাঠিপেটা করেও ওদের মুখ বন্ধ করা যায় না। আর আপনি কি যাদুর কাঠি মুখে ছোঁয়ালেন, ওরা সব বোবা হয়ে গেল? আমাকে এক হিন্দু কয়েদী ফিস ফিস করে বলল, আপনারা কে? বাড়ী-ঘর কোথায়? আমি বললাম, কেন? আমাদের হিন্দুরা সব বলাবলি করছে, উনারা স্বর্গের দেবতা। নইলে যে বিড়ি ছাড়া এক দণ্ড থাকা যায় না, সেই বিড়ি আজ তিন দিন খাই না! একবার মনেও পড়ছে না। ওনাদের মুখের কথায় এত আছর, এত প্রভাব? নিশ্চয়ই উনারা মহামানব। বললাম, আমরা দেবতাও নই, মহামানবও নই। আমরা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সদস্য। উনি নায়েবে আমীর; নাম আব্দুছ ছামাদ সালাফী, বাড়ী রাজশাহীতে। আমি ঐ দলের সেক্রেটারী, নাম নূরুল ইসলাম, বাড়ী মেহেরপুরে। আরেক জনের নাম আযীযুল্লাহ, বাড়ী সাতক্ষীরায়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক।

স্যার! আপনাদের দল খুব ভাল। আপনাদের কারণে সবাই শান্ত আছে। নইলে হৈ হুল্লোড়, গণ্ডগোল, চিৎকার-চেঁচামেচিতে সব সময় জেলখানা গরম হয়ে থাকে। অথচ এখন কোন কথা নেই, সবাই শান্ত। স্যার! আপনারা অচিরেই মুক্তি পাবেন।

সালাফী ছাহেব অসুস্থ হওয়ার কারণে পরদিন তাঁকে একাকী কোর্টে নেওয়া হয়। অতঃপর সেখান থেকে অনুমতি নিয়ে চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর কারা হাসপাতালে পাঠানো হয়। যেতে চাইলে আমাদেরকেও সঙ্গে পাঠানো হয়। সেখানে এক আজব দৃশ্য দেখলাম। কিছু কয়েদীর দু'পায়ে এমন বেড়ী পরানো, যাতে হাটতে গেলে পা বেশী লম্বা করা যায় না। অর্থাৎ দৌঁড়ানোর কোন উপায় নেই। অথচ আমাদের পায়ের বেড়ী থাকা সত্ত্বেও লম্বা ধাপ ফেলা যায়। ফরিদপুর থেকে আমরা রাতেই গোপালগঞ্জ কারাগারে ফিরে আসি।

গোপালগঞ্জ থেকে ৫ম দিন ১৪ই মার্চ সকালে আমাদেরকে সরাসরি নওগাঁ জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। নওগাঁ যাওয়ার দু'টি রাস্তা। নাটোর-বগুড়া হয়ে নওগাঁ অথবা নাটোর-রাজশাহী হয়ে নওগাঁ। ওসি ছাহেব আমাদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। আমি রাজশাহী হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলাম। কারণ বেশ কিছুদিন হ'ল দারুল ইমারত দেখিনি। যাওয়ার পথে যদি এক নযর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অফিস, নওদাপাড়া মাদরাসা ও আশপাশের অবস্থা কিছুটা হ'লেও দেখতে পারি। যদি পরিচিত কারো চোখে চোখ পড়ে ইত্যাদি আকাঙ্ক্ষা নিয়েই ঐ পরামর্শ দিলাম। রাতে কাগজ-কলম জোগাড় করে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে জানিয়ে একটি চিঠি লিখলাম। ভাবলাম, যদি রাজশাহী হয়ে যায়, তবে মারকাযের পথে চিঠিটি ফেলে দিব যাতে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে কেন্দ্র জানতে পারে। যেমন চিন্তা, তেমনি কাজ। মাইক্রোবাস যখন আমচত্বরে আসলো এক নযর দারুল

ইমারত দেখার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। মাইক্রোর কালো গ্লাস খুলে প্রিয়জন হারানোর ব্যথাতুর আত্মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করলাম। ঐ ফাঁকে চিঠিটি ছুঁড়ে মারলাম, যাতে কারো নযরে পড়ে।

১৪ই মার্চ বিকাল ৪-টায় নওগাঁ নতুন জেলখানায় পৌঁছলাম। অত্যন্ত সুন্দর পরিপাটি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। জেলখানার ভিতরে রাস্তার দু'পাশে নানা রকম ফুলের গাছ দিয়ে সাজানো। জেলার, সুবেদার, জমাদার সবাই আমাদের গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা মাইক্রো থেকে নামতেই তাঁরা এসে সালাম দিয়ে অফিসে বসালেন। অতঃপর আনুষ্ঠানিকতা সেরে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। দক্ষিণমুখী পাঁচ কক্ষ বিশিষ্ট সেলের একটি কক্ষে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হ'ল। আমরা তিন জন একই কক্ষে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলাম। নিজের মত করে বিছানা সাজিয়ে নিলাম।

পাশের ৪টি কক্ষের একটিতে আছেন নওগাঁর হাসাইগাড়ি গ্রামের মোসলেম মোল্লা। অশীতিপর বৃদ্ধ লোকটি বিনা দোষে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত। বেচারা অতি গরীব মানুষ। ঘরে তার দু'টি কন্যা সন্তান। রোজগারের একমাত্র উপায় নৌকায় লোক পারাপার।

তিনি জানালেন, এক দিন সন্ধ্যায় তিনি নদীর ঘাটে নৌকা নিয়ে বসে আছেন। তিন জন পথিক এসে পার হ'তে চাইলে তিনি তাদের পার করে দেন। নৌকা থেকে নামার সময় লোকগুলি বলল, বাবাজী! আমরা ঘণ্টাখানের মধ্যেই ফিরে আসব। যদি দয়া করে এখানে অপেক্ষা করেন, তাহ'লে উপকৃত হব। আমরা আপনাকে পুষিয়ে দেব। তাদের আবদার রক্ষার্থে আমি থাকলাম। তারাও ফিরে এসে পার হ'ল এবং আমাকে ৫০০/= টাকা দিয়ে খুশী করে চলে গেল। পাঁচ বছর পর আমি ছোট মেয়েটিকে সাথে নিয়ে গ্রামের বাজারে গিয়েছি। এমন সময় চৌকিদার এসে বলল, বাবাজী! বড় বাবু আপনাকে দেখা করতে বলেছে। আমি সরল মনে থানায় গেলাম। তারপর তিনি আমার নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করে কাগজ-পত্র ঠিকঠাক করে সরাসরি আদালত হয়ে জেলখানায় পাঠিয়ে দিলেন। রাস্তায় শুনলাম ঐযে পাঁচ বছর পূর্বে সন্ধ্যায় তিন জনকে পার করেছিলাম, ওরা নাকি ঐদিন আমার নৌকায় পার হয়ে নিতাইপুরের একজনকে জবাই করে হত্যা করেছি। তাদের তিন জন সহ আমার নামে পলাতক আসামী হিসাবে ফাঁসির রায় হয়েছে। তাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমাকে পেয়েছে। তাই...। কথাগুলি বলতে বলতে লোকটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। আমরা সান্ত্বনা দিলাম। কিন্তু এসব ঘটনা শুনে আমি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়লাম। বুঝলাম, এদেশে বিচার বলতে কিছু নেই। এমন সময় সুবেদার গোলাম হোসেন এসে বললেন, কি হয়েছে? আমি ক্ষোভের সাথে বললাম, এসব কি? বিনা দোষে ফাঁসি? উনি বললেন, স্যার! এসব বলতে নেই। চুপচাপ থাকাই জেলখানার নিয়ম। আমরা বিচারের মালিক নই। আশ্রয়দাতা মাত্র। আমি বিষণ্ণ মনে কক্ষে শুয়ে নানা ভাবনায় ডুবে গেলাম। কয়েক মাস পরে জেলখানা বিষয়ে আমি নিম্নোক্ত কবিতাটি লিখলাম।-

হে মোহিনী জেলখানা

তোমাকে অনেক লেখার ছিল
অব্যক্ত বহু কথাও ছিল
কিন্তু কইতে রয়েছে মানা!
নির্ভেদ প্রাচীরে নির্দোষ জীবন
মৃত্যুর আগেই দণ্ডতে মরণ
প্রাণ রাখা কিযে যন্ত্রণা
কিন্তু কইতে রয়েছে মানা!
রাজনীতির ঐ নোংরা ফাঁদে
কত যে জীবন হতাশায় কাঁদে
বুকে চাপা দারুণ বেদনা
কিন্তু কইতে রয়েছে মানা!
গণতন্ত্রের প্রহসনে
আটক রয়েছে বহু বিজ্ঞ জনে,
মুক্তির আশে করছে দিন গণনা।
কিন্তু কইতে রয়েছে মানা ॥
বহাল রাখতে রাজার গদি
বইয়ে দিচ্ছে রক্তের নদী
ঝরে যায় কত অচেনা প্রাণ,
কিন্তু কইতে রয়েছে মানা।
খুন-খারাবী রাহাযানী
যত করুক হানাহানি
তুমি যে তার শেষ ঠিকানা।
কিন্তু কইতে রয়েছে মানা ॥
নানা বর্ণের নানা ধর্মের
নানা চিন্তার লোক,
রাজা-প্রজা, শত্রু-মিত্র
যে যাই হোক।
কেউ নির্দোষ কেউ বা দোষী
কেউ গুণী বা নির্গুণ
সবাইকে তুমি দিয়েছ আশ্রয়
নিবারণে হানাহানি।
থাকার জায়গা পাশাপাশি হ'লেও
মেয়াদ সবার এক নয়।
কেউ আছে দশ-বিশ বছর
কেউ আছে দিন কয়।
কত যে দোষী মুক্তি পেয়ে
করছে অট্টহাসি,
কত যে নির্দোষ
ধুঁকে ধুঁকে মরে
এই বদ্ধ কুঠরী মাঝে।
একই কম্বল, থালা ও বাটি
একই খাবার একই মান,
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে মোদের
সবাই মোরা এক আদমের সন্তান।
এক সাথে সবার লকাপ খোলা
এক সাথে বন্দী গণনা,
দুনিয়ায় যতই ছোট বড় থাক
কবর মোদের একক ঠিকানা॥

[ক্রমশঃ]

বিনয় ও নম্রতা

*ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

বিনয় ও নম্রতা মানুষের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিনয় মানুষকে উচ্চাসনে সমাসীন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে সহায়তা করে। বিনয়ীকে মানুষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। যে যত বেশী বিনয়ী ও নম্র হয় সে তত বেশী উন্নতি লাভ করতে পারে। এ পৃথিবীতে যারা আজীবন স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় আসন লাভ করে আছেন তাদের প্রত্যেকেই বিনয়ী ও নম্র ছিলেন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিনয়ী ও নম্র মানুষ ছিলেন শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। তিনি ছিলেন বিনয় ও নম্রতার মূর্তপ্রতীক। তাইতো মহান আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন এভাবে وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 'আর নিশ্চয়ই তুমি সুমহান চরিত্রের অধিকারী' *(কালাম ৬৮/৪)*।

বিনয় ও নম্রতার বিপরীত শব্দ হ'ল ঔদ্ধত্য, কঠোরতা, অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি। এগুলো মানব চরিত্রের সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্বভাব। এ পৃথিবীতে মারামারি, কাটাকাটি, খুন-রাহাজানি সহ যত অশান্তির সৃষ্টি হয় তার মূলে রয়েছে ঔদ্ধত্য, অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি।

বিনয় ও নম্রতার আভিধানিক অর্থ : বিনয় ও নম্রতা দু'টি সমার্থক শব্দ। বিনয় শব্দের অর্থ- নম্রভাব, নম্রতা, কোমলতা, মিনতি ইত্যাদি।[১১] নম্রতা শব্দের অর্থ- বিনীত, ঔদ্ধত্যহীন, নিরহঙ্কার, অবনত, নরম, কোমল, শান্তশিষ্ট ইত্যাদি।[১২]

পারিভাষিক অর্থ : আবূ যায়েদ বিসত্বামী (রহঃ) বলেন, هو أن لا يرى لنفسه مقامًا ولا حالاً، ولا يرى في الخلق شرًا منه 'বিনয় হ'ল নিজের জন্য কোন অবস্থান মনে না করা এবং সৃষ্টি জগতে নিজের চেয়ে অন্যকে অবস্থান ও অবস্থায় নিকৃষ্ট মনে না করা'।

ইবনু আতা বলেন, هو قبول الحق ممن كان العز في التواضع، فمن طلبه في الكبر فهو كطلب الماء من النار 'যে কোন ব্যক্তি থেকে সত্যকে গ্রহণ করা। সম্মান হ'ল নম্রতায়। যে ব্যক্তি অহংকারে তা তালাশ করবে, তা হবে আগুন থেকে পানি তালাশতুল্য'।[১৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহঃ) বলেছেন,

رَأْسُ التَّوَاضُعِ أَنْ تَضَعَ نَفْسَكَ عِنْدَ مَنْ هُوَ دُوْنَكَ فِيْ نِعْمَةِ الدُّنْيَا، حَتَّى تُعْلِمَهُ أَنْ لَيْسَ لَكَ بِدُنْيَاكَ عَلَيْهِ فَضْلٌ، وَأَنْ تَرْفَعَ نَفْسَكَ عَمَّنْ هُوَ فَوْقَكَ فِي نِعْمَةِ الدُّنْيَا، حَتَّى تُعْلِمَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بِدُنْيَاهُ عَلَيْكَ فَضْلٌ-

'বিনয় ও নম্রতার মূল হ'ল, তুমি তোমার দুনিয়ার নে'মতের ক্ষেত্রে নিজেকে তোমার নীচের স্তরের লোকদের সাথে রাখ, যাতে তুমি তাকে বুঝাতে পার যে, তোমার দুনিয়া নিয়ে তুমি তার চেয়ে মর্যাদাবান নও। আর নিজেকে উঁচু করে দেখাবে তোমার চেয়ে দুনিয়াবী নে'মত নিয়ে উঁচু ব্যক্তির নিকট, যাতে তুমি তাকে বুঝাতে পার যে, দুনিয়া নিয়ে সে তোমার উপর মর্যাদাবান নয়'।[১৪]

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) তাঁর শিষ্যদের বলেন, (أتدرون ما الرفق) قالوا: قل يا أبا محمد! قال: أن تضع الأمور في مواضعها: الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والسوط في موضعه. 'তোমরা কি জান নম্রতা কি? তারা বলল, আপনি বলুন, হে আবূ মুহাম্মাদ! তিনি বললেন, প্রত্যেক বিষয়কে যথাস্থানে রাখা। কঠোরতাকে স্বস্থানে, নম্রতাকে তার স্থানে, তরবারিকে যথাস্থানে, চাবুককে তার স্থানে রাখা'।[১৫]

বিনয়-নম্রতার প্রকারভেদ

ক্ষেত্র বিবেচনায় বিনয় ও নম্রতাকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে ভাগগুলো উল্লেখ করা হ'ল।-

১. মানুষের সাথে নম্রতা : মানুষের সাথে আচার-আচরণে নম্রতা অবলম্বনের বিষয়ে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ-

'আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে; যদি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হ'তে, তবে তারা তোমার আশপাশ হ'তে দূরে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর ভরসা কর। ভরসাকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لاَ تَغْضَبْ. 'তুমি রাগ করো না। সে লোকটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করল। তিনি বললেন, 'তুমি রাগ করো না'।[১৬]

** প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*

১১. *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৫শ মুদ্রণ: ১৪১৮ বাং/২০১২ খ্রীঃ), পৃঃ ৮৭৫।*

১২. *তদেব, পৃঃ ৬৬৪।*

১৩. *হাফিয ইবনুল ক্বাইয়িম জাওযিইয়া, মাদারিজুস সালেকীন (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬ খ্রীঃ), ২/৩১৪ পৃঃ।*

১৪. *আবুবকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবিদ দুনিয়া, আত-তওয়াযু ওয়াল খামূল (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯হিঃ/১৯৮৯খ্রীঃ), পৃঃ ১৬৫।*

১৫. *ফায়যুল কাদীর ৪/৭৩ পৃঃ।*

১৬. *বুখারী হা/৬১১৬; মুসলিম হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১০৪।*

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. ‘মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং হত্যা করা কুফরী’।[১৭]

২. খাদেম বা চাকরদের সাথে নম্রতা : চাকরদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। ইবনু ওমর (রাঃ) একদা মাটি থেকে এক খণ্ড কাঠি অথবা অন্য কোন বস্তু নিয়ে বললেন, তাকে আযাদ করার মধ্যে এর সমপরিমাণ পুণ্যও নেই। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ لَطَمَ مَمْلُوْكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ– ‘যে ব্যক্তি নিজ ক্রীতদাসকে চপেটাঘাত করল অথবা প্রহার করল, এর কাফফারা হ’ল তাকে মুক্ত করে দেয়া’।[১৮] এটা হচ্ছে ক্রীতদাসের সাথে ইসলাম নির্দেশিত আচরণ।

চাকর-চাকরাণী ও গৃহপরিচারিকার সাথে সদাচরণ করার জন্যও ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِىَ عِلاَجَهُ. ‘তোমাদের কারো খাদেম যখন তার খাবার নিয়ে আসে, তখন তাকে যদি সাথে না বসায় তাহ’লে সে যেন তাকে এক লুকমা বা দু’লুকমা খাবার দেয়। কেননা সে তার গরম ও কষ্ট সহ্য করেছে’।[১৯]

৩. জীব-জানোয়ারের সাথে নম্রতা : জীব-জন্তু ও পশু-পাখির সাথেও নম্রতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হিশাম ইবনু যায়দ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-এর সঙ্গে হাকাম ইবনু আইয়ূবের কাছে গেলাম। তখন আনাস (রাঃ) দেখলেন, কয়েকটি বালক কিংবা বর্ণনাকারী বলেছেন, কয়েকজন তরুণ একটি মুরগী বেঁধে তার দিকে তীর ছুঁড়ছে। আনাস (রাঃ) বললেন, نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ. ‘নবী করীম (ছাঃ) জীবজন্তুকে বেঁধে এভাবে তীর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন’।[২০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনু ওমর (রাঃ) কতিপয় কুরায়শ যুবকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা একটি পাখি বেঁধে সেটির দিকে তীর নিক্ষেপ করছিল। আর প্রত্যেকটি নিশানা ব্যর্থ হওয়ার কারণে তারা পাখির মালিকের জন্য একটি করে তীর নির্ধারণ করছিল। তারপর তারা ইবনু ওমর (রাঃ)-কে দেখে আলাদা হয়ে গেল। ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا. ‘কে এ কাজ করলো? যে ব্যক্তি এরূপ করেছে তার প্রতি আল্লাহ্র লা‘নত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে লা‘নত করেছেন, যে কোন জীব-জন্তুকে লক্ষ্যস্থল বানায়’।[২১]

শাদ্দাদ ইবনু আওস বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ’তে আমি দু’টি কথা মনে রেখেছি, তিনি বলেছেন, إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. ‘আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর ‘ইহসান’ অত্যাবশ্যক করেছেন। অতএব তোমরা যখন হত্যা করবে, দয়ার্দ্রতার সঙ্গে হত্যা করবে, আর যখন যবেহ করবে তখন দয়ার সঙ্গে যবেহ করবে। তোমাদের সবাই যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং তার যবেহকৃত জন্তুকে কষ্টে না ফেলে’।[২২]

বিনয় ও নম্রতার গুরুত্ব

বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধীর-স্থিরতা ও নম্রতা অবলম্বন পূর্বক সংযত হয়ে চলাফেরা করার জন্য মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে, وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ– ‘সংযত হয়ে চলাফেরা করো এবং তোমার কণ্ঠস্বরকে সংযত রাখো। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর’ *(লোকমান ৩১/১৯)*।

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ– ‘তুমি তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হও’ *(শু‘আরা ২৬/২১৫)*।

আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার ইহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসার জন্য অনুমতি চেয়ে বলল, السَّامُ عَلَيْكَ ‘আপনার মৃত্যু ঘটুক’। তখন আমি উত্তরে বললাম, عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ‘বরং তোমাদের মৃত্যু ঘটুক এবং অভিশম্পাত বর্ষিত হোক’। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘হে আয়েশা! থাম। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘আলা সর্ববিষয়ে কোমলতাকেই পসন্দ করেন। উত্তরে আমি বললাম, তারা যা বলেছে, আপনি কি তা শোনেননি? তিনি বললেন, আমি তো ‘ওয়ালাইকুম’ বলে (তাদের কথা তাদের দিকে ফিরিয়ে) দিয়েছি।[২৩]

অপর বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইহুদীরা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, ‘আসসামু আলাইকা’ ‘আপনার মৃত্যু হোক’। উত্তরে তিনি বললেন, ওয়ালাইকুম।

---

১৭. বুখারী হা/৬০৪৪; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪।
১৮. মুসলিম হা/১৬৫৭; আবু দাউদ হা/৫১৬৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৫২৭।
১৯. বুখারী হা/৫৪৬০; মুসলিম হা/১৬৬৩।
২০. বুখারী হা/৫৫১৩; মুসলিম হা/১৯৫৬; আবু দাউদ হা/২৮১৬।
২১. মুসলিম হা/১৯৫৮; মিশকাত হা/৪০৭৫।
২২. মুসলিম হা/১৯৫৫; আবু দাউদ হা/২৮১৫; ছহীহাহ হা/৩১৩০।
২৩. বুখারী হা/৬২৫৬; মুসলিম হা/২১৬৫।

তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমাদের মৃত্যু হোক, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের প্রতি অভিশম্পাত বর্ষণ করুন এবং তোমাদের উপর রুষ্ট হোন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আয়েশা! থাম, নম্রতা অবলম্বন করো, কঠোরতা ও অশালীনতা পরিহার করো’।[২৪]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَإِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَد وَلاَ يَبْغِيْ أَحَدٌ عَلَى أَحَد ‘আল্লাহ তা‘আলা আমার প্রতি অহী করেছেন যে, তোমরা পরস্পর বিনয় প্রদর্শন করবে, যাতে কেউ কারো উপর বাড়াবাড়ি ও গর্ব না করে’।[২৫]

আল্লাহ কর্তৃক বিনয়ীদের প্রশংসা : মহান আল্লাহ বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের মানুষদের প্রশংসায় বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَماً، وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً، وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً، إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً–

‘দয়াময় আল্লাহ্র বান্দা তো তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে ‘সালাম’। আর যারা রাত্রি অতিবাহিত করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত থেকে ও দণ্ডায়মান হয়ে এবং যারা বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। নিশ্চয়ই তা অবস্থান ও আবাসস্থল হিসাবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট’ *(ফুরক্বান ২৫/৬৩-৬৬)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ‘এটা আখিরাতের নিবাস যা আমি নির্ধারণ করি তাদের জন্য যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। মুত্তাক্বীদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম’ *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।

পক্ষান্তরে উদ্ধত অহংকারী দাম্ভিকদের সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ– ‘অহংকার বশে তুমি মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে পদচারণা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পসন্দ করেন না’ *(লোক্বমান ৩১/১৮)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً– ‘পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই তুমি পদভারে ভূপৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনও পর্বত সম হ’তে পারবে না’ *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক বিনয়ীদের প্রশংসা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ ‘মুমিন ব্যক্তি নম্র ও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে পাপী মানুষ ধূর্ত ও চরিত্রহীন হয়’।[২৬] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ–

‘আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকের সংবাদ দিব না? আর তারা হ’ল সরলতার দরুণ দুর্বল, যাদেরকে লোকেরা হীন, তুচ্ছ ও দুর্বল মনে করে। তারা কোন বিষয়ে কসম করলে আল্লাহ তা সত্যে পরিণত করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সংবাদ দিব না? আর তারা হ’ল প্রত্যেক অনর্থক কথা নিয়ে ঝগড়াকারী বদমেযাজী ও অহংকারী’।[২৭]

ঔদ্ধত্যপরায়ণ, অহংকারীদের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِيْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِيْ جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِيْنَةَ الْخَبَالِ ‘ক্বিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে পিপীলিকার ন্যায় জড়ো করা হবে। অবশ্য আকৃতি-অবয়ব হবে মানুষের। অপমান তাদেরকে চতুর্দিক হ’তে বেষ্টন করে রাখবে। ‘বুলাস’ নামক জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। অগ্নিশিখা তাদের উপর ছেয়ে যাবে। আর তাদেরকে পান করানো হবে জাহান্নামীদের দেহনিঃসৃত ‘ত্বীনাতুল খাবাল’ নামক কদর্য পুঁজ-রক্ত’।[২৮]

কোমলতা ও নম্রতা আল্লাহ্র বিশেষ গুণ : আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা কোমল, তিনি কোমলতাকে ভালবাসেন। আর তিনি কোমলতার প্রতি যত অনুগ্রহ করেন, কঠোরতা বা অন্য কোন আচরণের প্রতি ততটা অনুগ্রহ করেন না’।[২৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছেন, ‘কোমলতা নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা হ’তে নিজেকে বাঁচাও। কারণ যাতে

---

২৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩২ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়।
২৫. মুসলিম হা/২৮৬৫; আবুদাঊদ হা/৪৮৯৫; ছহীহুল জামে‘ হা/১৭২৫; ছহীহাহ হা/৫৭০।
২৬. তিরমিযী হা/১৯৬৪; মিশকাত হা/৫০৮৫।
২৭. মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৬।
২৮. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১১২।
২৯. মুসলিম হা/২৫৯৩; মিশকাত হা/৫০৬৮।

নম্রতা ও কোমলতা থাকে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। আর যাতে কোমলতা থাকে না, তা দোষণীয় হয়ে পড়ে'।[৩০]

মন্দকে প্রতিহত করতে হয় বিনয় ও নম্রতা দ্বারা : মন্দকে মন্দ দ্বারা, শত্রুকে শত্রুতা দ্বারা প্রতিহত না করে বরং বিনয়-নম্রতা ও উৎকৃষ্ট ব্যবহার দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে মানুষের হৃদয় জয় করতে হয়। মহান আল্লাহ এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন, وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ 'ভাল ও মন্দ সমান হ'তে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا، وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا 'তোমরা নম্র হও, কঠোর হয়ো না। শান্তি দান কর, বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না'।[৩১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ 'মন্দের মুকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা; তারা যা বলে আমরা সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত' *(মুমিনূন ২৩/৯৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ 'ক্ষমাশীলতা অবলম্বন কর, সৎ কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চল' *(আ'রাফ ৭/১৯৯)*।

ইবনু মারদুবিয়া (রহঃ) সা'দ ইবনু ওবাদা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ওহোদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা হামযাহ (রাঃ)-কে শহীদ করা হয় এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে লাশের প্রতি চরম অসম্মানজনক আচরণ করা হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লাশটিকে সে অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, যারা হামযাহ (রাঃ)-এর সাথে এহেন আচরণ করেছে, আমি তাদের সত্তর জনের সাথে এমনি আচরণ করে ছাড়ব। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলে দেয়া হয় যে, এটা আপনার জন্য সমীচীন নয়; বরং আপনার মর্যাদার উপযোগী হ'ল ক্ষমা ও অব্যাহতি দান'।[৩২]

দাঈ-এর অন্যতম গুণ হ'ল কোমলভাষী ও বিনয়ী হওয়া : একজন দাঈ ইলাল্লাহ-এর গুণাবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল কোমলভাষী ও বিনয়ী হওয়া। কোন রুক্ষ বদমেজাযী লোকের দেওয়া দ্বীনের দাওয়াত কেউ কবুল করে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিশ্বের সবচেয়ে কোমলভাষী, বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন এবং ছাহাবীগণও তাঁর সে গুণে গুণান্বিত ছিলেন। বিধায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের বিনয়-নম্রতা, অমায়িক ব্যবহার, সৌহার্দ্যপূর্ণ অমায়িক আচরণ ও কোমলভাষী হওয়ার কারণে।

৩০. মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৬৮।
৩১. বুখারী হা/৬১২৫।
৩২. তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে; যদি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হ'তে, তবে তারা তোমার আশপাশ হ'তে দূরে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর ভরসা করবে। ভরসাকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ– 'তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাক হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়, নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তাই সবিশেষ জ্ঞাত রয়েছেন তার সম্পর্কে, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনি অবহিত আছেন, কারা সঠিকপথে আছে' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য পাপাচারী ছিল ফেরাউন, যে নিজেকে সবচেয়ে বড় প্রভু বলে দাবী করেছিল। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-কে সে পাপিষ্ট ফেরাউনের নিকট কোমল ভাষায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى– 'তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও, সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। অতঃপর তোমরা তার সাথে নম্রভাষায় কথা বল, হয়ত বা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীত হবে' *(ত্বা-হা ২০/৪৩-৪৪)*।

বিনয়-নম্রতার ক্ষেত্রসমূহ

১. পবিারের সাথে নম্রতা : আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বহস্তে কোন দিন কাউকে আঘাত করেননি, কোন নারীকেও না, খাদেমকেও না, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত। আর যে তাঁর অনিষ্ট করেছে তার থেকে প্রতিশোধও নেননি। তবে আল্লাহ্র মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এমন বিষয়ে তিনি তার প্রতিশোধ নিয়েছেন'।[৩৩]

২. খাদেমের সাথে নম্রতা : আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি নয় বছর রাসূল (ছাঃ)-এর সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। কিন্তু আমার জানা নেই যে, কোন কাজ আমি করেছি, অথচ তিনি সে ব্যাপারে বলেছেন, এরূপ কেন করলে? কিংবা কোন কাজ করিনি, সে ব্যাপারে বলেছেন, কেন অমুক কাজটি করলে না'?[৩৪]

৩. শিশুদের সাথে নম্রতা : আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ

৩৩. মুসলিম হা/২৩২৮; মিশকাত হা/৫৮১৮।
৩৪. মুসলিম হা/২৩০৯।

عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে শিশুদেরকে আনা হ'ত। তিনি তাদের জন্যে বরকত ও কল্যাণের দো'আ করতেন এবং 'তাহনীক' (মিষ্টি জাতীয় কিছু চিবিয়ে মুখে দিতেন) করতেন। একদিন একটি শিশুকে আনা হ'ল, তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন। শিশুটি তাঁর কোলে প্রস্রাব করে দিল, পরে তিনি পানি চেয়ে নিলেন এবং প্রস্রাবের উপর পানির ছিটা দিলেন, আর তা ধুলেন না।[35]

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, أن النبي صلى الله عليه و سلم كَانَ يَزُوْرُ الْأَنْصَارَ وَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ وَيَمْسَحُ رُؤُوْسَهُمْ- 'নবী করীম (ছাঃ) আনছারদের বাড়ীতে গমন করতেন এবং তাদের বাচ্চাদেরকে সালাম দিতেন। আর তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন।[36]

৪. যাচঞাকারীর সাথে নম্রতা : আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, 'একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হাঁটছিলাম। তখন তাঁর গায়ে একখানা গাঢ় পাড়যুক্ত নাজরানী চাদর ছিল। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে চাদর ধরে সজোরে টান দিল। আনাস বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাঁধের উপর তাকিয়ে দেখলাম যে, জোরে চাদর খানা টানার কারণে তাঁর কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর বেদুঈনটি বলল, হে মুহাম্মাদ! তোমার কাছে আল্লাহ্র দেয়া যে সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকে দেয়ার জন্য আদেশ কর। তখন নবী করীম (ছাঃ) তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন এবং তাকে কিছু দান করার জন্য আদেশ করলেন'।[37]

৫. মূর্খদের শিক্ষা দানে নম্রতা : মু'আবিয়াহ ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করছিলাম। ইতিমধ্যে (ছালাত আদায়কারীদের মধ্যে) কোন একজন লোক হাঁচি দিলে (জবাবে) আমি يَرْحَمُكَ اللهُ 'আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন' বললাম। এতে সবাই রুষ্ট দৃষ্টিতে আমার প্রতি তাকাতে থাকল। তা দেখে আমি বললাম, আমার মা আমার বিয়োগ ব্যথায় কাতর হোক। কি ব্যাপার! তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ যে? তখন তারা নিজ নিজ উরুতে হাত চাপড়াতে থাকল। আমি যখন দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চায় তখন আমি চুপ করে রইলাম। পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষ করলে আমি তাঁকে সবকিছু বললাম। আমার পিতা ও মাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক। আমি ইতিপূর্বে বা এরপরে আর কখনো অন্য কোন শিক্ষককে তাঁর চেয়ে উত্তম পন্থায় শিক্ষা দিতে দেখিনি। আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তিনি আমাকে ধমকালেন না বা মারলেন না কিংবা বকা-ঝকাও করলেন না। বরং বললেন, ছালাতের মধ্যে (মানুষের সাথে) কথাবার্তা ধরনের কিছু বলা সিদ্ধ নয়। বরং তাহ'ল তাসবীহ, তাকবীর বা কুরআন তেলাওয়াত অথবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেরূপ বলেছেন।[38]

৬. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে নম্রতা : আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ، فَقَامُوْا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا تُزْرِمُوْهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ. 'একবার এক বেদুঈন মসজিদে প্রস্রাব করে দিল। লোকেরা উঠে তার দিকে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার প্রস্রাব করায় বাধা দিও না। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি আনালেন এবং তাতে ঢেলে দিলেন'।[39]

৭. ইবাদতে বিনয়-নম্রতা : ইবাদত-বন্দেগীতে বিনয়-নম্রতা একনিষ্ঠতা ইবাদত কবুলের আবশ্যিক পূর্বশর্ত। মহান আল্লাহ বলেন, حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوْا لِلّهِ قَانِتِيْنَ 'আর তোমরা আল্লাহ্র জন্য বিনম্রচিত্তে দাঁড়িয়ে যাও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ- 'সফলকাম হয়েছে সে সমস্ত মুমিনগণ, যারা নিজেদের ছালাতে বিনম্র' *(মুমিনূন ২৩/১-২)*।

ইবাদতে কিভাবে বিনয়-নম্রতা, একনিষ্ঠতা আসবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার উপায় বর্ণনা করে দিয়েছেন এভাবে, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ 'তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর তুমি যদি তাঁকে নাও দেখ, তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন'।[40]

একথা ধ্রুব সত্য যে, ইবাদতের অবস্থায় যদি ইবাদতকারী আল্লাহকে দেখতে পেত তাহ'লে তার বিনয় ও নম্রতার কিছুই পরিত্যাগ করত না। আর এ অবস্থার সৃষ্টি এজন্যই হ'ত যে তিনি তার সকল অবস্থা তত্ত্বাবধান করছেন ও সবকিছু দেখছেন। আর এ অবস্থা তখনও বিদ্যমান থাকত যখন বান্দা তাঁকে দেখতে না পায়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তুমি তাঁকে দেখতে না পেলেও তিনি তোমাকে দেখছেন। আর এটাই তোমার বিনয়ী-নম্র হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

৮. তওবাকারী পাপীর সাথে নম্রতা : আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, 'একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, 'ওয়াইহাকা' (আফসোস তোমার জন্য)। এরপর সে বলল, আমি রামাযানের মধ্যেই দিনের

---

৩৫. মুসলিম হা/২৮৬; মিশকাত হা/৪১৫০।
৩৬. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৫৯; ছহীহাহ হা/২১১২; ছহীহুল জামে' হা/৪৯৪৭।
৩৭. বুখারী হা/৬০৮৮, ৩১৪৯, ৫৮০৯; মিশকাত হা/৪১৫০।
৩৮. মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৯৭৮।
৩৯. বুখারী হা/৬০২৫; মুসলিম হা/২৮৪; মিশকাত হা/৪৯২।
৪০. মুসলিম, মিশকাত হা/০২।

বেলায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেন, একটা গোলাম আযাদ করে দাও। সে বলল, আমার কাছে তা নেই। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি এক নাগাড়ে দু'মাস ছিয়াম পালন কর। সে বলল, আমি এতেও অপারগ। তিনি বললেন, তবে তুমি ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াও। লোকটি বলল, আমি এটাও পারি না। নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এক ঝুড়ি খেজুর এলো। তখন তিনি বললেন, এটা নিয়ে যাও এবং ছাদাকাহ করে দাও। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তা কি আমার পরিবার ছাড়া অন্যকে দিব? সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মদীনার উভয় প্রান্তের মধ্যস্থলে আমার চেয়ে অভাবী আর কেউ নেই। তখন নবী করীম (ছাঃ) এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর পার্শ্বের দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ পেল। তিনি বললেন, তবে তুমিই এটা নিয়ে যাও'।[41]

৯. কষ্ট প্রদানকারীর উপর ধৈর্য ধারণ ও নম্রতা : আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, একবার তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ওহোদের দিনের চেয়ে কঠিন কোন দিন কি আপনার উপর এসেছিল? তিনি বললেন, আমি তোমার ক্বওম হ'তে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তা তো হয়েছি। তাদের হ'তে অধিক কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, আকাবার দিন যখন আমি নিজেকে ইবনু আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কুলালের নিকট পেশ করেছিলাম। আমি যা চেয়েছিলাম, সে তার জবাব দেয়নি। তখন আমি এমনভাবে বিষণ্ন চেহারা নিয়ে ফিরে এলাম যে, কারনুস ছা'আলিবে পৌঁছা পর্যন্ত আমার চিন্তা দূর হয়নি। তখন আমি মাথা উপরে উঠালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম এক টুকরো মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি সে দিকে তাকালাম। তার মধ্যে ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার ক্বওম আপনাকে যা বলেছে এবং তারা উত্তরে যা বলেছে তা সবই আল্লাহ শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। এদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছে আপনি তাঁকে হুকুম দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। অতঃপর বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি যদি চান, তাহ'লে আমি তাদের উপর আখশাবাইনকে চাপিয়ে দিব। উত্তরে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. 'বরং আমি আশা করি মহান আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দেবেন যারা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না'।[42]

১০. কাফিরদের সাথে আচরণে নম্রতা : আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন একদল ইহুদী রাসূলের নিকটে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তখন তারা বলল, السَّامُ عَلَيْكَ 'তোমার মৃত্যু হোক'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, وَعَلَيْكُمْ 'তোমাদের উপরও'। (আয়েশা বলেন,) আমি বললাম, السَّامُ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ. 'তোমাদের উপর মৃত্যু, আল্লাহ্র লা'নত ও গযব আপতিত হোক'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَهْلاً يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ أَوِ الْفُحْشَ 'হে আয়েশা! থাম। তোমার জন্য আবশ্যক হ'ল নম্রতা অবলম্বন করা। আর তুমি কঠোরতা অথবা অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাক। তিনি বললেন, আপনি কি শোনেননি তারা কি বলেছে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি শোননি আমি কি বলেছি? আমি তাদের বিরুদ্ধে যে জবাব দিয়েছি তাদের সম্পর্কে আমার দো'আ কবুল করা হবে। কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের দো'আ কবুল করা হবে না'।[43]

১১. মানুষের সাথে ইবাদতে নম্রতা : জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ছাহাবী দু'টি উটের পিঠে পানি নিয়ে আসছিলেন। রাতের অন্ধকার তখন ঘনীভূত হয়ে এসেছিল। এ সময় তিনি মু'আয (রাঃ)-কে ছালাত আদায়রত পান। তিনি তার উট দু'টি বসিয়ে দিয়ে মু'আয (রাঃ)-এর দিকে (ছালাত আদায় করতে) এগিয়ে এলেন। মু'আয (রাঃ) সূরা বাক্বারাহ বা সূরা নিসা পড়তে শুরু করেন। এতে ছাহাবী (জামা'আত ছেড়ে) চলে যান। পরে তিনি জানতে পারেন যে, মু'আয (রাঃ) এজন্য তার সমালোচনা করেছেন। তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে মু'আয (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'হে মু'আয! তুমি কি লোকদের ফিৎনায় ফেলতে চাও? বা তিনি বলেছিলেন, তুমি কি ফিৎনা সৃষ্টিকারী? তিনি একথা তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا এবং وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (সূরা) দ্বারা ছালাত আদায় করলে না কেন? কারণ তোমার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতওয়ালা লোক ছালাত আদায় করে থাকে'।[44]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে ছালাত শুরু করি। কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে আমার ছালাত সংক্ষেপ করে ফেলি। কেননা শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে তা আমি জানি'।[45]

১২. নফল ইবাদতে আত্মিক নম্রতা : আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ لاَ يَصُوْمُ. فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ

---

৪১. *বুখারী হা/৬১৬৪।*
৪২. *বুখারী হা/৩২৩১; মুসলিম হা/১৭৯৫; মিশকাত হা/৫৮৪৮।*
৪৩. *বুখারী হা/৬৪০১; মুসলিম হা/২৫৯৪; মিশকাত হা/৪৬৩৮।*
৪৪. *বুখারী হা/৭০৫।*
৪৫. *বুখারী হা/৭০৯; মুসলিম হা/৪৭০; মিশকাত হা/১১৩৩।*

صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ.

'আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) একাধারে ছিয়াম পালন করতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর ছিয়াম পরিত্যাগ করবেন না। (আবার কখনো এত বেশি) ছিয়াম পালন না করা অবস্থায় একাধারে কাটাতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর (নফল) ছিয়াম পালন করবেন না। আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত কোন পুরা মাসের ছিয়াম পালন করতে দেখিনি এবং শা'বান মাসের চেয়ে কোন মাসে অধিক (নফল) ছিয়াম পালন করতে দেখিনি।[৪৬]

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু আসাদের এক মহিলা আমার নিকট উপস্থিত ছিলেন, তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আমার নিকট আসলেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ মহিলাটি কে? আমি বললাম, অমুক। তিনি রাতে ঘুমান না। তখন তার ছালাতের কথা উল্লেখ করা হ'লে তিনি (নবী ছাঃ) বললেন, مَهْ عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الأَعْمَالِ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا. 'রাখ রাখ। সাধ্যানুযায়ী আমল করতে থাকাই তোমাদের কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা (ছওয়াব দানে) ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়'।[৪৭]

বিনয়-নম্রতার ফযীলত ও উপকারিতা : আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ. 'হে আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা নম্র ব্যবহারকারী। তিনি নম্রতা পসন্দ করেন। তিনি নম্রতার দরুন এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার দরুন দান করেন না; আর অন্য কোন কিছুর দরুনও তা দান করেন না'।[৪৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ 'যে বান্দাহ আল্লাহ্‌র জন্য বিনীত হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন'।[৪৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, اللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ. 'হে আল্লাহ! যে আমার উম্মাতের কোনরূপ কর্তৃত্বভার লাভ করে এবং তাদের প্রতি রূঢ় আচরণ করে তুমি তার প্রতি রূঢ় হও, আর যে আমার উম্মাতের উপর কোনরূপ কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি নম্র আচরণ করে তুমি তার প্রতি নম্র ও সদয় হও'।[৫০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَىِّ حُلَلِ الإِيْمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا. 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়বশত মূল্যবান পোশাক পরিধান ত্যাগ করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং ঈমানের পোশাকের মধ্যে যে কোন পোশাক পরার অধিকার দিবেন'।[৫১]

বিনয় ও নম্রতার উপকারিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أُعْطِىَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِىَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. 'যাকে নম্রতার কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট কল্যাণের অংশ প্রদান করা হয়েছে। আর যাকে সেই নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট কল্যাণ হ'তে বঞ্চিত করা হয়েছে'।[৫২] মহান আল্লাহ বিনয়ীদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। তিনি আরো বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ 'আমি কি তোমাদেরকে জানাব না যে, কারা জাহান্নামের জন্য হারাম বা কার জন্য জাহান্নাম হারাম করা হয়েছে? জাহান্নাম হারাম আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারী প্রত্যেক বিনয়ী ও নম্র লোকের জন্য'।[৫৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق 'নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন গৃহবাসীকে ভালবাসেন, তখন তাদের মাঝে নম্রতা প্রবেশ করান'।[৫৪] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم ولا منعوه إلا ضرهم 'আল্লাহ কোন গৃহবাসীকে নম্রতা দান করে তাদেরকে উপকৃতই করেন। আর কারো নিকট থেকে তা উঠিয়ে নিলে তারা ক্ষতিগ্রস্থই হয়'।[৫৫]

তিনি আরো বলেন, إن الله عز وجل ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير 'নিশ্চয়ই আল্লাহ নম্রতার মাধ্যমে যা দান করেন, কঠোরতার কারণে তা করেন না। আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালবাসলে তাকে নম্রতা দান

---

৪৬. বুখারী হা/১৯৬৯; মুসলিম হা/১১৫৬; মিশকাত হা/২০৩৬।
৪৭. বুখারী হা/১১৫১; মুসলিম হা/৭৮২; মিশকাত হা/১২৪৩।
৪৮. মুসলিম হা/২৫৯৩; মিশকাত হা/৫০৬৮।
৪৯. মুসলিম হা/২৫৮৮।
৫০. মুসলিম হা/১৮২৮; মিশকাত হা/৩৬৮৯।
৫১. তিরমিযী হা/২৪৮১; ছহীহাহ হা/৭১৮।
৫২. তিরমিযী হা/২০১৩; মিশকাত হা/৫০৭৬; ছহীহাহ হা/৫১৯।
৫৩. তিরমিযী হা/২৪৮৮; ছহীহাহ হা/৯৩৮।
৫৪. ছহীহুল জামে' হা/৩০৩, ১৭০৩; সিলসিলা ছহীহা ২/৫২৩।
৫৫. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৪২।

করেন। কোন গৃহবাসী নম্রতা পরিহার করলে, তারা কেবল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হয়'।[৫৬]

বিনয় ও নম্রতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত : প্রত্যেক উদ্ধত, অহংকারী মানুষ নিজেকে সব সময়ে অন্যের চেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং লোকজন তাকে সর্বদা বেশী সম্মান ও প্রশংসা করুক এটাই তার প্রত্যাশা থাকে। আর একজন বিনয়ী ও নম্র মানুষ সর্বদা নিজেকে অন্যের চেয়ে ছোট মনে করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রাসূল হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে ছোট মনে করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, لاَ تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. 'তোমরা আমার প্রশংসায় সীমালংঘন করো না, যেরকম খ্রীষ্টানরা ইবনু মারিয়ামের প্রশংসায় সীমালংঘন করেছে। মূলতঃ আমি হ'লাম আল্লাহ্র বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল বল'।[৫৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَبِيَدِى لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ لِوَائِى وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَلاَ فَخْرَ 'ক্বিয়ামতের দিন আমি বনু আদমের নেতা হবো, এতে আমার কোন গর্ব নেই, আমার হাতে প্রশংসার ঝাণ্ডা থাকবে, এতেও আমার কোন গর্ব নেই। সে দিন আদম (আঃ) সহ সকল নবী-রাসূল আমার ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হবেন এবং আমিই সর্বপ্রথম যমীন থেকে উত্থিত হব, এতেও কোন গর্ব নেই'।[৫৮]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.

'একবার এক আরব বেদুঈন মসজিদে প্রস্রাব করে দিল। তখন লোকজন তাকে শাসন করার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, তাকে প্রস্রাব করতে দাও এবং তার প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ তোমাদেরকে নম্র ব্যবহারকারী হিসাবে পাঠানো হয়েছে, কঠোর ব্যবহারকারী হিসাবে নয়'।[৫৯]

---

৫৬. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৬৬৬।
৫৭. বুখারী হা/৩৪৪৫, ৬৮৩০।
৫৮. তিরমিযী হা/৩৬১৫।
৫৯. বুখারী হা/৬১২৮, ৬০২৫; মুসলিম হা/১৮৪।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অভূতপূর্ব বিনয়-নম্রতায় বেদুঈন এতটাই বিমুগ্ধ হ'ল যে, সে সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম কবুল করল এবং ছালাতে দাঁড়িয়ে দো'আ করতে লাগল যে, اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا 'হে আল্লাহ! আমার ও মুহাম্মাদের প্রতি দয়া করো এবং আমাদের সঙ্গে আর কারো প্রতি দয়া করো না'। সালাম ফিরানোর পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا 'তুমি একটি প্রশস্ত বিষয় সংকুচিত করলে অর্থাৎ আল্লাহ্র অসীম অনুগ্রহকে সংকুচিত করে ফেললে'।[৬০] উল্লিখিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুপম বিনয় ও নম্রতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিশ্ব ইতিহাসে বিনয়-নম্রতার এমন দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিনয় ও নম্রতা মহান আল্লাহ প্রদত্ত অসংখ্য নে'মতের মধ্যে অন্যতম। মানবীয় যতগুলো মহৎগুণ রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম মহৎগুণ। এ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি ইহকালে সর্বসাধারণের মধ্যে হয় সম্মানিত, গ্রহণযোগ্য, স্মরণীয় ও বরণীয়। আর পরকালে হয় জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখা হ'তে মুক্ত। তাই দরবারে এলাহীতে প্রার্থনা জানাই, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বিনয় ও নম্রতার গুণে গুণান্বিত করে ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান করুন-আমীন!

---

৬০. বুখারী হা/৬০১০।
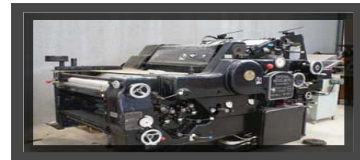
হিজামা : নবী (ছাঃ)-এর চিকিৎসা

*মুহাম্মাদ আবু তাহের**

হিজামা (حِجَامَةَ) একটি নববী চিকিৎসা ব্যবস্থা। এটি আরবী শব্দ 'আল-হাজম' থেকে এসেছে। যার অর্থ চোষা বা টেনে নেওয়া। আধুনিক পরিভাষায় Cupping (কাপিং)। হিজামার মাধ্যমে দূষিত রক্ত (Toxin) বের করা হয়। এতে শরীরের মাংসপেশী সমূহের রক্ত প্রবাহ দ্রুততর হয়। পেশী, চামড়া, ত্বক ও শরীরের ভিতরের অরগান সমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে শরীর সতেজ ও শক্তিশালী হয়।

হিজামা বা Wet Cupping অতি প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে আরব বিশ্বে জনপ্রিয়। নির্দিষ্ট স্থান থেকে সূঁচের মাধ্যমে নেগেটিভ প্রেশার দিয়ে (টেনে/চুষে) নিস্তেজ প্রবাহহীন দূষিত রক্ত বের করে আনা হয়।

এ হিজামা থেরাপী ৩০০০ বৎসরেরও পুরাতন চিকিৎসা পদ্ধতি। মধ্যপ্রাচ্য থেকে উৎপত্তি হ'লেও চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে চীন, ভারত ও আমেরিকায় বহু পূর্বে থেকেই এটি প্রচলিত ছিল। ১৮ শতক থেকে ইউরোপেও এর প্রচলন রয়েছে।

হিজামা তিব্বে নববী : হিজামা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্যতম চিকিৎসা পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজামার উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করেছেন, নিজে ব্যবহার করেছেন এবং হিজামা ব্যবহারে উৎসাহিত করেছেন। হিজামার ব্যবহার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজামা করেছেন তাঁর মাথা ব্যথার জন্য[৬১], পায়ে[৬২], পিঠে, পিঠের ব্যথার জন্য দুই কাঁধের মধ্যে[৬৩], ঘাড়ের দু'টি রগে[৬৪] ও হাড় মচকে গেলে।[৬৫]

আমর বিন আমির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী করীম (ছাঃ) হিজামা লাগাতেন এবং কোন লোকের পারিশ্রমিক কম দিতেন না।[৬৬]

হিজামার ফযীলত : হিজামার ফযীলত সম্বলিত বহু হাদীছ রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু হাদীছ উল্লেখ করা হ'ল।-

عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُم–

হুমাইদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর নিকট হিজামার উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজামা লাগিয়েছেন। আবু তায়বা তাকে হিজামা করেছেন। তিনি তাকে দুই ছা' (প্রায় ৫ কেজি) খাদ্যদ্রব্য দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং তার মালিকদের সাথে আলোচনা করেন। এতে তারা তার উপর ধার্যকৃত কর কমিয়ে দেয়। তিনি আরও বলেন, তোমরা যেসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও হিজামা সেগুলোর মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা অথবা (বলেছেন) এটি তোমাদের ঔষধের মধ্যে অধিক ফলদায়ক'।[৬৭]

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنهما عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ إِنَّ فِيْهِ شِفَاءً–

আছেম বিন ওমর বিন ক্বাতাদা থেকে বর্ণিত আছে যে, জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) অসুস্থ মুকান্নাকে দেখতে যান। এরপর তিনি বলেন, আমি সরব না, যতক্ষণ না তুমি শিঙ্গা লাগাবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই এর (হিজামার) মধ্যে নিরাময় রয়েছে'।[৬৮]

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রোগমুক্তি তিনটি জিনিসের মধ্যে নিহিত। শিঙ্গা লাগানো, মধু পান করা এবং আগুন দিয়ে গরম দাগ দেয়ার মধ্যে। তবে আমি আমার উম্মাতকে আগুন দিয়ে গরম দাগ দিতে নিষেধ করি'।[৬৯]

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي أَهْلِنَا وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ أَوْ جِرَاحًا فَقَالَ مَا تَشْتَكِي قَالَ خُرَاجٌ بِي قَدْ شَقَّ عَلَيَّ فَقَالَ يَا غُلَامُ ائْتِنِي بِحَجَّامٍ فَقَالَ لَهُ مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مِحْجَمًا قَالَ وَاللهِ إِنَّ الذُّبَابَ لَيُصِيبُنِي أَوْ يُصِيبُنِي الثَّوْبُ فَيُؤْذِينِي وَيَشُقُّ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ قَالَ فَجَاءَ بِحَجَّامٍ فَشَرَطَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ–

আছেম বিন ওমর বিন ক্বাতাদা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) আমাদের বাড়ীতে আসেন। বাড়ির একজন লোক তার ক্ষত রোগের কথা বলল। জাবির (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি সমস্যা? সে বলল, ক্ষত

** পি.এইচডি. গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

৬১. বুখারী হা/৫৭০০, ৫৭০১।
৬২. নাসাঈ হা/২৮৫২।
৬৩. আবুদাঊদ হা/৩৮৫৯, সনদ ছহীহ।
৬৪. আবুদাঊদ হা/৩৮৬০, সনদ ছহীহ।
৬৫. আবুদাঊদ হা/৩৮৬৩, সনদ ছহীহ।
৬৬. বুখারী হা/২২৮০।
৬৭. মুসলিম হা/৩৯৩০।
৬৮. বুখারী হা/৫৬৯৭।
৬৯. বুখারী হা/৫৬৮১।

হয়েছে যা আমার কাছে অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাবির (রাঃ) বলেন, বৎস! আমার কাছে একজন হিজামাকারী ডেকে নিয়ে এসো। সে বলল, হে আবু আবদুল্লাহ! হিজামাকারীকে দিয়ে কি করবেন? তিনি বললেন, ক্ষতস্থানে শিঙ্গা লাগাতে চাই। সে বলল, আল্লাহর শপথ! মাছি আমাকে উত্যক্ত করবে কিংবা (ক্ষতস্থানে) কাপড় লেগে গেলে আমার কষ্ট হবে। হিজামা করাতে তার অসম্মতি দেখে জাবির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যদি তোমাদের কোন ঔষধে কল্যাণ থেকে থাকে তাহ'লে তা আছে (১) হিজামা করানো (২) মধু পান করা এবং (৩) আগুনের টুকরা দিয়ে দাগ দেয়া'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে আগুন দিয়ে দাগ লাগানো পসন্দ করি না। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি হিজামাকারীকে আনালেন। অতঃপর সে তাকে হিজামা করল। এতেই সে আরোগ্য লাভ করল'।[৭০]

হিজামার গুরুত্ব : জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর (পায়ে) যে ব্যথা ছিল, তার জন্য তিনি ইহরাম অবস্থায় হিজামা লাগিয়েছিলেন।[৭১]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ عُرِجَ بِهِ مَا مَرَّ عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوْا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ–

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মি'রাজে যাওয়ার সময় তিনি ফিরিশতাদের যে দলের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন তারা বলেন, 'আপনি অবশ্যই হিজামা করাবেন'।[৭২]

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلَى مَلإٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ إِلاَّ أَمَرُوْهُ أَنْ مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ–

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মি'রাজের রাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, এই রাতে ফিরিশতাদের যে দলের সম্মুখ দিয়েই তিনি যাচ্ছিলেন তারা বলেছেন, 'আপনার উম্মতকে হিজামার নির্দেশ দিন'।[৭৩]

হিজামা ফেরেশতাদের দ্বারা সুফারিশকৃত : হিজামা একটি প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি, যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর উম্মতের জন্য এটি ফেরেশতাদের দ্বারা সুপারিশকৃত একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। এজন্য কেউ বলতে পারে না যে, এই প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি বর্তমান আধুনিক যুগে অচল। বরং এটি সাফল্যপূর্ণ প্রতিষেধক সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে।[৭৪]

৭০. মুসলিম হা/৫৬৩৬।
৭১. নাসাঈ হা/২৮৫২।
৭২. ছহীহ তিরমিযী, হা/৩৪৬২।
৭৩. ইবনু মাজাহ হা/৩৪৭৯; তিরমিযী হা/২০৫২; মিশকাত হা/৪৫৪৪, সনদ ছহীহ।
৭৪. ছহীহ তিরমিযী হা/২০৫২, ২০৫৩; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৪৭৭।

হিজামার পদ্ধতি : হিজামার পূর্বে গোসল করে নেওয়া উত্তম। যদি গোসল না করেন, তবে হিজামার পূর্বে ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম নেওয়া ভালো।

খালি পেটে হিজামা করা বা শিঙ্গা লাগানো ভাল : ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বাসি মুখে শিঙ্গা লাগালে তাতে নিরাময় ও বরকত লাভ হয় এবং জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়'।[৭৫]

হিজামার উত্তম সময় : সাধারণত হিজামার জন্য উত্তম সময় হচ্ছে চান্দ্র মাসের ১৭, ১৯ ও ২১ তারিখ। আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘাড়ের দুই পাশের শিরায় এবং ঘাড়ের কাছাকাছি পিঠের ফুলা অংশে হিজামা করাতেন। তিনি মাসের সতের, ঊনিশ ও একুশ তারিখে হিজামা করাতেন।[৭৬] যদি অসুস্থতা বা ব্যথা অনুভূত হয় তবে উক্ত তারিখের অপেক্ষা না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হিজামা করানো যাবে।

হিজামার জন্য উত্তম দিন হচ্ছে সোম, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ... فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فَاحْتَجِمُوْا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ تَحَرِّيًا وَاحْتَجِمُوْا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالثُّلاَثَاءِ–

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহর বরকত লাভের আশায় তোমরা বৃহস্পতিবার হিজামা করাও এবং বুধ, শুক্র, শনি ও রবিবার বেছে নেওয়া থেকে বিরত থাক। আর সোম ও মঙ্গলবারে হিজামা করাও'।[৭৭]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজামা করেছেন মাসের বিভিন্ন সময়ে। যেমন হজ্জের সময়, চান্দ্র মাসের প্রথমে। কারণ তিনি খারাপ মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এতে বুঝা যায়, প্রয়োজনে যে কোন সময় হিজামা করা যায়।

হিজামা থেকে বিরত থাকা : অসুস্থ, হায়েয, অন্তঃসত্তা, নেফাস এবং দুর্বল শরীরের অধিকারীদেরকে শিঙ্গা লাগানো থেকে বিরত থাকা উচিত।

ছিয়াম বা ইহরাম বাধা অবস্থায় হিজামা লাগানো : আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহরাম অবস্থায় আধ কপালির কারণে তাঁর মাথায় শিক্ষা লাগান।[৭৮]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছায়েম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন।[৭৯]

৭৫. ইবনে মাজাহ হা/৩৪৮৭, ৩৪৮৮, সনদ হাসান।
৭৬. তিরমিযী হা/২০৫১, ২০৫৩; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৪৮৩; আবুদাঊদ হা/৩৮৬১, সনদ ছহীহ।
৭৭. ইবনে মাজাহ হা/৩৪৮৭-৩৪৮৮, সনদ হাসান।
৭৮. বুখারী হা/৫৭০১।
৭৯. বুখারী হা/৫৬৯৪।

হিজামা থেরাপী : রোগীকে আরামদায়ক অবস্থায় শুইয়ে অথবা বসিয়ে রাখতে হবে। যে স্থানে হিজামা করতে চান তা জীবাণুমুক্ত করতে হবে। জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। হাতে গ্লাবস পরে নেয়া উত্তম। অতঃপর হিজামার স্থানে ধারালো সুঁচ বা ব্লেড দ্বারা হালকাভাবে ছিদ্র করে নিতে হবে। অতঃপর কাপ সেট করে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। এভাবে দূষিত রক্ত বের হয়ে কাপে জমতে থাকবে।

হিজামার পর সাধারণত ঐ স্থানে গোল চিহ্ন বা ফোলা অনুভব করবেন। যা সর্বোচ্চ এক, দুই বা তিন দিন থাকতে পারে। এটা দূষিত রক্ত বের হওয়ার চিহ্ন।

হিজামার মাধ্যমে যেসব রোগ প্রতিরোধ হয় : ব্যাক পেইন, উচ্চ রক্তচাপ, পায়ে ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা, মাথাব্যথা (মাইগ্রেইন), ঘাড়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, জয়েন্টে পেইন, আর্থ্যাইটিজ, যাদু, বাত, ঘুমের ব্যাঘাত, থাইরয়েড ব্যঘাত, জ্ঞান এবং স্মৃতিশক্তিহীনতা, ত্বকের বর্জ্য পরিষ্কার, অতিরিক্ত স্রাব নিঃসরণ বন্ধ করা, অর্শ, অণ্ডকোষ ফোলা, পাঁচড়া, ফোঁড়া ইত্যাদি প্রতিরোধ হয়।

মাথাব্যথায় হিজামা : সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'যখন কেউ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে মাথাব্যথার কথা বলত, তখন তিনি তাদের হিজামা করার কথা বলতেন'।[৮০]

জ্ঞান এবং স্মৃতিবর্ধক : ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'খালি পেটে হিজামা লাগানো উত্তম। এতে শিফা ও বরকত রয়েছে। এতে জ্ঞান এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়'।[৮১]

বিষ বা ব্যথা : আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক ইহুদী মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিষযুক্ত গোশত খেতে দিয়েছিল। তিনি তাকে সংবাদ পাঠিয়ে বললেন, কেন তুমি এ কাজ করলে? মহিলাটি উত্তরে বলল, যদি তুমি সত্যিই আল্লাহ্র রাসূল হও, তবে আল্লাহ তোমাকে জানিয়ে দিবেন। আর তুমি যদি তাঁর রাসূল না হও, তবে আমি মানুষকে তোমার থেকে নিরাপদ রাখব! যখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এর যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন, তিনি হিজামা ব্যবহার করলেন। একদা ইহরাম অবস্থায় তিনি ভ্রমণে বের হ'লেন এবং ঐ বিষের যন্ত্রণা বোধ করলেন, তখন তিনি হিজামা ব্যবহার করলেন'।[৮২]

যাদু : ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন যাদু দ্বারা পীড়িত হন তখন তিনি মাথায় শিঙ্গা লাগান এবং এটাই সবচেয়ে উত্তম ঔষধ, যদি সঠিকভাবে করা হয়।[৮৩]

হিজামা করার স্থানসমূহ : আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন স্থানে ঘাড়ের দু'টি রগে এবং কাঁধে হিজামা করিয়েছেন।[৮৪]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মাথায় হিজামা লাগিয়েছিলেন।[৮৫]

আবু কাবশাহ আনমারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মাথার মাঝখানে এবং দুই কাঁধের মাঝে হিজামা করতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি নিজ শরীরের এ অংশে হিজামা করাবে, সে তার কোন রোগের চিকিৎসা না করালেও কোন ক্ষতি হবে না।[৮৬]

জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাড় মচকে গেলে তিনি এর জন্য হিজামা করান।[৮৭]

আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যথার কারণে ইহরাম অবস্থায় তাঁর পায়ের উপরিভাগে হিজামা করিয়েছেন।[৮৮]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, 'দাঁতে, মুখে এবং গলায় ব্যথা হ'লে থুতনির নীচে হিজামা লাগালে উপকার পাওয়া যায়, যদি তা সঠিক সময়ে করা হয়। এটা মাথা ও চোয়াল শোধন করে।

পায়ের সাফিনায় (যা গোড়ালির বড় শিরা) পাংচারিং করার পরিবর্তে পায়ের পাতার সম্মুখে হিজামা লাগানো যেতে পারে। থাই এবং পায়ের পিছনের গোশতের আলসারের চিকিৎসায় এটি উপকারী। তাছাড়া রক্তস্রাবে বাধা ও অণ্ডকোষের চামড়ার ক্ষতে তা ব্যবহারযোগ্য।

উরুতে ব্যথা, চুলকানী ও খোসপাঁচড়ার চিকিৎসা হিসাবে বুকের নিচে হিজামা লাগানো উপকারী। এতে পিঠের গেঁটে বাত, অর্শ, গোদ রোগ, খোসপাঁচড়ার প্রতিরোধে সাহায্য করে।[৮৯]

মহিলাদের জন্য হিজামা : জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, উম্মে সালামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে হিজামা করার জন্য অনুমতি চাইলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে হিজামা লাগিয়ে দিতে আবু তাইবা (রাঃ)-কে আদেশ দিলেন। জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমার মনে হয়, আবু তাইবা তার (উম্মে সালামার) দুধভাই অথবা একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ছিলেন।[৯০]

পরিশেষে বলা যায়, হিজামা নববী চিকিৎসা। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমতে ব্যাক পেইন, উচ্চ রক্তচাপ, পায়ে ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা, মাথাব্যথা (মাইগ্রেইন), ঘাড়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, জয়েন্টে পেইন, আর্থাইটিজ, যাদু, বাত, ঘুমের ব্যাঘাত, থাইরয়েড ব্যাঘাত, জ্ঞান এবং স্মৃতিশক্তিহীনতা, ত্বকের বর্জ্য পরিষ্কার, অতিরিক্ত স্রাব নিঃসরণ থামানো, অর্শ, অণ্ডকোষ ফোলা, পাঁচড়া, ফোঁড়া ইত্যাদি রোগ ভাল হ'তে পারে।

---

৮০. আবুদাঊদ হা/৩৮৫৮, সনদ হাসান।
৮১. ইবনে মাজাহ হা/৩৪৮৭, সনদ হাসান।
৮২. মুসনাদে আহমাদ ১/৩০৫, সনদ হাসান।
৮৩. যাদুল মা'আদ ৪/১২৫-১২৬।
৮৪. আবুদাঊদ হা/৩৮৬০; ইবনে মাজাহ হা/৩৪৮৩, হাদীছ ছহীহ।
৮৫. বুখারী হা/৫৬৯৯।
৮৬. আবুদাঊদ হা/৩৮৫৯; ইবনে মাজাহ হা/৩৪৮৪, সনদ ছহীহ।
৮৭. আবুদাঊদ হা/৩৮৬৩; ইবনে মাজাহ হা/৩৪৮৫, সনদ ছহীহ।
৮৮. আবুদাঊদ হা/১৮৩৭, সনদ ছহীহ।
৮৯. যাদুল মা'আদ ৪/৫৮।
৯০. আবুদাঊদ হা/৪১০৫; ইবনে মাজাহ হা/৩৪৮০, সনদ ছহীহ।

নেতৃত্বের মোহ

মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

সারা জাহানের মালিকের জন্য সকল প্রশংসা। দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক নবী আল-আমীনের উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীদের সকলের উপর। অতঃপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মোহ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মানুষের আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতাকে বিনষ্ট করে দেয়। এর ফলে দুনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক গাঢ় হ'তে থাকে এবং আখিরাত হয়ে পড়ে উপেক্ষিত। এটা এক দুরারোগ্য মরণব্যাধি। এর জন্য ধন-সম্পদ ব্যয়িত হয় এবং রক্তারক্তি খুনোখুনি ঘটে। এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ভাইয়ে ভাইয়ে এমনকি পিতা-পুত্রের মাঝেও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এজন্যই এ ব্যাধিকে 'সুপ্তবাসনা' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ ভয়াবহ ও মারাত্মক বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে আমরা আলোচনা করব। প্রথমেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি লালসাকে অবচেতন মনের 'সুপ্তবাসনা' নামকরণের মূলভিত্তি কী তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তারপর একে একে শাসন ব্যবস্থার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, এ বিষয়ে একজন মুসলিমের ভূমিকা, শাসন ব্যবস্থার প্রতি লালসার প্রকারভেদ, শাসন ক্ষমতা যাহির করার ক্ষেত্র, শাসন ক্ষমতা প্রীতির কারণ এবং এর চিকিৎসা বা প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করব। অবশ্য এ লেখা প্রস্তুত ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যারা যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আমি মোটেও কুণ্ঠাবোধ করছি না। সবার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট উপকারী ইলম এবং নেক আমলের তাওফীক কামনা করছি।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রীতিকে সুপ্ত বাসনা নামকরণ

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রীতিকে অবচেতন মনের সুপ্ত বাসনা নামকরণের মূলে রয়েছে শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি মাওকূফ হাদীছ। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় তিনি অনবরত কাঁদছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবু ইয়া'লা, আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর যে জিনিসের ভয় করছি তা হ'ল অবচেতন মনের মাঝে লালিত সুপ্তবাসনা এবং স্পষ্টভাবে লোক দেখানো কাজ। নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তোমাদের শাসকবর্গের পক্ষ থেকে ব্যতীত কিছুই দেওয়া হবে না, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তোমাদের শাসকবর্গের পক্ষ থেকে ব্যতীত কিছুই দেওয়া হবে না, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তোমাদের শাসকবর্গের পক্ষ থেকে ব্যতীত কিছুই দেওয়া হবে না। তারা এমন যে, ভাল কাজের আদেশ দিলেও তা পালিত হয়, আবার মন্দ কাজের আদেশ দিলেও তা পালিত হয়। আর মুনাফিকের অবস্থা কী? মুনাফিক তো আসলে সেই উটের মত, যাকে গলায় রশি পেঁচিয়ে দেওয়া হয়েছে ফলে রশিতে ফাঁস লেগে সে মারা গেছে। মুনাফিক কখনই মুনাফিকীর ক্ষতি হ'তে নিজকে রক্ষা করতে পারবে না।[৯১]

ইমাম আবুদাঊদ সিজিসতানী (রহঃ) মনের সুপ্তবাসনা (الشهوة الخفية)-কে حب الرئاسة বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রীতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আবুদাঊদ (রহঃ)-এর পুত্র আবুবকর বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, شهوة خفية বা মনের সুপ্তবাসনা হ'ল حب الرياسة বা নেতৃত্বের মোহ।[৯২] আল্লাহই ভাল জানেন, দৃশ্যত এটা একটা উদাহরণমূলক ব্যাখ্যা। এজন্যই আবু উবায়েদ (রহঃ) বলেছেন, الشهوة الخفية। বা মনের সুপ্তবাসনার অর্থ সম্পর্কে মনীষীগণ মতানৈক্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, الشهوة الخفية দ্বারা মেয়ে লোক ও অন্য কোন কিছুর কামনার কথা বলা হয়েছে। আমার (আবু উবায়েদ) মতে, এটি কোন একটি জিনিসের সাথে খাছ বা নির্দিষ্ট নয়; বরং সকল প্রকার পাপ কাজই সুপ্তবাসনা, যা পাপী ব্যক্তি করার জন্য মনের কোণে লুকিয়ে রাখে এবং তা করতে অনবরত সুযোগ খোঁজে, যদিও সে তা এখনো বাস্তবে রূপায়িত করেনি।[৯৩] তবে শিক্ষিত সমাজে আবুদাঊদ (রহঃ) প্রদত্ত ব্যাখ্যাই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ফলে الشهوة الخفية বা সুপ্তবাসনার ভিন্ন কোন অর্থ করার নিদর্শন বর্তমান না থাকলে তা দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রীতিই বুঝাবে। বলা যায় এটি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রীতি সুপ্তবাসনার একটি প্রতীকী নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন, মানুষের মনে অনেক বাসনাই সুপ্ত থাকে, যা সে বুঝতে পারে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মোহ অনেক মানুষের মনের মাঝে লুক্কায়িত তেমনি একটি সুপ্তবাসনা। লোকটা হয়ত খাঁটি মনে আল্লাহ্র ইবাদত করে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সমস্যাবলীই বা কী, আর দোষ-ত্রুটিই বা কোথায় তাও সে হয়ত জানত না। কিন্তু যেকোনভাবে তার সামনে ক্ষমতা লাভের কোন একটি সুযোগ এসে গেল অমনিই সে তা লুফে নিতে তৎপর হয়ে উঠল। অথচ তার মাঝে যে ক্ষমতার বাসনা ছিল তা সে এর আগ মুহূর্তেও বুঝে উঠতে পারেনি। পরিবেশ অনুকূল হওয়ায় সেই সুপ্ত বাসনা এখন জেগে উঠেছে। ক্ষমতার সিঁড়িতে এভাবে বহু মানুষই পা রেখেছে। এজন্যই ক্ষমতার এই মোহকে 'সুপ্তবাসনা' বলা হয়।[৯৪]

রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা (حاجة الناس إلى الولاية) :

ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন, জনগণের শাসনভার গ্রহণ ও পরিচালনা দ্বীনের অন্যতম গুরুদায়িত্ব। বরং দ্বীন ও দুনিয়ার অস্তিত্ব এই শাসন ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্র ছাড়া কোন মতে চলতে পারে না। কেননা মানুষ একটি সংঘবদ্ধ জীব। তাদের নানামুখী প্রয়োজন পূরণে সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন রয়েছে। আর

** সহকারী শিক্ষক, হরিণাকুণ্ডু সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

৯১. ইবনুল মুবারক, আয-যুহ্দ, পৃঃ ১৬।
৯২. ইবনু তায়মিয়া, মাজমূঊ ফাতাওয়া, ১৬/৩৪৬।
৯৩. আবু উবায়েদ, গারীবুল হাদীছ ৪/১৭১।
৯৪. মাজমূঊ ফাতাওয়া ১৬/৩৪৬।

সংঘবদ্ধ হ'লেই সেখানে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন নেতা থাকা আবশ্যক। এজন্যই নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ 'যখন তিন জন মানুষ ভ্রমণে বের হবে তখন যেন তারা তাদের কোন একজনকে আমীর বা দলনেতা বানিয়ে নেয়'।[৯৫] সফরের মত একটি ছোট্ট জোটবদ্ধতায় যেখানে নবী করীম (ছাঃ) নেতা নিয়োগকে আবশ্যিক বা ফরয ধার্য করেছেন, তখন সব রকমের সংঘবদ্ধতায় যে আমীর বা নেতা নিয়োগ করা ফরয তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ তা'আলা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ ফরয করেছেন। কিন্তু ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছাড়া তা কার্যকরী হ'তে পারে না। অনুরূপভাবে জিহাদ, সুবিচার, হজ্জ পালন, জুম'আ, দুই ঈদের ছালাত কায়েম, অত্যাচারিতের সাহায্য এবং আল্লাহ প্রদত্ত দণ্ডবিধি কার্যকর ক্ষমতা ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব ব্যতীত পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করা যায় না। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, 'কোন শাসক ব্যতীত একটি রাত কাটানো অপেক্ষা একজন যালেম সরকারের অধীনে ষাট বছর পার করাও অনেক ভাল'। অভিজ্ঞতাও সে কথা বলে।[৯৬]

ফলে জনগণের সার্বিক কার্যাবলীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এমন একজন নির্বাহীর প্রয়োজন, যিনি সেগুলো নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবেন, সকল বিভাগের নেতৃত্ব দিবেন এবং সকল কাজের দায়-দায়িত্ব বহন করবেন।

শাসনক্ষমতা লাভের ক্ষেত্রে একজন মুসলমানের ভূমিকা (موقف المسلم من الولاية) : হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا،

আব্দুর রহমান ইবনু সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে আব্দুর রহমান, তুমি কখনো নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা তুমি যদি চেয়ে নিয়ে তা লাভ কর, তাহ'লে তোমাকে ঐ দায়িত্বের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে (অর্থাৎ তুমি দায়িত্ব পালনে হিমশিম খাবে, কিন্তু কোন সহযোগিতা পাবে না)। আর না চাইতেই যদি তা পাও তাহ'লে তুমি সেজন্য সাহায্যপ্রাপ্ত হবে'।[৯৭]

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। আমার সাথে ছিল আশ'আরী গোত্রের দু'জন লোক। তাদের একজন ছিল আমার ডানে এবং অন্যজন ছিল আমার বামে। তারা দু'জনেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কার্যভার চেয়ে বসল। নবী করীম (ছাঃ) সে সময় মেসওয়াক করছিলেন। আমি তাঁর ঠোঁটের নিচে মেসওয়াক কীভাবে রয়েছে আর ঠোঁট সঙ্কুচিত হয়ে আসছে সে দৃশ্য এখনো যেন দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, হে আবু মূসা বা হে আব্দুল্লাহ বিন কায়েস! ব্যাপার কি? ওদের কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তার শপথ, তারা দু'জন যেমন তাদের মনের কথা আমাকে জানায়নি তেমনি এখানে এসে তারা যে কার্যভার চেয়ে বসবে তাও আমি বুঝতে পারিনি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যেসব পদ আমাদের রয়েছে তা যে চেয়ে নেয় আমরা কখনই তাকে সে পদে নিযুক্ত করব না। তবে হে আবু মূসা, আব্দুল্লাহ ইবনু কায়েস! তুমি (অমুক পদে দায়িত্ব পালনের জন্য) যাও। তারপর তিনি তাঁকে ইয়ামান প্রদেশের শাসক করে পাঠালেন।[৯৮]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য খুব আগ্রহী হবে। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন তা লজ্জা (ও আফসোসের) কারণ হবে। দুধদানকারী হিসাবে (ক্ষমতার দিনগুলোতে নানান সুযোগ সুবিধা ভোগের দিক দিয়ে) ক্ষমতা কতই না ভাল। কিন্তু ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি কতই না নিকৃষ্ট পরিণামবহ'।[৯৯]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ক্ষমতা দুধদানকারী পশুতুল্য। কারণ ক্ষমতা থাকলে পদ, পদবী, সম্পদ, হুকুমজারী, নানা রকম ভোগ-বিলাসিতা ও মানসিক তৃপ্তি অর্জিত হয়। কিন্তু মৃত্যু কিংবা অন্য কোন কারণে ক্ষমতা যখন চলে যায়, তখন আর তা মোটেও সুখকর থাকে না। বিশেষত আখেরাতে যখন এজন্য নানা ভীতিকর অবস্থার মুখোমুখি হ'তে হবে তখন ক্ষমতা মহাজ্বালা হয়ে দেখা দিবে।[১০০]

আল্লামা আব্দুর রহমান সা'দী বলেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা জনগণের উপর কর্তৃত্বমূলক যে কোন পদ মানুষের চেয়ে নেওয়া উচিত নয় এবং সে জন্য নিজেকে যোগ্য বলে উপস্থাপন করাও কাম্য নয়; বরং এজন্য আল্লাহ্র নিকট দায়িত্ব মুক্ত ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবন প্রার্থনা করা উচিত। কেননা সে তো জানে না যে, শাসন ক্ষমতা তার জন্য কল্যাণকর হবে, না অকল্যাণকর। সে এও জানে না যে, এই দায়িত্ব সে পালন করতে পারবে কি-না? তারপরও যখন সে দায়িত্বের জন্য আবেদন-নিবেদন করে, তখন তো তা পেলে তার নিজের দিকেই তা সোপর্দ করে দেয়া হয়। আর যখন বান্দার দিকে দায়িত্ব সোপর্দ করে দেয়া হয়, তখন সেজন্য সে আল্লাহ্র সহায়তা পায় না। তার সব কাজ সুচারু রূপে করতে পারে না এবং সাহায্য-সহযোগিতাও পায় না। কেননা তার ক্ষমতা চেয়ে নেয়া দু'টি অবৈধ বিষয়ের বার্তা প্রদান করে।

৯৫. আবুদাঊদ হা/২৬০৮, আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন।
৯৬. আস-সিয়াসাতুশ শারঈয়্যাহ, পৃঃ ১২৯।
৯৭. বুখারী হা/৭১৪৭; মুসলিম হা/১৬৫২।
৯৮. মুসলিম হা/১৮২৪।
৯৯. বুখারী হা/৭১৪৮।
১০০. ফাতহুল বারী ১৩/১২৬।

প্রথমতঃ পার্থিব সম্পদ ও ক্ষমতার প্রতি লোভ। এ ধরনের লোভ আল্লাহ্র সম্পদে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে এবং আল্লাহ্র বান্দাদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ির পদক্ষেপে উদ্বুদ্ধ করে।

দ্বিতীয়তঃ এতে নিজেকে নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবার এবং আল্লাহ্র সাহায্যের দরকার না লাগার গন্ধ রয়েছে।

কিন্তু যার ক্ষমতার প্রতি লোভ ও ঝোঁক নেই এমন ব্যক্তি বিনা আবেদনে ক্ষমতা পেলে এবং দায়িত্ব পালনে নিজেকে অক্ষম মনে করলেও তার যে কোন সমস্যায় আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করবেন, তাকে তার নিজের ক্ষমতার উপর ছেড়ে দিবেন না। কেননা সে তো এই বিপদ নিজ থেকে ডেকে আনেনি। যে স্বেচ্ছায় বিপদ ডেকে আনেনি তার ভার বহনের ব্যবস্থা করা হয় এবং তার দায়িত্ব পালনের যোগ্যতাও তৈরী করে দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র উপর তার ভরসা জোরদার হয়। আর বান্দা যখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করে কোন কাজে আগুয়ান হয় তখন সফলতা তার হাতে এসে ধরা দেয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী 'তুমি সেজন্য সাহায্যপ্রাপ্ত হবে' (اعنت عليها) এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, ইমারত প্রভৃতি পার্থিব নেতৃত্ব দ্বীন ও দুনিয়া উভয়কে নিজের মধ্যে শামিল করে। কেননা সবরকম কর্তৃত্বের মূল উদ্দেশ্য মানুষের দ্বীন-ধর্ম এবং জাগতিক সংশোধন ও কল্যাণ সাধন করা। এজন্যই প্রশাসনিক নেতৃত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আদেশ, নিষেধ, ফরয বা আবশ্যিক কার্যাবলী সম্পাদনে চাপ প্রয়োগ, হারাম বা নিষিদ্ধ কার্যাবলী না করতে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ, নানা প্রকার অধিকার আদায়ে বাধ্যকরণ ইত্যাদি। অনুরূপভাবে যে বা যারা আল্লাহকে রাযী-খুশি করার নিয়তে যথাযথ দায়িত্ব পালনের মানসে রাজনীতি[১০১] ও যুদ্ধ-জিহাদ করবে তার বা তাদের জন্য এসব কাজ উত্তম ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু যারা এরূপ নিয়ত ও সদিচ্ছা ছাড়া রাজনীতি ও যুদ্ধ ইত্যাদি করবে, তাদের জন্য তা মারাত্মক বিপদ হিসাবে গণ্য হবে। আর যেহেতু বহু ফরয ও আবশ্যিক বিষয় বাস্তবায়ন শাসনক্ষমতার উপর নির্ভরশীল সেহেতু এই ক্ষমতা অর্জন ও পরিচালনা ফরযে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত।[১০২]

এজন্যই বিশেষ প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পদ চেয়ে নেওয়া জায়েয আছে। যেমন মিসর রাজার নিকট ইউসুফ (আঃ) এমনই একটি পদ প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন, قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيْمٌ 'ইউসুফ বলল, (হে রাজা) আপনি আমাকে দেশের খাদ্য ভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিন। আমি অবশ্যই একজন বিশ্বস্ত রক্ষক ও (এ কাজ পরিচালনায়) বিজ্ঞ বটে' *(ইউসুফ ১২/৫৫)*।

আল্লামা সা'দী বলেন, তিনি বিশেষ কিছু দিক লক্ষ্য করে পদ চেয়েছিলেন যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ পারবে না বলে তার মনে হয়েছিল। যেমন শস্য ভাণ্ডার পরিপূর্ণরূপে সংরক্ষণ এবং শস্য ভাণ্ডারের সাথে সম্পর্কিত সকল দিকের জ্ঞান, যথা : উন্নত উৎপাদন, সুষ্ঠু বিলিবণ্টন ও এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ইনছাফ প্রতিষ্ঠা। এ কারণেই রাজা তাঁকে একান্ত নিজের লোক করে নেন এবং তাঁকে তার অগ্রবর্তী লোকদের তালিকায় ঠাঁই দেন। আবার একইভাবে ইউসুফ (আঃ)-এর উপরও রাজা ও তার প্রজাদের কল্যাণে নিবেদিত হয়ে কাজ করা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। তাইতো দেখা যায়, তিনি যখন খাদ্য দপ্তরের দায়িত্ব নেন তখন অধিক খাদ্য ফলানোর জন্য চাষাবাদের উপর জোর দেন।[১০৩]

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রীতি এবং আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের জন্য নেতৃত্বপ্রীতি (حب الرئاسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله)-র মধ্যে পার্থক্য হ'ল নিজ জীবনের প্রতি গুরুত্বারোপ ও নিজের অধিকার ও প্রাপ্য আদায়ে সচেষ্ট হওয়া এবং আল্লাহ্র হুকুমের প্রতি গুরুত্বারোপ ও তার উপদেশ প্রদানের মাঝে পার্থক্যের মতই। কেননা যে আল্লাহ্র কল্যাণকামী সে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে, তাকে ভালবাসে, তার হুকুম সর্বক্ষেত্রে মেনে চলা হোক, কোন নাফরমানী করা না হোক সেটা সে প্রিয় মনে করে। সে চায় যে, আল্লাহ্র কথা (আইন) সর্বোচ্চ স্থানে থাকুক এবং দ্বীন সর্বতোভাবে আল্লাহ্র জন্য হয়ে যাক, সকল মানুষ আল্লাহ্র আদেশ মেনে চলুক, নিষেধ থেকে দূরে থাকুক। এভাবে সে দাসত্ব ও আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র কল্যাণ কামনা করে এবং আল্লাহ্র দিকে তার বান্দাদের দাওয়াত দানের মাধ্যমে মানুষ ও সৃষ্টির কল্যাণ কামনা করে। ফলে সে দ্বীন ইসলামের খাতিরে ইমামত বা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব পসন্দ করে। বরং সে তাকে মুমিন মুত্তাক্বীদের নেতা বানানোর জন্য তার রবের নিকট দো'আ করে যাতে মুত্তাকীরা তার অনুসরণ করে, যেমন করে সে মুত্তাক্বীদের অনুসরণ করেছে। যেমন এরশাদ হচ্ছে, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَاماً 'হে আমাদের মালিক! তুমি আমাদের এমন জীবন সঙ্গিনী ও সন্তানাদি দাও যারা হবে নয়নপ্রীতিকর এবং তুমি আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের নেতা বানাও' *(ফুরক্বান ২৫/৭৪)*।

পক্ষান্তরে যারা নিছক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লিপ্সু তারা এই ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে পৃথিবীতে উঁচু আসন লাভ করতে চায়। দেশের

---

১০১. 'সিয়াসাত' (السياسة) অর্থ প্রচলিত ক্ষমতা দখলের রাজনীতি নয়, বরং সমাজ সংশ্লিষ্ট সকল কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। সেখানে যে ব্যক্তি যে কাজের যোগ্য, সে ব্যক্তি সে কাজ করবে স্রেফ আল্লাহকে খুশী করার জন্য। নিজের বা নিজ দলের অন্যায় স্বার্থ হাছিলের জন্য নয়। দেশের নেতার কাছে নিজের যোগ্যতা তুলে ধরা ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে জনকল্যাণের সুযোগ প্রার্থনা করা নিঃসন্দেহে জায়েয। যেমনটি ইউসুফ (আঃ) করেছিলেন। যেমনটি এ যুগেও যেকোন কর্মের ক্ষেত্রে পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা তুলে ধরা হয়। কিন্তু এই অজুহাতে প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নেতৃত্বের জন্য প্রার্থী হওয়া যাবে না। কেননা এখানে নেতার কাছে দায়িত্ব চাওয়া হয় না। বরং লোকদের কাছে নিজের জন্য নেতৃত্ব চাওয়া হয়। তাছাড়া এখানে মানুষের মনগড়া আইন রচনার ও মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ভোট চাওয়া হয়। আল্লাহ্র আইন ও তাঁর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। *(স.স.)*।

১০২. বাহজাতু কুলূবিল আবরার, পৃঃ ১০৫-১০৬।

১০৩. ঐ, পৃঃ ১০৬।

মানুষ যাতে তাদের দাসে পরিণত হয় এবং তাদের পেছনে থাকে সেজন্য তাদের চেষ্টার অন্ত থাকে না। জনগণ সর্বক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করবে কিন্তু তারা তাদের উপর খবরদারী করবে এবং বল প্রয়োগ করবে সেই লক্ষ্যেও তারা ক্ষমতা পেতে চায়। তাদের এসব উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গিয়ে যে কত রকম অনিষ্ট সৃষ্টি হয়, তা স্রেফ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। যেমন বিদ্রোহ, হিংসা, স্বেচ্ছাচারিতা, অন্তর্দাহ, যুলুম-অত্যাচার, ফিতনা-ফাসাদ, আল্লাহ্‌র হক আদায়ের ক্ষেত্রে আত্মম্ভরিতা ও উন্নাসিকতা প্রদর্শন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করা এবং অসম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সম্মানিত করা ইত্যাদি না হ'লে পার্থিব নেতৃত্ব যেন কখনই পূর্ণতা পায় না। আর এ ধরনের ক্ষমতার নাগাল পেতেও তাকে কয়েকগুণ বেশী বিপর্যয়ের মুখোমুখি হ'তে হয়।[১০৪]

শাসন ক্ষমতার প্রতি লালসার প্রকারভেদ (صور وأحوال حب الرئاسة) :

নেতৃত্বের বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শাসনক্ষমতা দুই প্রকার। যথা: এক. পার্থিব ক্ষমতা, দুই. দ্বীনী বিদ্যা বিজড়িত ক্ষমতা।

ইবনু রজব বলেছেন, সম্মান লাভের প্রতি লালসা দু'প্রকার। প্রথম প্রকার- রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ অর্জনের মাধ্যমে সম্মান লাভের প্রয়াস। এটি খুবই মারাত্মক। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ক্ষমতা মানুষকে আখেরাতের কল্যাণ ও মান-সম্মান থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَ يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ 'এটা পরকালের গৃহ যা আমরা নির্ধারিত করে রেখেছি তাদের জন্য, যারা দুনিয়ায় কোন রকম প্রাধান্য বিস্তার করতে চায় না এবং কোন অশান্তি কর কিছু করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাক্বীদের জন্যই রয়েছে' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।[১০৫]

দ্বিতীয় প্রকার- ধর্মীয় বিষয়াদির মাধ্যমে সম্মান অর্জনের প্রয়াস। যেমন দ্বীনী বিদ্যা, আমল-আখলাক, তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা, সংসারে অনাসক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের নযর নিজের দিকে ফেরাতে চেষ্টা করা। এটি প্রথম প্রকারের থেকেও জঘন্য ও কদর্য। এর বিপর্যয় ও ভয়াবহতা আরো মারাত্মক। কেননা দ্বীন-ইলম, আমল-আখলাক ও পরহেযগারিতা দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র নিকট উঁচু মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নে'মত জান্নাত লাভ এবং তার খুব নিকটজনের মাঝে পরিগণিত হওয়াই একমাত্র কাম্য হওয়া উচিৎ। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, ইলমের মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করা হয় বলেই তার এত মর্যাদা, নতুবা তা অন্য আর পাঁচটা জিনিসের মতই। অতএব এই ইলমের অংশবিশেষ দ্বারাও যদি এই নশ্বর জগতের কোন বস্তু তলব করা হয়, তাহ'লে তাও দু'শ্রেণীতে পড়বে।

প্রথম শ্রেণী : ধনদৌলত কামাইয়ের জন্য দ্বীনী বিদ্যার ব্যবহার। এতে সম্পদের প্রতি এক ধরনের লোভ ফুটে উঠবে এবং হারাম উপায়ে তা উপার্জনের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে প্রমাণিত হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী : দ্বীনী বিদ্যা, আমল ও পরহেযগারিতা দ্বারা মানব জাতির উপর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যাহির করার ইচ্ছা। মানুষ যাতে তাদের অনুগত থাকে, তাদের সামনে মাথা নত করে এবং তাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এই শ্রেণীর বিদ্বানরা সেটাই আশা করে। অধিকন্তু তারা মানুষের মাঝে অন্য আলেমদের তুলনায় তাদের জ্ঞান গরিমার আধিক্য যাহির করতে চায়, যাতে তাদের উপর এদের প্রাধান্য বজায় থাকে। এরূপ ইচ্ছা পোষণকারী বিদ্বানদের প্রতিশ্রুত স্থান জাহান্নাম। কেননা সৃষ্টিকুলের উপর বড়াই করার ইচ্ছা আপনা থেকেই হারাম, আর যখন তাতে (বড়াইয়ের ক্ষেত্রে) বিদ্যার মত একটি পারলৌকিক উপকরণ ব্যবহার করা হবে তখন তো তা অর্থ-বিত্ত ও ক্ষমতার মত বড়াইয়ের পার্থিব উপকরণ ব্যবহার থেকেও ভীষণ কদর্য ও জঘন্য রূপ নিবে।

কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ 'বোকাদের সঙ্গে বিতর্ক করা কিংবা আলেমদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা কিংবা জনগণের দৃষ্টি নিজের দিকে ফেরানোর মানসে যে বিদ্যা অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন'।[১০৬]

শাসন ক্ষমতা প্রীতির দু'টি অবস্থা রয়েছে :

প্রথম : ক্ষমতা লাভের পূর্বেকার অবস্থা। কিছু মানুষ এমন আছে যারা শাসন ক্ষমতা লোভী। এই লোভের লক্ষণ ও চিহ্নগুলো তাদের মাঝে ভালভাবে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ ক্ষমতার জন্য তারা নানা রকম চেষ্টা-তদবির করে; তাতেই মানুষ বোঝে যে এরা ক্ষমতাপ্রত্যাশী। তারপর তাদের কারো কপালে ক্ষমতা জোটে, আবার কারো জোটে না। এ কথার সমর্থন মেলে আল্লাহ্‌র নিম্নের বাণীতে, مَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً 'যারা দুনিয়া পেতে চায় তাদের মধ্যে আমি যাকে ইচ্ছা করি দুনিয়ার সম্পদ থেকে আমার ইচ্ছামাফিক তা দ্রুত দিয়ে দেই। তারপর তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে রাখি। যেখানে সে প্রবেশ করবে একান্ত নিন্দিত ও ধিকৃত অবস্থায়' *(ইসরাঈল ১৭/১৮)*।

দ্বিতীয় : ক্ষমতা লাভের পরের অবস্থা। অনেক মানুষ ক্ষমতা লাভের ব্যাপারে কখনো কখনো অনাগ্রহ প্রকাশ করে, তারপর যখন তা লাভ করে তখন তার হৃদয়-মন তার সাথে গেঁথে যায়। আবার কখনো ক্ষমতার সাথে তার একটু-আধটু যোগ

১০৪. আর-রূহ, পৃঃ ২৫২-২৫৩।
১০৫. দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ের হাদীছ (২৯)-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।
১০৬. তিরমিযী হা/২৬৫৪, আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ ছহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব ১/২৫ পৃঃ; ঈষৎ পরিবর্তনসহ দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ের হাদীছের ব্যাখ্যা ৪৭-৫৩ পৃঃ।

থাকে, তারপর তা হাতে আসার পর সে যোগ খুব বাড়তে থাকে। কেননা এ সময় সে ক্ষমতার স্বাদ এবং তা হারানোর ভয়ে তাকে আরো আঁকড়ে ধরতে চায়। ইবনু রজব বলেছেন, ‘জেনে রাখ, মান-মর্যাদার লোভ মহাক্ষতি ডেকে আনে। মর্যাদা লাভের আগে তা অর্জনের পথ-পদ্ধতি বা কলাকৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করতে গিয়ে মানুষ অনেক হীন ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। আবার মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে অন্যের উপর নিপীড়ন, ক্ষমতা প্রদর্শন, দাম্ভিকতা দেখানো ইত্যাদি ক্ষতিকর জিনিসের উদগ্র নেশায় পেয়ে বসে।[১০৭] *[চলবে]*

১০৭. ঐ, পৃঃ ৩২।

আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম

মূল (উর্দূ) : শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ

*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ**

ভূমিকা : সাহায্যপ্রাপ্ত দল, নাজাতপ্রাপ্ত ফিরক্বা এবং হক্বের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্যগত নাম ‘আহলেহাদীছ’। এরা ঐ সমস্ত মহান ব্যক্তি, যারা সর্বযুগে ছিলেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى مَنْصُورِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ ‘আমার উম্মতের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি দল (আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হ’তে) সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হ’তে থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না’।[১০৮]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث، فلا أدري من هم ‘সাহায্যপ্রাপ্ত এই দলটি যদি আছহাবুল হাদীছ (আহলেহাদীছ) না হয়, তবে আমি জানি না তারা কারা’?[১০৯]

ইমাম হাকেম (রহঃ) বলেন, ‘ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, সাহায্যপ্রাপ্ত দলটি হচ্ছে আছহাবে হাদীছের দল। আহলেহাদীছের চাইতে কারা এ হাদীছের আওতাভুক্ত হওয়ার অধিক হক্বদার হ’তে পারেন? যারা (আহলেহাদীছগণ) সৎ মানুষদের পথে চলেন, সালাফে ছালেহীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদের এবং বিদ‘আতীদের সামনে বুক ফুলিয়ে জবাব প্রদানের মাধ্যমে তাদের যবান বন্ধ করে দেন। যারা আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার জীবনকে ত্যাগ করে বিশুষ্ক মরুভূমি এবং তৃণ-লতা ও পত্রহীন এলাকায় (হাদীছ সংগ্রহের জন্য) সফর করাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। তারা আহলে ইলম এবং আহলে আখবারের সংস্পর্শে আসার জন্য ভ্রমণের কঠিন পরিস্থিতিকেও শোভনীয় মনে করেন’।[১১০]

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উস্তাদ ইমাম আলী ইবনুল মাদিনী (রহঃ) বলেছেন, هم أصحاب الحديث ‘তারা হচ্ছে আছহাবুল হাদীছ’। অর্থাৎ ‘সাহায্যপ্রাপ্ত দল’ দ্বারা আহলেহাদীছগণ উদ্দেশ্য।[১১১]

হাদীছ জগতের সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) ‘ত্বায়েফাহ মানছূরাহ’ সম্পর্কে বলেন, هم أهل الحديث ‘তারা হ’লেন আহলেহাদীছ’।[১১২]

ইমাম ইবনে হিব্বান উপরোক্ত হাদীছের উপর এই মর্মে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন যে, ذِكْرُ إِثْبَاتِ النُّصْرَةِ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ‘ক্বিয়ামত অবধি আল্লাহ কর্তৃক আহলেহাদীছদের সাহায্যপ্রাপ্তি প্রমাণিত হওয়ার বিবরণ’।[১১৩]

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মুফলিহ আল-মাক্বদেসী বলেন, أَهْلُ الْحَدِيث هُمْ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ الْقَائِمُونَ عَلَى الْحَقِّ ‘আহলেহাদীছরাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল। যারা হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন’।[১১৪]

ইমাম হাফছ বিন গিয়াছ এবং ইমাম আবুবকর বিন আইয়াশ (রহঃ)-এর বক্তব্যকে সমর্থন ও সত্যায়ন করতঃ ইমাম হাকেম (রহঃ) বলেন, তারা দু’জন সত্যই বলেছেন যে, আহলেহাদীছগণ সৎ মানুষ। আর এমনটা কেনইবা হবেন না, তারা তো (কুরআন ও হাদীছের (মুকাবিলায়) দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছেন।[১১৫]

প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَوْلَى النَّاسِ بِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلاَةً ‘ক্বিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত ব্যক্তি আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে, যারা সবচেয়ে বেশী আমার উপরে দরূদ পাঠ করে’।[১১৬] এজন্যই আহলেহাদীছ পরিবারের ছোট ছোট বালক-বালিকাদের অন্তরে হাদীছের প্রতি গভীর অনুরাগ ও আকর্ষণ বিরাজিত। আর আহলেহাদীছগণ ক্বিয়াসী দৃষ্টিভঙ্গি এবং ফিক্বহী মাসআলার খুঁটিনাটি বিষয়ের পরিবর্তে কেবলমাত্র নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনাকেই পরকালে সৌভাগ্যবান হওয়ার মাধ্যম মনে করেন। তাই ইমাম আবূ হাতেম ইবনে হিব্বান আল-বাসতী (রহঃ) উপরোক্ত হাদীছ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন। তিনি বলেছেন, ক্বিয়ামত দিবসে আহলেহাদীছগণের রাসূল (ছাঃ)-এর সর্বাধিক নিকটে থাকার দলীল উক্ত হাদীছে বিদ্যমান। কেননা এই উম্মতের মধ্যে আহলেহাদীছদের চাইতে কোন দল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর বেশী দরূদ পাঠ করে না।[১১৭]

এত ফযীলত ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কতিপয় ব্যক্তি আহলেহাদীছদের বিরোধিতা করা, তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস-পরিহাস এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাকে নিজেদের পৈত্রিক অধিকার মনে করে। সম্ভবত এই সকল আহলেহাদীছ বিরোধীদের উদ্দেশ্য করেই ইমাম আহমাদ বিন সিনান আল-ওয়াসিত্বী (রহঃ) মন্তব্য করেছেন, لَيْسَ فِى الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ إِلاَّ وَ هُوَ يَبْغَضُ أَهْلَ الْحَدِيْثِ– ‘দুনিয়াতে এমন

---

* *সৈয়দপুর, নীলফামারী।*

১০৮. *ইবনে মাজাহ হা/৬; তিরমিযী হা/২১৯২, সনদ ছহীহ।*
১০৯. *ইমাম হাকেম, মা‘রিফাতু উলূমিল হাদীছ হা/২, সনদ হাসান।*
১১০. *ঐ, পৃঃ ১১২।*
১১১. *তিরমিযী হা/২১৯২ প্রভৃতি।*
১১২. *খত্বীব বাগদাদী, মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশ-শাফেঈ, পৃঃ ৪৭, সনদ ছহীহ।*
১১৩. *ছহীহ ইবনে হিব্বান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬১, হা/৬১।*
১১৪. *আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ, ১/২১১।*
১১৫. *মা‘রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ১১৩।*
১১৬. *তিরমিযী, হা/৪৮৪; সনদ হাসান।*
১১৭. ইবনে হিব্বান, হা/৯১১।

কোন বিদ'আতী নেই, যে আহলেহাদীছদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করে না'।[১১৮]

ইমাম হাকেম (রহঃ) বলেন, 'আমি সর্বত্র যত বিদ'আতী এবং নাস্তিকমনা মানুষ পেয়েছি, তারা সকলেই 'ত্বায়েফাহ মানছূরাহ' তথা আহলেহাদীছদেরকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত এবং আহলেহাদীছদেরকে নিকৃষ্টভাবে সম্বোধন করত (যেমন হাশাবিয়া)।[১১৯]

অথচ আমরা তাদেরকে বুঝাতে চাই যে, أهل الحديث هُمُو

أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا

'আহলেহাদীছগণই মূলত আহলে নবী বা নবী (ছাঃ)-এর পরিবার। যদিও তারা সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেননি। তথাপি তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুগন্ধীযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে নির্গত অমর বাণী দ্বারা উপকৃত হয়েই আসছেন'।

আলোচ্য গ্রন্থটি শায়খ হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ রচিত একটি চমৎকার গ্রন্থ। এতে বৈশিষ্ট্যগত নাম 'আহলেহাদীছ'-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত যাবতীয় প্রশ্ন, আপত্তি ও সমালোচনার জবাব প্রদান করা হয়েছে। দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপনের দৃষ্টিকোণ হ'তে এটি একটি সারগর্ভ ও অনন্য পুস্তক।*

আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম এবং এর পরিচিতি :

মুসলমানদের অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে। যেমন মুমিন, ইবাদুল্লাহ (আল্লাহ্র বান্দা), হিযবুল্লাহ (আল্লাহ্র দল)। তদ্রূপ ছাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, মুহাজির, আনছার ইত্যাদি নামসমূহ। ঠিক তেমনিভাবে ঐসকল গুণবাচক নাম সমূহের মধ্যে 'আহলেহাদীছ' ও 'আহলে সুন্নাত' উপাধিদ্বয় 'খায়রুল কুরূন' বা সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হ'তে সাব্যস্ত রয়েছে। মুসলমানদের মাঝে উভয় গুণবাচক উপাধির ব্যবহার নির্দ্বিধায় প্রচলিত আছে। বরং এর বৈধতার পক্ষে মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা রয়েছে।

'আহলেহাদীছ' এবং 'আহলে সুন্নাত' দু'টি সমার্থবোধক গুণবাচক নাম। যার দ্বারা ছহীহ আক্বীদা সম্পন্ন মুসলমানদের অর্থাৎ সাহায্য ও নাজাতপ্রাপ্ত দলের পরিচয় পাওয়া যায়।

'আহলেহাদীছ' এই গুণবাচক নাম এবং প্রিয় উপাধি দ্বারা দুই শ্রেণীর ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন মুসলমান উদ্দেশ্য।

ক. সম্মানিত মুহাদ্দিছগণ।

খ. তাদের অনুসারী আম জনতা, যারা হাদীছের উপরে আমল করে থাকে।

প্রথম প্রকার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) মুহাদ্দিছগণকে 'আহলেহাদীছ' বলে অভিহিত করেছেন।[১২০]

ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তান একজন রাবী প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি আহলেহাদীছ ছিলেন না।[১২১]

প্রমাণিত হ'ল যে, শুধুমাত্র হাদীছ বর্ণনাকারীদেরকেই আহলেহাদীছ বলা হ'ত না। বরং ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন হাদীছ বর্ণনাকারী তথা মুহাদ্দিছগণকেও আহলেহাদীছ বলা হ'ত।

এক জায়গায় হাফেয ইবনে হিব্বান আহলেহাদীছদের ৩টি আলামত বর্ণনা করেছেন :

ক. তারা হাদীছের উপর আমল করেন।

খ. তারা সুন্নাত তথা হাদীছের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকেন।

গ. তারা সুন্নাত বিরোধীদের মূলোৎপাটন করেন।[১২২]

আহলেহাদীছদের প্রসিদ্ধ দুশমন এবং যাকে তাকে কাফের আখ্যা দানকারী খারেজী জামা'আত 'জামাআতুল মুসলিমীন রেজিস্টার্ড'-এর প্রতিষ্ঠাতা মাসঊদ আহমাদ বিএসসি পরিষ্কারভাবে লিখেছেন, আমরাও মুহাদ্দিছগণকে আহলেহাদীছ বলে থাকি।[১২৩]

বর্তমানে জীবিত দেওবন্দী আলেমদের 'ইমাম' খ্যাত সরফরায খান ছফদর গাখড়ুভী লিখেছেন, আহলেহাদীছ বলতে ঐ সমস্ত ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যারা হাদীছ সংরক্ষণ ও অনুধাবনে এবং হাদীছ অনুসরণে প্রবল অনুরাগী।[১২৪]

অতঃপর সরফরায খান দীর্ঘ আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'এতে প্রতীয়মান হয় যে, যিনি হাদীছের ইলম হাছিল করেছেন, তা সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করেছেন এবং হাদীছ তাহকীক করেছেন, তাকেই আহলেহাদীছ বলা হয়। চাই সে ব্যক্তি হানাফী, মালেকী, শাফেঈ কিংবা হাম্বলী হৌক। এমনকি সে যদি শী'আও হয়ে থাকে, তথাপি সে আহলেহাদীছ।[১২৫]

এই উক্তিতে খান ছাহেব মুহাদ্দিছগণকে 'আহলেহাদীছ' নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তিনি শী'আ এবং অন্যদেরকেও আহলেহাদীছ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যা দলীলের ভিত্তিতে একেবারেই বাতিল এবং ভিত্তিহীন। এই বিষয়ে সামনে আলোচনা আসছে ইনশাআল্লাহ।

যুগ বিবেচনায় মুহাদ্দিছগণের কয়েকটি জামা'আত বা দল রয়েছে। যথা :

১. ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) :

হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কীর খলীফা ও জামে'আ নিযামিয়া, হায়দারাবাদের প্রতিষ্ঠাতা আনওয়ারুল্লাহ ফারূকী ফযীলত জঙ্গ লিখেছেন, 'প্রত্যেক ছাহাবী (রাঃ) আহলেহাদীছ ছিলেন। কেননা হাদীছ শাস্ত্রের সূচনা তাঁদের আমল থেকেই

** হাফেয নাদীম যহীর, ১২ই শা'বান, ১৪৩৩ হিজরী*

১১৮. *মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, হা/৬, সনদ ছহীহ।*

১১৯. *ঐ, পৃঃ ১১৫।*

১২০. *মাজমূ' ফাতাওয়া, ৪/৯৫।*

১২১. *ইমাম বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ২/৪২৯; আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, ৬/৩০৩।*

১২২. *ছহীহ ইবনে হিব্বান, আল-ইহসান, হা/৬১২৯; অন্য একটি কপির হাদীছ নং ৬১৬২।*

১২৩. *আল-জামা'আতুল ক্বাদীমাহ বেজওয়াবে আল-ফিরক্বাতুল জাদীদাহ, পৃঃ ৫।*

১২৪. *ত্বায়েফাহ মানছূরাহ, পৃঃ ৩৮; আল-কালামুল মুফীদ, পৃঃ ১৩৯।*

১২৫. *ত্বায়েফাহ মানছূরাহ, পৃঃ ৩৯।*

শুরু হয়েছে। কারণ তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছ থেকে হাদীছ গ্রহণ করে সরাসরি উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের আহলেহাদীছ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।[১২৬]

এখানে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ উল্লেখ্য যে, হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ গ্রন্থটি ক্বারী আব্দুল ক্বাইয়ূম যহীর আমাকে উপহার দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

দেওবন্দীদের প্রসিদ্ধ আলেম এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্দলভী লাহোরী লিখেছেন, 'সকল ছাহাবীই তো আহলেহাদীছ ছিলেন। কিন্তু আহলে রায়গণই ফৎওয়া প্রদান করতেন। পরবর্তীতে আহলে রায় উপাধিটি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং তার শিষ্যদেরকে প্রদান করা হয়েছে। ঐ যুগের সকল আহলেহাদীছ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে আহলে রায়দের ইমাম উপাধিতে ভূষিত করেছেন।[১২৭]

এই উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর সময়েও আহলেহাদীছগণ বিদ্যমান ছিলেন।

২. ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং পরবর্তীগণ :

শী'আ এবং বিদ'আতীদেরকে কয়েকটি কারণে আহলেহাদীছ বলা ভুল ও বাতিল। যেমন :

প্রথমত : ছহীহ হাদীছে এসেছে যে, 'ত্বায়েফাহ মানছূরাহ' সর্বদা বিজয়ী থাকবে...। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী, ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ ইমামগণ বলেছেন, ত্বায়েফাহ মানছূরাহ হচ্ছে 'আহলেহাদীছ'।[১২৮]

সুতরাং এমন কথা বলা কেবল বাতিলই নয়, বরং চরম ভ্রষ্টতা যে, শী'আ এবং বিদ'আতীরাও সাহায্যপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত : ইমাম আহমাদ বিন সিনান আল-ওয়াসিতী (রহঃ) বলেছেনে, ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أصحاب الحديث 'দুনিয়াতে এমন কোন বিদ'আতী নেই যে আহলেহাদীছের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করে না'।[১২৯]

এই মূল্যবান উক্তি দ্বারা স্পষ্টত বুঝা গেল যে, আহলেহাদীছ এবং আহলে বিদ'আত ভিন্ন ভিন্ন দল।

তৃতীয়ত : ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, إِذَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِّنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ فَكَأَنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَيًّا– 'আমি যখন কোন 'আহলেহাদীছ' ব্যক্তিকে দেখি তখন যেন রাসূল (ছাঃ)-কেই জীবন্ত দেখি'।[১৩০] অর্থাৎ আহলেহাদীছগণের মাধ্যমেই নবী করীম (ছাঃ)-এর দাওয়াত জীবিত রয়েছে।

এক্ষণে 'আহলেহাদীছ' দ্বারা যদি শী'আ ও বিদ'আতীকেও বুঝানো হয়, তবে কি ইমাম শাফেঈ (রহঃ) শী'আ, মু'তাযিলা, জাহমিয়া, মুরজিয়া এবং হরেক রকমের বিদ'আতীদেরকে দেখে আনন্দিত হ'তেন?

চতুর্থত : আহমাদ বিন আলী লাহোরী দেওবন্দী স্বীয় 'মালফূযাত'-এ লিখেছেন, 'আমি ক্বাদেরী (আব্দুল কাদের জিলানী-এর তরীকা) এবং হানাফী। আহলেহাদীছগণ কাদেরীও নয়, আবার হানাফীও নয়। কিন্তু তারা আমার মসজিদে চল্লিশ বছর যাবৎ ছালাত আদায় করে আসছে। আমি তাদেরকে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করি।[১৩১]

উক্ত উক্তি থেকে পাঁচটি বিষয় সাব্যস্ত হয়েছে :

১. আহলেহাদীছগণ হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

২.'আহলেহাদীছ' ছহীহ আক্বীদা সম্পন্ন মুসলমানদের উপাধি। এজন্য শী'আ ও অন্যান্য দল সমূহ 'আহলেহাদীছ' নয়। তারা তো আহলে বিদ'আত-এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. শুধু মুহাদ্দিছগণকেই 'আহলেহাদীছ' বলা হয় না। বরং মুহাদ্দিছগণের অনুসারী সাধারণ জনগণকেও 'আহলেহাদীছ' বলা হয়। নতুবা মুহাদ্দিছগণের কোন জামা'আতটি লাহোরী ছাহেবের মসজিদে চল্লিশ বছর যাবৎ ছালাত আদায় করেছেন?

৪. মানুষ যদি হানাফী বা কাদেরী নাও হয়, তথাপি সে আহলে হক তথা হক্বপন্থী হ'তে পারেন।

৫. জনাব সরফরায খান কর্তৃক শী'আদেরকে আহলেহাদীছ গণ্য করা বাতিল।

এমনিতরো আরো অসংখ্য উদ্ধৃতি রয়েছে যদ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, মুহাদ্দিছ হৌক কিংবা হাদীছের অনুসারী সাধারণ জনতা হৌক, 'আহলেহাদীছ' দ্বারা 'আহলে সুন্নাত' তথা ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন মানুষ উদ্দেশ্য। আর বিদ'আতীরা আদৌ 'আহলেহাদীছ' উপাধিতে শামিল নয়। বরং তারা তো 'আহলেহাদীছের' প্রতি কেবল বিদ্বেষই পোষণ করে থাকে।

দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ মুহাদ্দিছগণের অনুসারী এবং হাদীছের উপরে আমলকারী সাধারণ জনতার ব্যাপারে বক্তব্য হ'ল, কতিপয় লোক এ অপপ্রচার চালিয়ে থাকেন যে, 'আহলেহাদীছ' দ্বারা কেবল সম্মানিত মুহাদ্দিছগণ উদ্দেশ্য, এর দ্বারা সাধারণ জনতা উদ্দেশ্য নয়। সেকারণে এই লোকদের অপপ্রচারের জবাবে বিশটি উদ্ধৃতি পেশ করা হ'ল :

১. অসংখ্য হক্বপন্থী আলেম যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম বুখারী প্রমুখ 'আহলেহাদীছ'-কে সাহায্যপ্রাপ্ত দল হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

---

১২৬. *হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ, ২য় খণ্ড (করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূম আল-ইসলামিয়া), পৃঃ ২২৮।*
১২৭. *ইজতিহাদ আওর তাক্বলীদ কী বে-মিছাল তাহক্বীক্ব (পশ্চিম পাকিস্তান : ইলমী মারকায আনারকলী লাহোর), পৃঃ ৪৮।*
১২৮. *দ্রঃ মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশ-শাফেঈ, পৃঃ ৪৭; তিরমিযী, হা/২২২৯; ইমাম হাকেম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, হা/২।*
১২৯. *মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৪।*
১৩০. *খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, হা/৮৫।*
১৩১. *মালফূযাতে ত্বাইয়েবাহ, পৃঃ ১১৫; অন্য একটি সংস্করণের পৃঃ নং ১২৬।*

Contents

এর আলোকে বক্তব্য হ'ল কেবল মুহাদ্দিছগণই 'সাহায্যপ্রাপ্ত দল, তাদের সাধারণ অনুসারীগণ নন। অথবা শুধু মুহাদ্দিছগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং তাদের অনুসারীগণ জান্নাতের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন' এমন ধারণা শুধু বাতিলই নয়, বরং ইসলামের সাথে ঠাট্টা-মশকরা করার শামিল।

২. হাফিয ইবনে হিব্বান 'আহলেহাদীছদে'র সম্পর্কে বলেছেন যে, 'তারা হাদীছের উপরে আমল করেন, হাদীছ সংরক্ষণ করেন এবং হাদীছ বিরোধীদের মূলোৎপাটন করেন'।[১৩২] আর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আহলেহাদীছ সাধারণ জনগণও হাদীছের উপরেই আমল করে থাকেন।

৩. ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ)-এর ছেলে ইমাম আবু বকর বলেছেন, 'তুমি ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা নিজ দ্বীন নিয়ে খেল-তামাশা করে'। (যদি তুমি দ্বীনকে তাচ্ছিল্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও) তাহ'লে তুমি আহলেহাদীছদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও সমালোচনার তীরে বিদ্ধ করবে।[১৩৩]

এ উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যারা আহলেহাদীছদের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করেন, তারা দ্বীনকে নিয়ে তামাশা করেন। অর্থাৎ তারা বিদ'আতী। আর এও দিবালোকের ন্যায় পরিস্ফূট যে, বিদ'আতীরা শুধু মুহাদ্দিছগণের সাথেই শত্রুতা পোষণ করে না; বরং তারা হাদীছের অনুসারী আম জনতার প্রতিও চরম-বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে।

আমীন উকাড়বী দেওবন্দী 'গায়ের মুক্বাল্লিদের পরিচয়' শিরোনামে লিখেছেন যে, 'কিন্তু যে ব্যক্তি ইমামও নয়, মুক্তাদীও নয় তথা বেনামাযী। কখনো সে ইমামকে গালি দেয় আবার কখনো মুক্তাদির সাথে ঝগড়া বাধায়- তবে বুঝতে হবে সে একজন গায়ের মুক্বাল্লিদ'।[১৩৪]

আবার অন্য স্থানে উকাড়বী লিখেছেন, 'এজন্যই যে যত বড় গায়ের মুক্বাল্লিদ হবে, সে তত বড় বেআদব ও অভদ্র হবে'।[১৩৫]

উকাড়বী আরো লিখেছেন, প্রতিটি গায়ের মুক্বাল্লিদ ব্যক্তিই 'নিজের রায় নিয়ে গর্ববোধকারী'-এর প্রতিকৃতি। আর রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষ্যানুসারে এমন লোকদের জন্য (গায়ের মুকাল্লিদদের) তওবা করার পথ রুদ্ধ।[১৩৬]

এই বক্তব্য এবং অনুরূপ অন্যান্য বক্তব্যের কারণে তাকলীদপন্থীদের আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে 'গায়ের মুকাল্লিদ' শব্দ ব্যবহার করা একেবারেই ভ্রান্ত, বাতিল ও পরিত্যাজ্য।

৪. ইমাম আহমাদ বিন সিনান আল-ওয়াসিত্বী (রহঃ) বলেছেন, দুনিয়াতে এমন কোন বিদ'আতী নেই যে আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না'।[১৩৭]

আর এটা সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেক আহলেহাদীছ তথা মুহাদ্দিছ, আলেম ও হাদীছের অনুসারী সাধারণ মানুষদের প্রতি সকল বিদ'আতীই বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে এবং হরেক রকমের উদ্ভট নামে যেমন 'গায়ের মুকাল্লিদ' বলার দ্বারা আহলেহাদীছদের সাথে মশকরা করে থাকে।

৫. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) স্বীয় প্রসিদ্ধ 'ক্বাছীদায়ে নূনিয়াহ'তে লিখেছেন, 'ওহে আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী এবং গালি প্রদানকারী! তুমি শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব ও সখ্যতা গড়ার সুসংবাদ গ্রহণ করো'।[১৩৮]

এটা আপামর জনসাধারণেরও জানা আছে যে, প্রত্যেক কট্টর বিদ'আতী জামা'আত হিসাবে প্রত্যেক আহলেহাদীছের সাথে শত্রুতা রাখে এবং আহলেহাদীছ আলেম হৌক কিংবা সাধারণ জনতা হৌক তাদেরকে মন্দ নামে ডাকে।

৬. হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) আহলেহাদীছদের একটি ফযীলত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কতিপয় সালাফে ছালেহীন এই আয়াতটি *(বাণী ইসরাঈল ১৭/৭১)* সম্পর্কে বলেছেন, هَذَا أَكْبَرُ شَرَفٍ لِأَصْحَابِ الْحَدِيْثِ لِأَنَّ إِمَــامَهُمْ النَّبِيُّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَ سَــلَّمَ 'এটি আহলেহাদীছের জন্য সবচেয়ে বড় ফযীলত। কেননা তাদের ইমাম হচ্ছেন স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)।[১৩৯]

যেমনিভাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ) মুহাদ্দিছগণের ইমামে আযম (মহান ইমাম), তদ্রূপ তিনি সাধারণ আহলেহাদীছগণেরও ইমামে আযম। এটা কোন লুকোচুরি কথা নয়; বরং আহলেহাদীছদের খ্যাতিমান বাগ্মী ও সাধারণ বক্তাদের আলোচনা থেকেও এটা সুস্পষ্ট।

৭. হাদীছের ভিত্তি (قوام الــسنة) খ্যাত ইমাম ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আল-ফযল আল-ইস্পাহানী (রহঃ) আহলেহাদীছের প্রসঙ্গে বলেছেন, এরাই ক্বিয়ামত পর্যন্ত হক্বের উপরে বিজয়ী থাকবে।[১৪০]

এতে প্রমাণিত হয় যে, 'আহলেহাদীছ' বলতে মুহাদ্দিছ এবং হাদীছের অনুসারী সাধারণ জনতা উভয়কেই বুঝানো হয়। আর এ দলটি ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান থাকবে। এজন্য মাসঊদ আহমাদ ছাহেবের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'মুহাদ্দিছগণ তো মারা গেছেন। বর্তমানে তো ঐ সকল লোক জীবিত রয়েছেন, যারা তাঁদের গ্রন্থ সমূহ থেকে নকল করে থাকে'।[১৪১]

৮. আবূ ইসমাঈল আব্দুর রহমান বিন ইসমাঈল আছ-ছাবূনী বলেছেন, 'আহলেহাদীছগণ এই আক্বীদা পোষণ করেন এবং

---

১৩২. *ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬১২৯; অন্য একটি সংস্করণের হাদীছ নং ৬১৬২।*
১৩৩. *ইমাম আজুর্রী, আশ-শারী'আহ, পৃঃ ৯৭৫।*
১৩৪. *তাজাল্লিয়াতে ছফদর, ৩/৩৭৭।*
১৩৫. *ঐ, ৩/৫৯০।*
১৩৬. *ঐ, ৬/১৬৪।*
১৩৭. *মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৪।*
১৩৮. *ক্বাছীদায়ে নূনিয়া, পৃঃ ১৯৯।*
১৩৯. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৪/১৬৪।*
১৪০. *আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ, ১/২৪৬।*
১৪১. *আল-জামা'আতুল ক্বাদীমাহ, পৃঃ ২৯।*

একথার সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের উপরে স্বীয় আরশের উপরে সমাসীন আছেন'।[১৪২]

মুহাদ্দিছীনে কেরাম হৌক কিংবা তাঁদের অনুসারী সাধারণ জনগণ হৌক সবার এটাই আক্বীদা যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে সমাসীন আছেন এবং তিনি স্বীয় সত্তায় সর্বত্র বিরাজমান নন। বরং তাঁর জ্ঞানের পরিধি এবং ক্ষমতার ব্যাপকতা সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে।

৯. আবূ মানছূর আব্দুল ক্বাহের বিন ত্বাহের আল-বাগদাদী সিরিয়া ও অন্যান্য সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন, كُلُّهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ 'তারা সকলেই আহলে সুন্নাত। আর তারা আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরে রয়েছে'।[১৪৩]

১০. শায়খুল ইসলাম হাফেয ইবনে তায়মিয়া (রহঃ)-হাদীছের উপর আমলকারী সাধারণ লোকদেরকেও 'আহলেহাদীছ' হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।[১৪৪]

১১. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, আমার নিকটে ঐ ব্যক্তিই আহলেহাদীছ, যিনি হাদীছের উপর আমল করেন।[১৪৫]

১২. সূরা বণী ইসরাইলের ৭১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) মন্তব্য করেছেন, আহলেহাদীছদের জন্য এর চেয়ে অধিক ফযীলতপূর্ণ আর কোন বক্তব্য নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত আহলেহাদীছদের আর কোন ইমামে আ'যম বা বড় ইমাম নেই।[১৪৬]

১৩. রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী দেওবন্দী লিখেছেন, প্রায় দ্বিতীয় তৃতীয় হিজরী শতকে হক্বপন্থীদের মাঝে শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা সমূহের সমাধানকল্পে সৃষ্ট মতভেদের প্রেক্ষিতে পাঁচটি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ চার মাযহাব ও আহলেহাদীছ। তৎকালীন সময় হ'তে অদ্যাবধি উক্ত পাঁচটি তরীকার মধ্যেই হক্ব সীমাবদ্ধ রয়েছে বলে মনে করা হয়।[১৪৭]

উক্ত বক্তব্য দ্বারা তিনটি বিষয় পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত হয়।

ক. 'আহলেহাদীছ' হক্বের উপর রয়েছে।

খ. 'আহলেহাদীছ' দ্বারা মুহাদ্দিছীনে কেরাম এবং তাদের অনুসারী আম জনতা উভয়েই উদ্দেশ্য।

গ. চার মাযহাব ব্যতিরেকে পঞ্চম দল হ'ল 'আহলেহাদীছ'। এজন্য সরফরায খান ছফদরের মতানুসারে অন্যদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলে স্বীকৃতি দেয়া ভুল হয়েছে ।

১৪. আহমাদ আলী লাহোরীর এই বক্তব্যটি পূর্বেই উল্লিখিত হয়ে গেছে যে, তিনি বলেছেন, আহলেহাদীছগণ কাদরিয়া তরীকার অনুসারীও নন, আবার হানাফীও নন। তবে তারা আমার মসজিদে চল্লিশ বছর যাবৎ ছলাত আদায় করে আসছে। আমি তাদেরকে হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করি।[১৪৮]

আহমাদ আলী লাহোরীর বক্তব্য দ্বারা এটি একেবারেই পরিষ্কার যে, স্রেফ মুহাদ্দিছগণই আহলেহাদীছ নন। বরং তাদের অনুসারী সাধারণ লোকজনও আহলেহাদীছ।

১৫. দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ক্বাসেম নানূতুবীর পসন্দনীয় গ্রন্থ 'হক্কানী আক্বায়েদে ইসলাম' গ্রন্থে আব্দুল হক হক্কানী দেহলভী বলেছেন, শাফেঈ, হাম্বলী, মালেকী, হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর আহলেহাদীছগণও আহলে সুন্নাতের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত।[১৪৯]

এই বক্তব্যে যেমনভাবে হানাফী, শাফেঈ, হাম্বলী, মালেকী নামগুলি দ্বারা তাদের আম জনতাকেও বুঝানো হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে উক্ত বক্তব্যে 'আহলেহাদীছ' দ্বারা মুহাদ্দিছীনে কেরামের সাধারণ অনুসারীদেরকেও বুঝানো হয়েছে।

১৬. মুফতী কেফায়াতুল্লাহ দেহলভী (দেওবন্দী) একটি প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন, 'হ্যা, আহলেহাদীছগণ মুসলমান এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সাথে বিয়ে-শাদীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয। শুধু তাক্বলীদ বর্জন করাতে ইসলামে কোন যায় আসে না। এমনকি তাক্বলীদ বর্জনকারী ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হ'তেও বের হয়ে যায় না।[১৫০]

এই ফৎওয়া ও পূর্বোক্ত (১৩ নং) ফৎওয়া দ্বারা সুস্পষ্ট হ'ল যে, 'আহলেহাদীছ' আহলে সুন্নাতেরই অন্তর্ভুক্ত এবং হাদীছের উপরে আমলকারী সাধারণ লোকদেরকেও 'আহলেহাদীছ' উপাধিতে ভূষিত করা সম্পূর্ণ সঠিক।

১৭. চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর ইতিহাসবিদ বিশারী মাক্বদেসী (মৃঃ ৩৭৫ হিঃ) মানছূরার (সিন্ধুর) অধিবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন, أَكْثَرُهُمْ أَصْحَابُ حَدِيْثٍ 'তাদের অধিকাংশই আহলেহাদীছ'।[১৫১]

আর যুক্তির নিরীখে এটি প্রতীয়মান হয় যে, সে সময় সিন্ধু প্রদেশের সকল অধিবাসী মুহাদ্দিছ ছিলেন না। বরং তাদের মধ্যে মুহাদ্দিছগণের অনুসারী বহু সাধারণ লোক ছিলেন।

১৮. ইশারাতে ফরীদী অর্থাৎ 'মাক্বাবীসুল মাজালিস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, 'আহলেহাদীছগণের ইমাম হযরত ক্বাযী মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী ইয়ামানী (রহঃ) 'সামা' (সঙ্গীত)-এর উপর একটি প্রামাণ্য পুস্তিকা লিখেছেন। পুস্তিকাটির নাম 'ইবত্বালু দা'ওয়া ইজমা' (ইজমা দাবীর অসারতা)। উক্ত বইয়ে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, 'সামা' জায়েয।[১৫২]

---

১৪২. *আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবুল হাদীছ, পৃঃ ১৪।*
১৪৩. *উছুলুদ দ্বীন, পৃঃ ৩১৭।*
১৪৪. *মাজমূউ ফাতাওয়া, ৪/৯৫।*
১৪৫. *ইমাম খত্বীব বাগদাদী, আল-জামে' ১/৪৪।*
১৪৬. *তাদরীবুর রাবী, ২/১২৬, ২৭তম প্রকার।*
১৪৭. *আহসানুল ফাতাওয়া, ১/৩১৬।*
১৪৮. *মালফূযাতে ত্বাইয়েবাহ, পৃঃ ১১৫; পুরানা সংস্করণের পৃঃ নং ১২৬।*
১৪৯. *হক্কানী আক্বায়েদে ইসলাম, পৃঃ ৩।*
১৫০. *কিফায়াতুল মুফতী, ১/৩২৫।*
১৫১. *আহসানুত তাক্বাসীম ফি মা'রিফাতিল আক্বালীম, পৃঃ ৪৮১।*
১৫২. *ইশারাতে ফরীদী, পৃঃ ১৫৬।*

উক্ত বক্তব্যে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, 'আহলেহাদীছ' অর্থ হিন্দুস্তান সহ অন্যান্য দেশের সাধারণ আহলেহাদীছগণ। আর অবশিষ্ট বক্তব্য সম্পর্কে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হ'ল :

প্রথমত : শাওকানী সমস্ত আহলেহাদীছের 'ইমামে আযম'-নন। বরং আহলেহাদীছের ইমামে আযম হ'লেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। শাওকানী তো পরবর্তীদের মধ্য হ'তে একজন আলেম ছিলেন।

দ্বিতীয়ত : যদি 'সামা' দ্বারা কাওয়ালী, গান-বাজনা এবং বাদ্যযন্ত্র সম্বলিত সংগীত উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী তা হারাম। অনুরূপভাবে শিরকী-বিদ'আতী কবিতা পাঠ করাও হারাম।

১৯. দেওবন্দী মুফতী মুহাম্মাদ আনওয়ার ছূফী আব্দুল হামীদ সোয়াতী কর্তৃক প্রণীত 'নামাযে মাসনূন' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, নিঃসন্দেহে হানাফী মাযহাব অনুসারীদের স্বীয় মাযহাবের সত্যতার এবং আত্মিক প্রশান্তির জন্য 'নামাযে মাসনূন'-একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। ৮৩৭ পৃষ্ঠাব্যাপী উক্ত গ্রন্থে ছালাতের যরূরী বিষয়াবলী বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমার মতে এ গ্রন্থটি পাঠ করা শুধু হানাফী মাযহাবের প্রতিটি ইমাম ও খত্বীবের জন্যই উপকারী নয়। বরং সাধারণ হানাফীদের জন্যও উপকারী। এমনকি মধ্যপন্থী আহলেহাদীছ ব্যক্তিদের জন্যও উক্ত গ্রন্থখানি আলোকবর্তিকা স্বরূপ হবে ইনশাআল্লাহ।[১৫৩] উক্ত উক্তিতে মুহাম্মাদ আনওয়ারও হাদীছের অনুসারী সাধারণ ব্যক্তিদেরকে 'আহলেহাদীছ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

২০. মুহাম্মাদ ওমর নামক এক কট্টর দেওবন্দী লিখেছেন, সাধারণ আহলেহাদীছগণের নিকটে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, আপনাদেরকে এই সত্য থেকে বঞ্চিত রেখে আপনাদের চিন্তাগত শূন্যতা এনে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ আহলেহাদীছগণ এটা ভেবে থাকবেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হানাফীগণ কেন আহলেহাদীছ আলেমদের কিতাবগুলোর উপরে আমল করেন না?[১৫৪]

এই শঠতাপূর্ণ উক্তিতেও সাধারণ আহলেহাদীছ জনগণকে 'আহলেহাদীছ' বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

উল্লিখিত ২০টি উদ্ধৃতি স্তূপ থেকে একটি মুষ্টি মাত্র। নইলে এগুলি ব্যতীত আরো বহু উদ্ধৃতি মওজুদ রয়েছে।

কতিপয় ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নিজেকে আহলেহাদীছ বলেন না। বরং তারা নিজেকে আহলেহাদীছ বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন এবং বিভিন্ন নামে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। আবার কেউ কেউ গায়ের আহলেহাদীছদের বিরোধিতার কারণে 'আহলেহাদীছ' নাম বলতে ভয় পান। আবার কেউ নিজেকে 'আহলে ছহীহ হাদীছ' ইত্যাদি বলে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে থাকেন। এ ধরনের কাজ-কারবার ও ছলচাতুরি ভ্রান্তি বৈ কিছুই নয়। হকপন্থীদের বৈশিষ্ট্যগত নাম সমূহের মধ্যে আহলে সুন্নাত, আহলেহাদীছ, সালাফী, আছারী ইত্যাদি অনেক সুন্দর সুন্দর উপাধি রয়েছে। তবে এসবের মধ্যে 'আহলেহাদীছ' নামটি সর্বশ্রেষ্ঠ। এ নামটির জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সালাফে ছালেহীনের ইজমা রয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

সময়ের অনিবার্য দাবী হ'ল সকল 'আহলেহাদীছ' আলেম ও আহলেহাদীছ আম জনতা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাক। সমস্ত মতানৈক্যকে বিদায় জানিয়ে কুরআন ও হাদীছের ঝাণ্ডাকে পৃথিবীর বুকে উড্ডীন করার জন্য মনেপ্রাণে সচেষ্ট হোক। ওমা আলায়না ইল্লাল বালাগ।

[চলবে]

১৫৩. *নামাযে মাসনূন, ভূমিকা দ্রঃ।*
১৫৪. *ছুপে রায, ৪/২।*

কুরআন ও হাদীছের আলোকে ‘সোনামণি’র ৫টি নীতিবাক্য

*আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস**

ভূমিকা : আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহিভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের এক বৈপ্লবিক আন্দোলন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’। সর্বস্তরের মানুষের নিকট ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার জন্য দেশব্যাপী চারটি পর্যায়ে দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করে যাচ্ছে এ সংগঠন। বত্রিশোর্ধদের মাঝে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’, ১৬-৩২ বছর বয়স্ক ছাত্র ও যুবকদের মাঝে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’, ৭-১৫ বছর বয়স্ক শিশু-কিশোরদের মাঝে ‘সোনামণি এবং মহিলাদের মাঝে ‘আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা’। সোনামণি একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন। ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার সূরা হজ্জের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতের আলোকে ‘সোনামণি’ নামটি ঘোষণা করেন। এ সংগঠনের রয়েছে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র, কর্মসূচী, ৫টি নীতিবাক্য ও ১০টি গুণাবলী, যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নির্ণিত হয়েছে। নিম্নে ৫টি নীতিবাক্য সম্পর্কে আলোচনা করা হ’ল।-

সোনামণি সংগঠনের ৫টি নীতিবাক্য :

(১) সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করি : এর অর্থ সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, রোগে-শোকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে দৃঢ়ভাবে ভরসা করা। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এটি মুমিন-মুত্তাকীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে সকল কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকার নাম আল্লাহ্র উপরে ভরসা নয়। বরং সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী বৈধ পথে কাজ করা এবং ফলাফলের বিষয়টি আল্লাহ্র কাছে ন্যস্ত করার নাম আল্লাহ্র উপর ভরসা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ‘অতঃপর যখন তুমি কোন কাজের দৃঢ় সংকল্প করবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে। যারা আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তাদেরকে তিনি ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

এ ব্যাপারে মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম আমাদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ‘মুমিনদের উচিত আল্লাহ্র উপর ভরসা করা’ *(আলে ইমরান ৩/১২২, ১৬০; ইবরাহীম ১৪/১১; মুজাদালাহ ৫৮/১০; তাগাবুন ৬৪/১৩; মায়েদাহ ৫/১১; তওবাহ ৯/৫১)*।

তিনি আরো বলেন, ‘মুমিন তো তারাই যখন তাদের নিকট আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর কম্পিত হয় এবং যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তখন ঈমান বেড়ে যায়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে’ *(আনফাল ৮/২)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট’ *(ত্বালাক ৬৫/৩)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ ‘আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া আমার কোন ক্ষমতা নেই, আমি তাঁর উপরই ভরসা করি এবং তাঁরই নিকট ফিরে যাব’ *(হূদ ১১/৮৮)*।[১৫৫]

হিজরতের সময় কঠিন বিপদ মুহূর্তে ছাওর পর্বতের গুহায় আল্লাহ্র উপর দৃঢ় ভরসা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে বলেছিলেন, لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ‘চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন’ *(তওবাহ ৯/৪০)*।

আল্লাহ তা‘আলার উপর ভরসা করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ বলেন, لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوْحُ بِطَانًا- ‘তোমরা যদি আল্লাহ তা‘আলার প্রতি যথাযথ ভরসা করতে তাহ’লে তিনি যেমন পক্ষীকুলকে রূযী দান করেন, তেমনিভাবে তোমাদেরকেও দান করতেন। তারা ভোরে খালি পেটে বের হয় ও সন্ধ্যাবেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে’।[১৫৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ. هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. ‘আমার উম্মতের সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ঐসব লোক যারা ঝাড়-ফুঁক করায় না, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং যারা তাদের প্রভুর উপর ভরসা রাখে’।[১৫৭]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি: এই নীতিবাক্য সোনামণিসহ অভিভাবক, দায়িত্বশীল ও সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় কথা, কর্ম ও সম্মতিমূলক আচরণের মাধ্যমে কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা ও বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করে গেছেন। তাই যাবতীয় মানব রচিত তন্ত্র-মন্ত্র ও আদর্শ ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একমাত্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ‘নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে’ *(আহযাব ৩৩/২১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

---

* কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

১৫৫. *এছাড়া আরো দ্রঃ সূরা আ‘রাফ ৭/৮৯, তওবাহ ৯/১২৯, ইউনুস ১০/৭১, হূদ ১১/৫৬, ইউসুফ ১২/৬৭, রা‘দ ১৩/৩০, শূরা ৪২/১০, মুমতাহিনা ৬০/৪, মুলক ৬৭/২৯।*

১৫৬. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫২৯৯।*

১৫৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৯৫।*

فَانْتَهُوا 'রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক'। *(হাশর ৫৯/৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। তাঁর আদর্শ ও নির্দেশের বিরোধিতা করার এখতিয়ার কোন মুমিনের নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 'তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে তিনি তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর পক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে (ভিন্নমত পোষণের) কোনরূপ এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, সে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত হ'ল' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

এছাড়াও আলে ইমরান ৩/৩২, নিসা ৪/৫৯, ৬৫, ৮০; মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুগত্য করার মাধ্যমে তাঁর আদর্শে জীবন গড়তে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহ সার্বিক জীবনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা মানেই তাঁর আদর্শে জীবন গড়া। যেমন-

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'অস্বীকারকারী ব্যতীত আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কে অস্বীকার করে? তিনি বলেন, যে আমার আনুগত্য করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার নাফরমানী করবে সেই হল অস্বীকারকারী'।[১৫৮]

(২) অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ 'তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকটে সর্বাধিক প্রিয় হব তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে'।[১৫৯]

(৩) রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য। তাঁর আদর্শ অমান্য করা কাফিরের বৈশিষ্ট্য। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন লোকদের মধ্যে পার্থক্যকারী'।[১৬০]

(৪) মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার মধ্যেই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে। অন্যথা জাহান্নামের কঠিন শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, এই উম্মতের যে কেউ ইহূদী হোক বা নাছারা হোক আমার নবুওয়াতের কথা শুনবে অথচ আমি যা সহকারে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে'।[১৬১]

(৩) নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি : চরিত্র শব্দটি বিশ্লেষণ করলে অর্থ দাঁড়ায় মানুষ হিসাবে সমগ্র উত্তম গুণাবলী ধারণ করা। পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তু অর্থের বিনিময়ে খরিদ করা গেলেও চরিত্র কোন কিছুর বিনিময়ে খরিদ করা যায় না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কঠোর সাধনার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হয় সচ্চরিত্র।

চরিত্রের বলেই একজন মানুষ উত্তম হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে পারে। পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরুব্বী ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতাবোধ, নিয়মিত ছালাত আদায়, সত্যবাদিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ওয়াদা পালন, আমানত রক্ষা, বিনয়-নম্রতা, ভদ্রতা, সৎ সাহস, বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায়, পরোপকার ইত্যাদি গুণাবলীর সমন্বিত রূপই সচ্চরিত্র।

একজন সৎ ও চরিত্রবান ব্যক্তি পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যিনি চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম'।[১৬২]

সোনামণিদের এই নীতিবাক্য মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের প্রতিফলন যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। উত্তম চরিত্রের ফলাফল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ 'নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের কারণে রাত্রিতে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়কারী ও দিনে নফল ছিয়াম পালনকারীর মর্যাদা লাভ করবে'।[১৬৩] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُوْضَعُ فِى مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَخُلُقٌ حَسَنٌ 'ক্বিয়ামতের দিন আমলের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে মুমিনের উত্তম চরিত্র'।[১৬৪]

তাই অভিভাবকগণ নিজেদেরকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তোলার সাথে সাথে সোনামণিদের জীবনে এই নীতিবাক্য বাস্তবায়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন।

(৪) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি :

এর অর্থ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করা।

ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ। মুসলমানগণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। আর এ

১৫৮. *বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩।*
১৫৯. *মুসলিম হা/৪৪; মিশকাত হা/৭।*
১৬০. *বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪।*
১৬১. *মুসলিম হা/৪০৩; মিশকাত হা/১০, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯।*
১৬২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৩৫৫৯।*
১৬৩. *আবুদাঊদ হা/৪৭৯৮; মিশকাত হা/৫০৮২।*
১৬৪. *তিরমিযী হা/২০০২; মিশকাত হা/৫০৮১।*

শ্রেষ্ঠ জাতির প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য হ'ল ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ।

মহান আল্লাহ বলেন, كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

মুমিন চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 'মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে' *(তওবা ৯/৭১)*। পক্ষান্তরে মুনাফিকের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হ'ল অসৎ কাজের নির্দেশ ও সৎ কাজের নিষেধ করা। যেমন আল্লাহ বলেন, اَلْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ. 'মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরস্পরে সমান। তারা অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও সৎকাজে নিষেধ করে' *(তওবা ৯/৬৭)*।

মুসলিম জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদায় আসীন হ'তে হ'লে সোনামণিদের এই নীতিবাক্য অনুসরণে অবশ্যই আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার-এর কাজ করতে হবে এবং সোনামণিদেরকে ছোট থেকেই এগুণে অভ্যস্ত করতে হবে। যেমন লোকমান হাকীম তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'হে বৎস! ছালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও ও অসৎ কাজের নিষেধ কর এবং বিপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এটা খুব সাহসিকতার কাজ' *(লোকমান ৩১/১৭)*।

সকল মুমিন মুসলমানেরই দায়িত্ব সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অন্যায় কাজ হ'তে নিষেধ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের যে কেউ গর্হিত কিছু দেখবে, সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। না পারলে যবান দিয়ে প্রতিবাদ করে, না পারলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। আর এটা হ'ল দুর্বলতম ঈমান'।[১৬৫] এরপরে তার মধ্যে আর সরিষাদানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।[১৬৬]

আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ يُوْشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ 'যখন লোকেরা কোন অন্যায় কাজ হ'তে দেখে অথচ তা পরিবর্তন করে না, সত্বর তাদের সকলের উপর আল্লাহ তাঁর শাস্তি ব্যাপকভাবে নামিয়ে দেন'।[১৬৭]

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ 'যার হাতে আমার জীবন নিহিত তার কসম করে বলছি, অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। নইলে সত্বর আল্লাহ তাঁর পক্ষ হ'তে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা দো'আ করবে। কিন্তু তা আর কবুল করা হবে না'।[১৬৮]

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এর নীতি চালু থাকলে সকলেই মুক্তি পাবে। অন্যথা সবাই ধ্বংস হবে। সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, 'আল্লাহ্র দণ্ড সমূহ বাস্তবায়নে অলসতাকারী এবং অপরাধী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ঐ লোকদের মত, যারা একটি জাহাযে আরোহণের জন্য লটারী করল। তাতে কেউ উপরে ও কেউ নীচতলায় বসল। নীচতলার যাত্রীরা উপর তলায় পানি নিতে আসে। তাতে তারা কষ্টবোধ করে। তখন নীচতলার একজন কুড়াল দিয়ে পাটাতন কাটতে শুরু করল। উপর তলার লোকজন এসে কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, উপরে পানি আনতে গেলে তোমরা কষ্টবোধ কর। অথচ পানি আমাদের লাগবেই। এ সময় যদি উপর তলার লোকেরা তার হাত ধরে, তাহ'লে সে বাঁচল, তারাও বাঁচল। আর যদি তাকে এভাবে ছেড়ে দেয়, তাহ'লে তারা তাকে ধ্বংস করল এবং নিজেরাও ধ্বংস হ'ল'।[১৬৯]

(৫) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি :

এর অর্থ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইসলামী পরিবার গড়ে তোলা এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নে'মতসমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নে'মত হচ্ছে ফুটন্ত ফুলের মত আমাদের শিশু-কিশোর ছোট্ট সোনামণিরা। ইসলাম তাদেরকে চোখ জুড়ানো সম্পদ বলে বিবেচনা করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 'ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য' *(কাহফ ১৮/৪৬)*। আদর্শ ইসলামী পরিবার গঠনের মাধ্যমে সন্তান-সন্ততিকে সম্পদে পরিণত করার দায়িত্ব পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের। যাতে তারা ইহকালে শান্তি ও পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও স্বীয় পরিবারকে সেই জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে রয়েছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে' *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

---

১৬৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭।*
১৬৬. *মুসলিম হা/৫০; মিশকাত হা/১৫৭।*
১৬৭. *ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪২।*
১৬৮. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪০।*
১৬৯. *বুখারী, মিশকাত হা/৫১৩৮।*

আদর্শ পরিবার তথা সন্তান গঠনের জন্য পিতা-মাতা ও দায়িত্বশীলদের উচিত তাদের ইসলামের আলোকে উত্তম শিক্ষা প্রদান করা। এক্ষেত্রে প্রথমে নিজেদেরকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে এবং নিজেদের চরিত্র ও আমল সর্বাধিক সুন্দর করতে হবে। কারণ পিতা-মাতার স্বভাবের উপরই সন্তান গড়ে ওঠে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়। যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাতে কোন কানকাটা দেখেছ'?[১৭০]

তাই আদর্শ পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। অন্যথা মহান আল্লাহ্র নিকট জওয়াব দিতে গিয়ে আটকে যেতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। জনগণের শাসকও দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আর পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীলা। তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে'।[১৭১]

সোনামণি সংগঠনের এই নীতিবাক্যের আলোকে পরিবার গঠনের জন্য পরিবারকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শাসন করা থেকে বিরত থাকা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَلِّقُوْا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ 'পরিবারকে সংশোধন করার জন্য চাবুক এমন স্থানে রাখ, যেন পরিবার তা দেখতে পায়। কারণ এটাই তার জন্য শিষ্টাচার'।[১৭২]

উত্তম পরিবার গঠনের অন্যতম পদ্ধতি হ'ল ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে ছালাতে অভ্যস্ত করানো। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ছালাতের নির্দেশ দাও, যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। দশ বছর বয়স হ'লে ছালাতের জন্য প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও'।[১৭৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার ছালাতের পূর্বে ঘুমিয়ে যাওয়া অপসন্দ করতেন এবং এশার পর কথা বলা খারাপ মনে করতেন।[১৭৪] তাই এশার ছালাতের পর ছেলে-মেয়ে কোথায় কি করছে তা দেখার দায়িত্ব পিতা-মাতার। পিতা-মাতা উত্তম শিক্ষার মাধ্যমে আদর্শ পরিবার গড়লে তাদের সন্তানরা ছালাত পরিত্যাগ করা ও বাজে সময় নষ্ট করে রাতের পর রাত অন্যায় কাজে লিপ্ত না হয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভে ধন্য হবে ইনশাআল্লাহ।

১৭০. *বুখারী হা/১৩৮৫।*
১৭১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫।*
১৭২. *সিলসিলা ছহীহা হা/১৪৪৬।*
১৭৩. *আবুদাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২।*
১৭৪. *বুখারী হা/৫৯৯; মিশকাত হা/৫৮৭।*

দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। কেননা অনেকে তা করে পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য বা সুনাম-সুখ্যাতির জন্য। ফলে তা রিয়া বা ছোট শিরকে পরিণত হয়ে যায়। আবার অনেকে দেশ ও জাতির সেবার নামে নিজের পেটপূজা ও স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়। কেউ কেউ এগুলোর ধারে কাছে না গিয়ে শুধু নিজস্ব উন্নতি ও অর্থ-সম্পদ লাভের চিন্তায় সারাদিন বিভোর থাকে, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। মানুষের সেবা করা, তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া, মুসলিমকে সালাম প্রদান করা এবং খাদ্য খাওয়ানোর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ 'ইসলামের কোন কাজ সর্বোত্তম? উত্তরে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি অন্যকে (দরিদ্রকে) খাদ্য খাওয়াবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করবে'।[১৭৫]

সেবা-শুশ্রূষা পাওয়ার হকদার প্রতিবেশীকে সেবা না করলে তার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে সেবা-শুশ্রূষা করনি। তখন সে (আদম সন্তান) বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে কিভাবে সেবা-শুশ্রূষা করব অথচ তুমি সমস্ত পৃথিবীর প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত অবস্থায় আছে, আর তুমি তার সেবা করনি। তুমি যদি তার সেবা করতে, তাহলে তার নিকট আমাকে পেতে'।[১৭৬]

দেশ ও জাতির নিঃস্বার্থ সেবার প্রতিফল আল্লাহ্র ক্ষমা ও জান্নাত। এমনকি ইতর প্রাণী একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার কারণে এক নারী জাহান্নামে গিয়েছিল।[১৭৭] আর এক ব্যভিচারিণী এক তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে তাকে ক্ষমা করা হয়েছিল।[১৭৮]

উপসংহার : পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, এদেশের কোটি কোটি শিশু-কিশোর পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির ছোবলে আক্রান্ত হয়ে মুসলিম ঐতিহ্য ভুলে দু'জাহানের ক্ষতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণের নিকট আমাদের উদাত্ত আহ্বান, আপনাদের আদরের সোনামণিদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার দৃঢ় শপথ নিয়ে উদ্ভাসিত 'সোনামণি' সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করুন। সাথে সাথে এই সংগঠনের জন্য আপনাদের মূল্যবান সময়, শ্রম, মেধা ও অর্থ ব্যয় করত এর মূলমন্ত্র, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, নীতিবাক্য ও গুণাবলী সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

১৭৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/২৮; মিশকাত হা/৪৬২৯।*
১৭৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৫২৮।*
১৭৭. *বুখারী হা/৩৩১৮; মিশকাত হা/১৯০৩।*
১৭৮. *বুখারী হা/৩৩২১; মিশকাত হা/১৯০২।*

মাওলানা ইসহাক ভাট্টি

*[পাকিস্তানের সমকালীন ইতিহাস গবেষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রবীণ ইতিহাসবিদ মাওলানা ইসহাক ভাট্টি (৯০)। উপমহাদেশে ইসলামী জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে তিনি প্রায় অর্ধশত বছর ধরে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তাঁর লিখিত প্রায় ৪০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যার অধিকাংশই ইতিহাস বিষয়ক। বিশেষতঃ উপমহাদেশের আহলেহাদীছদের স্বর্ণালী ইতিহাস নিয়ে বিস্তর লেখালেখির মাধ্যমে তিনি এক নবদিগন্তের উন্মোচন করেছেন। যার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন ‘মুআররেখে আহলেহাদীছ’ (مؤرخ اهلحديث) হিসাবে। গত ০৫.১২.২০১৪ইং পাকিস্থানে অবস্থানরত ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক **আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব** লাহোর সফরে গিয়ে মাওলানা ইসহাক ভাট্টির সাথে তাঁর বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকারটি পাঠকদের খেদমতে উর্দূ থেকে অনূদিত হল। মাওলানার পরামর্শে ফয়ছালাবাদ থেকে প্রকাশিত ‘ইলম ওয়া আগাহী’ পত্রিকায় (জুলাই-সেপ্টেম্বর’১০ সংখ্যা) প্রকাশিত মাওলানার অপর একটি সাক্ষাৎকারের সাথে এটি সমন্বয় করা হয়েছে।-সম্পাদক]*

আত-তাহরীক : মুহতারাম আপনার জন্ম, শৈশব ও শিক্ষাজীবন সম্পর্কে জানতে চাই।

মাওলানা ইসহাক ভাট্টি : ১৯২৫ সালের ১৫ই মার্চ পূর্ব পাঞ্জাবের পাতিয়ালা যেলায় নানার বাড়ীতে আমার জন্ম। বড় হই দাদার বাড়ী ফরিদকোট যেলার কোটকাপুরায়। আমাদের বংশে জ্ঞানচর্চার সাথে কেউ যুক্ত ছিল না। কৃষি এবং ব্যবসাই ছিল পূর্বপুরুষদের প্রধান কাজ। ফলে আমার ছেলেবেলা কেটেছে গ্রামের আর দশজনের মত খুব সাধারণভাবে। তবে সেই যামানায় ছোট বাচ্চাদেরকে মৌলভী রহীম বখশের লেখা ১৪ খণ্ডে রচিত ‘ইসলাম কি কিতাব’ নামক একটি বই পড়ানো হ’ত। আমার দাদা এই বইটির প্রথম পাঁচ খণ্ড আমাকে পড়িয়েছিলেন, যাতে দ্বীনী মাসায়েল সহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা ছিল।

আত-তাহরীক : দ্বীনী জ্ঞানার্জন শুরু করেছিলেন কখন?

মাওলানা ভাট্টি : শৈশবে যখন গ্রামের পাঠশালায় টুকটাক যাতায়াত শুরু করেছি, তখন কোটকাপুরায় মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভুজিয়ানী (১৯০৮-১৯৮৭ইং) আগমন করেন। তিনি স্থানীয় মসজিদে খুৎবা দেয়ার সাথে সাথে দারস ও তাদরীসের কাজ আঞ্জাম দিতেন। আমি তাঁর এই ইলমী হালকায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করতাম। তিনি আমাদেরকে কুরআনের তরজমাও পড়াতেন। ১৯৩৬ সালের শেষাবধি এই ধারাবাহিকতা জারি ছিল। ১৯৩৭ সালে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী লাক্ষাভী (মাওলানা মহিউদ্দীন লাক্ষাভী এবং মাওলানা মঈনুদ্দীন লাক্ষাভী-এর পিতা) ফিরোযপুর যেলার লাক্ষোকী’তে ‘মারকাযুল ইসলাম’ নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মাওলানা ভূজিয়ানীকে সেখানে শিক্ষকতার জন্য আমন্ত্রণ জানান। মাওলানা ভূজিয়ানী সেখানে ১ বছর শিক্ষকতা করার পর ফিরোযপুর চলে যান। আমিও তাঁর সাথে ফিরোযপুরে গমন করি এবং টানা তিন বছর তাঁর সাহচর্যে থেকে বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করি। ১৯৪০ সালে আমি গুজরানওয়ালায় হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলভী এবং মাওলানা ইসমাঈল সালাফী’র খেদমতে উপস্থিত হই এবং তাঁদের কাছে প্রচলিত নিছাবের শেষ কিতাবগুলো পড়ি। আমার আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা ছিল এ পর্যন্তই।

আত-তাহরীক : কর্মজীবন শুরু করেছিলেন কোথায়?

মাওলানা ইসহাক ভাট্টি : কর্মজীবনের শুরুতে ওকাড়া যেলার হেড সুলায়মানকি পানি উন্নয়ন বিভাগে একজন সাধারণ ক্লার্ক হিসাবে চাকুরী শুরু করি ২৫ রুপি বেতনে। এটাই ছিল আমার প্রথম চাকুরী। ৮/১০ মাস সেখানে কাজ করার পর চাকুরী ছেড়ে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন শহরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করি। দিল্লী এবং আগ্রাতেও কিছুকাল ছিলাম। একটি বেকার সময় অতিবাহিত করছিলাম তখন। অতঃপর ১৯৪৩ সালের এপ্রিলে মাওলানা মুঈনুদ্দীন লাক্ষাভী আমাকে ‘মারকাযুল ইসলাম’-এ আসার জন্য আহ্বান জানান। আমি সেখানে শিক্ষকতা শুরু করি এবং ১৯৪৭-এর জুলাই পর্যন্ত এই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকি।

আত-তাহরীক : রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কিভাবে জড়িত হয়েছিলেন?

মাওলানা ভাট্টি : ছোট থেকেই ইতিহাস এবং রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতাম খুব আগ্রহসহকারে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ আন্দোলন, হিন্দুস্তানের ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের ইতিহাস পড়তে পড়তে মুসলমানদের উপর ইংরেজদের অত্যাচার-অবিচার সম্পর্কে বিস্তর ধারণা আসে। স্বভাবতঃই মনে মনে ইংরেজদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ তৈরী হয়। সেই থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়া। বেশ কিছুদিন জেলও খাটতে হয়েছিল এই কারণে।

১৯৪৫ সালের জুনে পাঞ্জাবের ৮টি প্রসিদ্ধ শহরে ‘প্রজামণ্ডল’ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন হয়। আমার যেলা ফরিদকোটে ‘প্রজামণ্ডলে’র সভাপতি ছিলেন জ্ঞানী জৈল সিং, যিনি পরবর্তীকালে ভারতের ৭ম প্রেসিডেন্ট (১৯৮২-১৯৮৭ইং) হয়েছিলেন। আর আমি ছিলাম জেনারেল সেক্রেটারী। রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করলে ইংরেজ সরকার একসাথে আমাদের ১৩ জনকে আটক করে। যাদের মধ্যে ৪ জন মুসলমান, ৭ জন শিখ এবং ২ জন হিন্দু ছিলেন। জেলে খুব সংকীর্ণ কক্ষে আমাদের আটকে রাখা হয়। কারো সঙ্গে কারোর দেখা করার সুযোগ ছিল না। এমতাবস্থায় বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়। অতঃপর পাঞ্জাব প্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি ড. সাইফুদ্দীন কিচলু আমাদের সাথে দেখা করতে আসেন এবং সার্বিক খবরাখবর নেন। এর কয়েকদিনের মধ্যে আমাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তির পর বাথিনডা রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত হ’লে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। এটা ছিল

Contents

১৯৪৬ সালের জুন মাসের ঘটনা।

আত-তাহরীক : মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সাথে আপনার সাক্ষাতের ঘটনাটি বলুন।

মাওলানা ভাট্টি : মাওলানা আবুল কালাম আযাদ 'কাওলে ফায়ছাল আওর তাযকিরা' বইটি আমি ছোট থাকতেই পড়েছিলাম। পরে তাঁর সম্পাদিত 'আল হেলাল' ও 'আল-বালাগ' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা পড়ার পর তাঁর প্রতি বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে পড়ি। ১৯৩৯ সালে লাহোরে এক সম্মেলনে প্রথম তাঁকে সরাসরি দেখার সুযোগ হয়। মাওলানা দাউদ গযনভীর সভাপতিত্বে আয়োজিত সেই বিশাল জনসমাবেশে ৩৫ মিনিট বক্তব্য রেখেছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। তাঁর বক্তব্য এমন হৃদয়স্পর্শী ছিল যে, মানুষ পিনপতন নীরবতায় বক্তব্য শুনছিল। সরাসরি তাঁর বক্তব্য শোনার অভিজ্ঞতা আমার ওটাই ছিল প্রথম এবং শেষ। তাঁর বক্তব্যে সেদিন এত প্রভাবিত হয়েছিলাম যে, তাঁর কথাগুলো আমার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। কত মানুষকে যে পরে তা শুনিয়েছি এবং পত্রিকাতেও লিখেছি। আজও যেন তা কানে লেগে আছে।

৮ বছর পর ১৯৪৭ সালের ২২ জুন তাঁর সাথে আবার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি হিন্দুস্তানের অন্তবর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। দিল্লীতে তাঁর সরকারী বাসায় আমরা চারজন সাক্ষাৎ করি। মাওলানা মঈনুদ্দীন লাক্ষাভী, কাযী ওবায়দুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুহু আল-ফাল্লাহ এবং আমি। ভোর সোয়া পাঁচটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত তাঁর সাথে আমাদের কথাবার্তা হয়। তিনি ভারতের স্বাধীনতা, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতবিভাগের ফলে মুসলমানদের উপর আসন্ন বিপর্যয় সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন। তিনি খুব স্পষ্টভাষী ছিলেন এবং উন্নত শব্দচয়নে চমৎকারভাবে কথা বলতেন। সামনাসামনি তাঁর মুখ থেকে নির্গত প্রতিটি কথা শোনার পর মনে হচ্ছিল যেন সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম হচ্ছে। সত্যিই তাঁর মত একাধারে বড় আলেম এবং প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিন্দুস্তানে আর জন্ম নেয়নি। তিনি সেদিন বলছিলেন যে, 'আমি লিয়াকত আলী খানকে বলেছিলাম, পাঞ্জাব এবং বাংলা ভাগের দাবী যেন মেনে নিয়ো না। বরং গোটা বাংলা এবং আসামের দাবীতে অটল থাক। কেননা সামগ্রিকভাবে দু'টি অঞ্চলই ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। লিয়াকত আলী খান সেটা নিজে মেনে নিলেও অন্যদেরকে মানাতে পারেনি'।

১৯৪৭ সালের ১২ই আগস্ট আমি এবং কাযী উবায়দুল্লাহ ছাহেব আবার যাই দিল্লীতে। দেশভাগ তখন অত্যাসন্ন। মাওলানা ছিলেন খুব হতাশ। ভারতের মুসলমানদের পরিণতি নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। মিনিট বিশেকের মত কথা হল তাঁর সাথে সেদিন। ঐ দিনই সর্দার প্যাটেলের সাথেও আমরা দেখা করি। তিনি বললেন, দেশভাগের ব্যাপারে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত তিনি ঐ দিন রাত ৮টায় দিল্লীর রামলীলা ময়দানের জনসভায় ঘোষণা করবেন। আমাদেরকে সেখানে আসতে বললেন। পরে আমরা আর যাইনি।

আব্দুর রব নিশতার ছাহেব তখন মুসলীম লীগের পক্ষ থেকে অন্তর্বতীকালীন সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর সাথেও সেদিন দেখা করি এবং আমার যেলা ফরিদকোটে অবস্থানরত মুসলমানদের বিষয়ে করণীয় আলোচনা করি। তিনি বললেন, 'দেশভাগের পরিকল্পনা চূড়ান্ত। আমি কাল করাচী যাচ্ছি পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের জন্য। সারা দেশের অবস্থা সংকটাপন্ন হতে যাচ্ছে। দো'আ করুন যেন পরিস্থিতি শিগগিরই স্বাভাবিক হয়ে আসে।' আমরা তাঁর পরামর্শে পরদিন সন্ধ্যায় নিজ শহর কোটকাপুরার উদ্দেশ্যে রওনা হই। দিল্লী থেকে লাহোরগামী 'বোম্বাই এক্সপ্রেস' ট্রেনে চড়ে যাত্রা করেছিলাম। এটাই ছিল দিল্লী থেকে লাহোরগামী সর্বশেষ ট্রেন। তারপর দাঙ্গা-হাঙ্গামা ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গেল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে দেশবিভাগের ঘোষণা আসল। কিছুদিন পর আমরা সপরিবারে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে হিজরত করে পশ্চিম পাঞ্জাব তথা নবগঠিত পাকিস্তানের ফয়ছালাবাদে চলে আসি। এরপর ১৯৪৮ সালের ২৪ জুলাই আমাকে 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পশ্চিম পাকিস্তান'-এর অফিস সেক্রেটারী হিসাবে মনোনীত করা হয় এবং আমি লাহোরে চলে আসি। জমঈয়তের সভাপতি এবং নাযেমে আ'লা মনোনীত হন যথাক্রমে মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ দাউদ গযনভী (রহ.) এবং প্রফেসর আব্দুল কাইয়ূম (রহ.)।

আত-তাহরীক : লেখালেখির জগতে কখন পদার্পণ করলেন?

মাওলানা ভাট্টি : ১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসে গুজরানওয়ালা থেকে 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর মুখপত্র 'আল-ই'তিছাম'-এর যাত্রা শুরু হয়। সম্পাদক ছিলেন মাওলানা হানীফ নদভী (রহঃ)। আর আমাকে করা হয় সহকারী সম্পাদক। ১৯৫১ সালের মে মাসে মাওলানা হানীফ নদভী (রহঃ) লাহোরে সরকারী সংস্থা 'ইদারায়ে ছাক্বাফাতে ইসলামিয়া'তে যোগদান করলেন। ফলে 'আল-ই'তিছাম' সম্পাদনার দায়িত্ব আমার কাঁধে অর্পিত হয়। দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর আমি এই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকি। ১৯৬৫-এর মে মাসে আভ্যন্তরীণ কিছু কারণে আমি এই দায়িত্ব থেকে ইস্তেফা দেই। অতঃপর ঐ সালেরই অক্টোবরে 'ইদারায়ে ছাক্বাফাতে ইসলামিয়া'-এর রিসার্চ ফেলো হিসাবে যোগদান করি। সেই থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ টানা ৩২ বছর এই ইদারাতেই আমার যিন্দেগী অতিবাহিত হয় এবং গোটা সময়টা নিরবচ্ছিন্নভাবে লেখালেখির মধ্যে ডুবে থাকি। শেষের দিকে কিছুদিন এই ইদারা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'আল-মা'আরিফ' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছি। ইদারা'য় থাকাকালীন চাকুরীর অংশ হিসাবে বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে অংশ নিয়েছিলাম। তবে চাকুরী থেকে অবসর নেয়ার পর আমি স্বাধীনভাবে লেখালেখি শুরু করি এবং খালেছভাবে আহলেহাদীছদের ইতিহাস লেখা শুরু করি। অদ্যাবধি এই ধারা চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত আমার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪০-এর উপরে। এছাড়া পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

Contents

প্রকাশিত উর্দূ এনসাইক্লোপেডিয়াতে আমার লিখিত প্রায় ৪০টি নিবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। বিশেষ করে কুরআন সম্পর্কিত যাবতীয় ভুক্তি আমারই লেখা।

আত-তাহরীক : রেডিও-টেলিভিশনেও আপনি অনেকদিন কাজ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন।

মাওলানা ভাট্টি : হ্যাঁ, ১৯৬৫ সাল থেকেই আমি রেডিও পাকিস্তানে ধারাবাহিক ধর্মীয় আলোচনা শুরু করি। তারপর দীর্ঘ ৩৪ বছর যাবৎ রেডিওতে নানা প্রোগ্রাম করেছি। মাওলানা সুলায়মান মানছূরপুরীর 'রহমাতুল্লিল আলামীন'-এর সারাংশ, 'হাদীছ আওর আসমায়ে রিজাল' ইত্যাদি প্রোগ্রামগুলো বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এছাড়া 'যিন্দা ও তাবিন্দাহ' শিরোনামে একটি প্রোগ্রাম করতাম যেখানে অনেক আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম যেমন মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী, মাওলানা দাউদ গযনভী, মাওলানা আব্দুল্লাহ রৌপড়ী, মাওলানা ইসমাঈল সালাফী প্রমুখের জীবনী আলোচনা করেছিলাম। মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (রহ.) এই প্রোগ্রামটি নিয়মিত শুনতেন যদিও তিনি 'রেডিও' ঘরে রাখার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১৯৭২ সাল থেকে টেলিভিশনেও বিভিন্ন আলোচনা প্রোগ্রামে অংশ নেয়া শুরু করি। তারপর একটা সময় আসে যখন রেডিও, টেলিভিশন উভয় থেকেই আমি নিজেকে গুটিয়ে নেই।

আত-তাহরীক : সাধারণতঃ দেখা যায় ফারেগ হওয়ার পর আলেম-ওলামাগণ মাদরাসায় পাঠদান কিংবা বক্তব্যের ময়দানে যুক্ত হন। কিন্তু আপনি যুক্ত হলেন লেখালেখিতে। এর পিছনে কি কারণ ছিল?

মাওলানা ভাট্টি : লেখালেখির ইচ্ছাটা ছোট থেকে কিছুটা ছিল, যেহেতু আমি পড়তে ভালবাসতাম। তবে এ নিয়ে কোন পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। দেশবিভাগের পূর্বে আমি শিক্ষকতাই করতাম, বক্তব্যও দিতাম কখনও। লেখালেখির কোন সুযোগ হয় নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখন 'আল-ইতিছাম' পত্রিকার দায়িত্বে আসলাম, তখন পেশাগতভাবে লেখালেখির সুযোগ আসল। মাওলানা হানীফ নদভী (রহ.) এ সময় আমার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁর কাছে আমি অনেক কিছু শিখেছি। তবে 'আল-ই'তিছাম'-এ আমার লেখাগুলো ছিল সাংবাদিকতার মত। কেননা তাতে মূলতঃ রাজনৈতিক কলাম, দ্বীনী বিতর্ক, সমালোচনা-পর্যালোচনা ইত্যাদি নানা ধাঁচের কলাম লিখতে হত। পরে 'ইদারায়ে ছাক্বাফাতে ইসলামিয়া'তে আসার পর মৌলিক ও তাহকীকী রচনায় হাত দেই। লেখালেখির জগতে পরিপূর্ণভাবে যুক্ত হয়ে পড়ি মূলতঃ তখন থেকেই। যতটুকু অর্জন করেছি তাতে আমার নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নেই। এটা আল্লাহর একান্ত ফযল ও করম এবং আমার আসাতিযায়ে কেরামের উত্তম তারবিয়াতের ফসল।

আত-তাহরীক : **৪৭-এর দেশ বিভাগ আপনার চোখের সামনেই হয়েছে। কংগ্রেসের রাজনীতিতে যুক্ত থাকায় আপনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন না। সে সময়কার পরিস্থিতিটা একটু ব্যাখ্যা করবেন?**

মাওলানা ভাট্টি : হ্যাঁ, তৎকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশভাগের বিরুদ্ধেই ছিল আমার অবস্থান। কেননা আমরা ভেবেছিলাম এতে মুসলমানদের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হবে। মুসলমানরা বিভক্ত হয়ে পড়বে। অপরদিকে ভারতে বসবাসরত মুসলমানরা হিন্দুদের অধীনস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু শেষদিকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ এত চরমে ওঠে যে একত্রিত থাকার আর কোন অবস্থা ছিল না। স্বয়ং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন দেশভাগের প্রস্তাব অনুমোদন করে। কিন্তু যেভাবে দেশবিভাগ কার্যকর হয়েছিল এবং একে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে যে পরিমাণ রক্তপাত ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়েছিল, তা ছিল খুব বিপর্যকর। এতে ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়েছিল বেশীরভাগই মুসলমানরা। দুঃখের বিষয় হল, সেই খুন-খারাবী ও বিশৃংখলার ধারাবাহিকতা আজও পর্যন্ত পাকিস্তানের পিছু ছাড়ে নি। অথচ এটা হওয়ার কথা ছিল না।

আত-তাহরীক : **আপনার ঐতিহাসিক রচনাবলীর বড় অংশই হল মনীষীদের জীবনীমূলক। এই ধারাটি কেন বেছে নিলেন?**

মাওলানা ভাট্টি : মনীষীদের জীবনী রচনার ধারাটি মূলতঃ শুরু করেছিলাম ১৯৮২ সাল থেকে। ইদারায়ে ছাক্বাফাতে ইসলামিয়ার বিশিষ্ট গবেষক মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ জা'ফর ফালওয়ারাভী মৃত্যুবরণ করার পর আমি তাঁর জীবনী রচনা করি। 'আল-মা'আরিফ' পত্রিকায় সেটি ছাপা হলে তা ইদারার পরিচালক প্রফেসর মুহাম্মাদ সাঈদ শেখের নযরে আসে। তিনি লেখাটির উচ্চ প্রশংসা করেন। এতে আমি উৎসাহিত হই। এরপর মাওলানা আব্দুল্লাহ লায়ালপুরী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর জীবনীর উপরও একটি প্রবন্ধ লিখি 'আল-মা'আরিফ' পত্রিকায়। সেটি পড়ার পর প্রসিদ্ধ সাংবাদিক জনাব আব্দুল্লাহ মালেক আমার কাছে দীর্ঘ পত্র লেখেন এবং তাতে উল্লেখ করেন যে, আপনি প্রবন্ধটি যেভাবে লিখেছেন তাতে আমি এত প্রভাবিত হয়েছি যে, আমার চোখে পানি চলে এসেছিল। জনাব আব্দুল্লাহ মালেক ছাহেব সম্পর্কে আরেকটু না বললেই নয় যে, তিনি ছিলেন লাহোরের চিনাওয়ালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের একজন ট্রাস্টি। পরে তিনি হঠাৎ কম্যুনিজমে দীক্ষিত হন। তিনি মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর উপর একটি বই লিখেছেন। বেশকিছু রাজনৈতিক গ্রন্থও লিখেছেন। 'পাকিস্তান টাইমস' এবং 'এমরোয' পত্রিকার সাথে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন তিনি। সস্ত্রীক একবার তিনি হজ্জও করেন এবং ফিরে এসে রচনা করেন 'একজন কম্যুনিস্টের হজ্জের দিনলিপি'।

১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে ইদারায়ে ছাক্বাফাতে ইসলামিয়া'র উদ্যোগে মাওলানা হানীফ নদভী (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ওলামায়ে কেরাম প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমি নিজেও একটি ছোটখাটো প্রবন্ধ লিখি এবং সেমিনারে পাঠ করি। শিরোনাম ছিল 'মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নদভী (রহ.) ওয়াকে'আত ওয়া লাতায়েফ কি আয়েনে

মে'। অনুষ্ঠানে তৎকালীন ফেডারেল শিক্ষামন্ত্রী ড. মুহাম্মাদ আফযাল উপস্থিত ছিলেন। আমি প্রবন্ধটি পাঠ করার পর উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে খুব সাড়া পড়ে যায়। পরবর্তীতে অনেকে চিঠি লিখে প্রবন্ধটির প্রশংসা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের মাশহূর সাংবাদিক মুজীবুর রহমান শামীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর সম্পাদিত 'কওমী ডাইজেস্ট' পত্রিকায় লেখার জন্য আমাকে দাওয়াত দিলেন। আমি সেই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কয়েকজন মনীষীর জীবনী লিখেছিলাম। এভাবেই আমার জীবনী রচনার ধারাটি গড়ে ওঠে। আজও পর্যন্ত তা অব্যাহত রেখেছি।

***আত-তাহরীক :* বর্তমানে কি বিষয়ে লিখছেন?**

মাওলানা ইসহাক ভাট্টি : বর্তমানে 'চামানিস্তানে হাদীছ' এবং 'বুস্তানে হাদীছ' নামে দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পথে রয়েছে। আর লাক্ষাভী ওলামায়ে হাদীছের উপর একটি বই লিখছি এখন। আল্লাহ চাহেন তো খুব শিগগীরই তা সমাপ্ত হবে।

***আত-তাহরীক :* লেখালেখির জীবনে ঘটে যাওয়া কোন স্মরণীয় ঘটনার কথা বলবেন কি?**

মাওলানা ভাট্টি : বিগত ৬০ বছরের লেখালেখির জীবনে স্মরণীয় অনেক ঘটনাই তো রয়েছে। দু'একটি বলি। ২০০৩ সালের ঘটনা। আমি 'তাযকিরায়ে ছূফী মুহাম্মাদ' নামে একটি বই লিখেছিলাম। ছূফী মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ছিলেন জামা'আতে মুজাহিদীনের আমীর। ১৯২২ সালের দিকে তিনি বর্তমান ফয়ছালাবাদ যেলার উডাওয়ালাতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রায় ৪০ বছর পর তিনি ১৯৬৩ সালে মামূকাঞ্জনে 'দারুল উলূম' নামে ভিন্ন একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী পরহেযগার মানুষ ছিলেন এবং তাঁকে মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াহ বলা হ'ত। মাওলানা ছূফী আয়েশ মুহাম্মাদ সহ অন্যান্য বন্ধুদের অনুরোধে আমি তাঁর উপর সাড়ে তিন'শ পৃষ্ঠার একটি বই রচনা করি। লেখা শেষ করার পর চিন্তা করলাম বইটি ছাপানোর পূর্বে মাওলানা আব্দুল কাদের নদভীকে (তিনি ছূফী ছাহেবের খুব নিকটের মানুষ ছিলেন এবং বর্তমানে তিনিই তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার পরিচালক) বইটি একবার দেখিয়ে নিতে হবে। কিছু কম-বেশী করার দরকার হ'লে তাঁর পরামর্শ মোতাবেক করে নেব। সেই মোতাবেক উনার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করি এবং ৭ই মে ২০০৩ আমি নিজে ফয়ছালাবাদে তাঁর মাদরাসায় গিয়ে তাঁর হাতে কম্পোজকৃত খসড়া কপিটি দিয়ে আসি। তিনি বললেন, 'আপনি লাহোরে ফিরে যান। আমি দু'দিন পর ৯ তারিখে এটি আপনার কাছে ফেরৎ পাঠাব। আমি লাহোরে চলে আসলাম। নির্ধারিত দু'দিন পার হয়ে গেল। তিনি পাঠালেন না। আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। অতঃপর মে মাস পার হয়ে জুনও অতিক্রম করল। এ ব্যাপারে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও আমার লজ্জাবোধ হচ্ছিল। আমার এক বন্ধু মরহূম আলী আরশাদকে দায়িত্ব দিলাম বিষয়টি জানার জন্য। তিনি বললেন, 'তুমি উনার কাছে খোঁজ নাও, কে জানে তিনি আবার সেটি হারিয়েই ফেলেছেন নাকি'। তাঁর কথা শুনে আমি আর দেরী না করে ২৭শে জুলাই ফয়ছালাবাদ রওয়ানা হলাম। সেখান থেকে আলী আরশাদ ছাহেব, জামে'আ সালাফিইয়ার শায়খুল হাদীছ মাওলানা আব্দুল আযীয আলাভী, ড. খালেদ যাফরুল্লাহকে নিয়ে আমি মাওলানা আব্দুল কাদেরের নিকট উপস্থিত হলাম। তাঁর সাথে নানা প্রসঙ্গে কথা চলতে থাকল। কিন্তু তিনি আমার বইটি সম্পর্কে কিছুই বলছেন না। অবশেষে বললাম, 'মাওলানা, আমি যে বইটি কি আপনাকে দিয়েছিলাম দেখার জন্য, ওটা কি দেখেছিলেন'? তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কোন বই'? আমি বললাম, 'ছূফী ছাহেবের উপর আমার লেখা যে বইটি আপনাকে দিয়েছিলাম সেটি'। তিনি বললেন, এমন কোন বই তো তুমি আমাকে দাওনি? আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম। তখন উনি বললেন, 'আমি তাহলে ফেরৎ দিয়েছি'। 'কবে ফেরত দিয়েছেন?' তিনি আর কোন জওয়াব দিতে পারলেন না।

যাইহোক, তিনি বইটি কোথায় রেখেছিলেন তা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন, আর খুঁজে পেলেন না। হাফেয আহমাদ শাকের 'ই'তিছাম' অফিসের কম্পিউটারে খসড়াটি কম্পোজ করিয়েছিলেন। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানা গেল গত জুন মাসে কম্পিউটারটি ক্রাশ করায় সব ডাটা হারিয়ে গেছে। ফলে কম্পোজ কপিও আর পাওয়া যাবে না। আমি শোকে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এত কষ্ট করে লেখা বইটি খসড়া সহ হারিয়ে গেল? আমি কাউকে আর এ ব্যাপারে কিছু বললাম না।

এরই মধ্যে দৈনিক 'জং' পত্রিকায় আমার এক বন্ধু হারূনুর রশীদ ছূফী ছাহেবের উপর একটি কলাম লিখলেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করলেন যে, 'ইসহাক ভাট্টি ছাহেব উনার উপর একটি কিতাব লিখছেন'। অথচ আমার কাছে তখন সেই কিতাবের একটি অক্ষরও অবশিষ্ট নেই। অবশেষে এই কলামটি দেখার পর আমি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম যে, আমি ছূফী ছাহেবের উপর পূর্বে কিছু লিখেছিলাম। সবকিছু ভুলে আবার নতুন করে লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। কেননা পত্রিকায় বিষয়টি আসার পর দেশ-বিদেশের লোকজন ফোন করে লাগাতার জানতে চাইবে বইটির খবর। আমি তাদের কী জওয়াব দেব? সুতরাং হিম্মত নিয়ে কলম ধরলাম এবং দ্বিতীয়বার লেখা শুরু করলাম। প্রথম বারে রচিত বইটি তো সাড়ে তিন'শ পৃষ্ঠার ছিল, আর দ্বিতীয় বারের রচনাটি আল্লাহ অশেষ রহমতে মাত্র দু'মাসের প্রচেষ্টায় সাড়ে চার'শ পৃষ্ঠায় উপনীত হল। আগেই বলেছি খসড়া কপিটি হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমি কাউকেই কিছু বলিনি। পরবর্তীতে একটি অনুষ্ঠানে স্বয়ং মাওলানা আব্দুল কাদের নদভী ঘটনাটি উল্লেখ করলেন এবং বললেন, 'ভাট্টি ছাহেব খুব বড় হৃদয়ের মানুষ। এমন একটি ইলমী সম্পদ হারিয়ে যাওয়ার পরও তিনি টু শব্দটি করেননি। যদি আমি হতাম তাঁর জায়গায়, তাহলে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিতাম'।

আরেকটি ঘটনা বলি ১৯৫৫ সালের। ফয়ছালাবাদে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের ৩য় বার্ষিক সম্মেলন। মাওলানা

ইসমাঈল সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। একই সাথে সেদিন জামে'আ সালাফিইয়ারও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হওয়ার কথা। মাওলানা ইসমাঈল সালাফী মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ গযনভী (রহ.)-এর সন্তান এবং মাওলানা দাউদ গযনভী (রহ.)-এর চাচাতো ভাই। অনেক বড় আলেম। সম্মেলনের আগে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় মাওলানা দাউদ গযনভী আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'আপনি সভাপতির বক্তব্যটি লিখে দেবেন, যেটি সম্মেলনের শুরুতে পড়া হবে'। আমি সবিনয়ে মাওলানাকে বললাম, 'মাওলানা ইসমাঈল অনেক বড় মাপের মানুষ। তিনি সম্মেলনে যা বলতে চান তা আমার পক্ষে কিভাবে লেখা সম্ভব? আমার তো সেই ভাষাও নেই, চিন্তাশক্তিও নেই'! মাওলানা আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'আপনি লিখুন, আমার বিশ্বাস আপনি সেভাবেই লিখতে পারবেন, যেভাবে মাওলানা ইসমাঈল চিন্তা করেছিলেন'।

মাওলানার ফরমান মোতাবেক আমি রাত ন'টায় লিখতে বসলাম এবং রাত দু'টায় শেষ করলাম। পরদিন সকালে ৮টার সময় অফিসে হাযির হয়ে মাওলানাকে সেটি দেখালাম। মাওলানা খুবই খুশী হলেন এবং আমার জন্য অনেক দো'আ করলেন। পরদিন লেখাটি প্রিন্ট করে মাওলানা গযনভী আমাকে মাওলানা ইসমাঈলের নিকট নিয়ে গেলেন। মাওলানা ইসমাঈল পুরো বক্তব্যটি পড়ার পর আমাকে খুব ধন্যবাদ দিলেন এবং বললেন আপনি আমার চিন্তাধারা ঠিক ঠিক ভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি পুরস্কারস্বরূপ আমাকে ২০০ রূপি হাদিয়া দিলেন। যেটা তখন আমার মাসিক বেতনের সমপরিমাণ ছিল। এই ধরনের বেশ কিছু স্মরণীয় ঘটনা রয়েছে আমার লেখালেখির জীবনে।

***আত-তাহরীক :* আপনি অনেক সমকালীন আলেমদের জীবনী লিখেছেন। নির্মোহভাবে কারো জীবনী লেখার কাজটি সহজ নয়। বিশেষ করে কম-বেশী পক্ষপাতের একটা সুক্ষ্ম টানাপোড়েন থেকে যায়। এগুলো কিভাবে সামাল দিয়েছেন?**

মাওলানা ভাট্টি : আমি যে সকল ওলামায়ে কেরামের উপর লিখেছি, আপন মর্যীর উপর ভিত্তি করে লিখেছি। আমার অন্তর যা বলেছে এবং যা আমি জানি তা-ই লিখেছি। চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য নির্মোহভাবে লিখতে। আমার লেখার সাথে অনেকের মত মিলতেও পারে, নাও মিলতে পারে। আমি প্রতিটি মানুষকে মানুষই মনে করি, ফেরেশতা নয়। প্রতিটি মানুষের যেমন ভাল দিক থাকে, তেমন কিছু কমতিও থাকে। আমি নিজের ধ্যান-ধারণা থেকেই তা প্রকাশ করেছি। যে ব্যক্তি সম্পর্কে লিখতে আমার অন্তর চায় না, তাঁর সম্পর্কে আমি চেষ্টা করেও লিখতে পারি না। আমি বহু মানুষের জীবনী লিখেছি এবং তা অন্তরের গভীর থেকেই লিখেছি। এসব জীবনীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মনে করি মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহঃ), মাওলানা দাউদ গযনভী (রহঃ), সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী (রহঃ) এবং মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নদভী (রহঃ)-এর জীবনী।

(ক্রমশঃ)

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী

*নূরুল ইসলাম**

ভূমিকা :

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী ভারতীয় উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ছিলেন। ইলমে হাদীছের প্রচার-প্রসারে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। মৃত সুন্নাত পুনর্জীবিতকরণে তাঁর অবদান অবিসংবাদিত। তিনি সুদীর্ঘ ৬০ বছর দরস-তাদরীসের মাধ্যমে একদল যোগ্য ছাত্র তৈরি করেন, যারা এ উপমহাদেশে কুরআন ও সুন্নাহ্র বাণীকে সমুন্নতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দিল্লীতে তাঁর খুৎবা শুনে বহু মানুষ আহলেহাদীছ হয়েছেন। জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতঃ তিনি ১৮৯৫ সালে 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' প্রতিষ্ঠা করেন। বায়'আত ও ইমারতভিত্তিক এই সংগঠনটি উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জন্ম ও বংশ পরিচয় :

তাঁর নাম আব্দুল ওয়াহ্হাব, উপনাম আবু মুহাম্মাদ এবং উপাধি 'মুহাদ্দিছে হিন্দ' (ভারতের মুহাদ্দিছ)।[১৭৯] তিনি হীরার জন্য বিখ্যাত পাঞ্জাবের ঝং যেলার 'ওয়াসুআস্তানা' (واسوآســتانه) নামক অখ্যাত গ্রামে এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মসন সঠিকভাবে জানা যায় না। তিনি মৃত্যুর ৩ মাস ১০ দিন পূর্বে ১৩৫১ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের শেষের দিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ'-কে যে অছিয়ত করেছিলেন, সেটি একই সনের রবীউল আখের মাসে 'ছহীফায়ে আহলেহাদীছ' (দিল্লী) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'বর্তমানে আমার বয়স ৭০ বছর হবে'। এই হিসাবে তাঁর জন্মসন ১২৮০ হিঃ/১৮৬৩ খ্রিঃ।[১৮০] তাঁর বংশপরিক্রমা হল- আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন হাজী মুহাম্মাদ বিন মিয়াঁ খোশহাল বিন মিয়াঁ ফাতহ বিন মিয়াঁ কায়েম।[১৮১]

তাঁর পিতৃপুরুষ স্বচ্ছল ও ধার্মিক ছিল। তাদের মধ্যে পরহেযগারিতা ও সৎকর্ম সম্পাদনের মানসিকতা বিদ্যমান ছিল। মাওলানার পিতা মিয়াঁ হাজী মুহাম্মাদ হজ্জ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। সেই সময় হজ্জ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। স্বচ্ছল ও সৎ ব্যক্তিই কেবল হজ্জ সম্পাদন করার জন্য মক্কায় যেত।

মাওলানার বয়স ২/৩ বছর হলে তার পিতা 'ওয়াসুআস্তানা' থেকে মুলতান যেলার মুবারকাবাদ গ্রামে হিজরত করেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[১৮২]

শিক্ষা-দীক্ষা :

৬ বছর বয়সে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। তিনি গ্রামের মসজিদে কুরআন মাজীদ পড়া শেখেন এবং নাযেরানা খতম করেন। এরপর ছোট ভাই নূর মুহাম্মাদকে সাথে নিয়ে ফিরোযপুর যেলার 'লাক্ষৌকে'তে অবস্থিত হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মাদরাসা 'জামে'আ মুহাম্মাদিয়া'তে ভর্তি হন। এখানে তিনি সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদ হিফয শুরু করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রখর ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। একবার যা মুখস্থ করতেন তা ভুলতেন না। এজন্য অল্প সময়ে তিনি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করতে সক্ষম হন। এরপর নাহু-ছরফের বই পড়া শুরু করেন। জামে'আ মুহাম্মাদিয়াতে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম হাফেয আব্দুল্লাহ গযনভী প্রতিষ্ঠিত অমৃতসরে অবস্থিত 'মাদরাসা গযনভিয়াহ'তে ভর্তি হন। এখানে নাহু-ছরফের গ্রন্থগুলো পড়া শেষ করার পর বুলূগুল মারাম, রিয়াযুছ ছালেহীন প্রভৃতি হাদীছের প্রাথমিক গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করেন। এ দু'টি মাদরাসায় অধ্যয়নকালে মাওলানা গযনভী ও হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবীর ইলম ও আমল এবং তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা দ্বারা তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হন। তাঁর চিন্তা-চেতনা ও কর্মে সারাজীবন তাঁদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল।[১৮৩]

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন সকাশে :

পনের বছর বয়সে তিনি অনেক দ্বীনী গ্রন্থ অধ্যয়ন শেষ করেন। এরপর হাদীছের উচ্চতর গ্রন্থাবলী পড়ার জন্য ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে দিল্লী যাত্রা করেন। সেখানে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর মাদরাসায় গিয়ে ভর্তি হয়ে হাদীছ অধ্যয়নে নিমগ্ন হন। দু'ভাই দিল্লীর হাফীযুল্লাহ খাঁ মসজিদে থাকতেন। দেহলভী উক্ত মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করাতেন এবং মিশকাতুল মাছাবীহ-এর দরস প্রদান করতেন। কূয়া থেকে পানি উত্তোলন করে মুছল্লীদের ওযূর ব্যবস্থা করার জন্য দু'ভাই মাসে ১২ আনা পেতেন। এর দ্বারা তারা খাদ্যদ্রব্য, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং বইপত্র ক্রয় করতেন। অনেক সময় রুটি-তরকারী ক্রয় করতে না পারলে ছোলা ভাজা অথবা গাজর-মূলা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতেন।[১৮৪]

ইলম অর্জনে কষ্ট স্বীকার :

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী তাঁর ছাত্রের যোগ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। দিল্লীর সোরাই হাফেয বান্না (বর্তমানে গান্ধী মার্কেট, সদর বাজার, দিল্লী) মসজিদের মুছল্লীরা মিয়াঁ ছাহেবের কাছে একজন খতীব দেয়ার অনুরোধ

** পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১৭৯. *মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব, মুকাম্মাল নামায (করাচী : মাকতাবায়ে ইশা'আতুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৪ খ্রিঃ), পৃঃ ৩, আবু মুহাম্মাদ মিয়াঁওয়ালী লিখিত ভূমিকা দ্রঃ।*

১৮০. *মুহাম্মাদ রামাযান ইউসুফ সালাফী, মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আওর উনকা খান্দান (পাকিস্তান : মারকাযী দারুল ইমারত, জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হিঃ/২০১০ খ্রিঃ), পৃঃ ২৮।*

১৮১. *ঐ; মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ২৮।*

১৮২. *মুহাম্মাদ রামাযান ইউসুফ সালাফী, চার আল্লাহ কে অলি (পাকিস্তান : জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ, ২০০২ খ্রিঃ), পৃঃ ৭।*

১৮৩. *মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ২৯-৩০।*

১৮৪. *মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ৬-৭; মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৩০-৩১।*

জানালে তিনি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাবকে সেখানকার খতীব নিযুক্ত করেন। তিনি সেখানে জুম'আর খুৎবা প্রদান ছাড়াও মিশকাতুল মাছাবীহ-এর দরস দেয়া শুরু করেন। অল্প সময়ের ব্যবধানেই তাঁর দরস ও খুৎবার প্রভাব প্রকাশিত হতে শুরু করে। উক্ত হানাফী মসজিদের মুছল্লীরা আহলেহাদীছ হতে আরম্ভ করে। এতে হানাফীদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। তারা মাওলানার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। একদিন রাতে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে হানাফীরা তাঁর সংগৃহীত দুর্লভ গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য বইপত্র কাপড়ে বেঁধে মসজিদের কূয়াতে ফেলে দেয়। ভোরবেলায় তিনি অবগত হলে সেগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিছু বই উদ্ধার করতে সমর্থ হলেও অধিকাংশই পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে যায়।[১৮৫] মাওলানার প্রিয় ছাত্র মাওলানা আব্দুল জলীল সামরূদী এ সম্পর্কে বলেন, 'একদিন সকাল বেলায় মাওলানার সাথে কিষাণগঞ্জ যাওয়ার পথে ঐ কূয়া অতিক্রমকালে মাওলানা সেখানে নিয়ে গিয়ে কূয়া দেখিয়ে বলেন, সোরাইওয়ালারা এর মধ্যে আমার বইপত্র নিক্ষেপ করেছিল। আমি উঁকি মেরে দেখলে সেখানে বইপত্রগুলোর পৃষ্ঠার উপরে শুধু ময়লা পানি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আমার চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। আমি তোমাকে কী আর বলব'।[১৮৬]

দাওরায়ে হাদীছ সম্পন্ন :

ছাত্রজীবনে মাওলানা ধৈর্যের সাথে নানান প্রতিকূলতাকে মুকাবিলা করেন এবং নিজেকে দ্বীনী ইলম হাছিলের পথে ধরে রাখেন। এভাবে ১৪ বছর ধরে ইলমে দ্বীন হাছিল করে ১৯/২০ বছর বয়সে ফারেগ হন। তিনি সেযুগের চারজন সেরা মুহাদ্দিছের নিকট তাফসীর, কুতুবে সিত্তাহ, আরবী সাহিত্য, নাহু-ছরফ ও অন্যান্য বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এঁরা হলেন (১) মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী (২) মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী (৩) ইমাম শাওকানীর ছাত্র মাওলানা মানছূরুর রহমান (পরে ঢাকাভী) ও (৪) মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী।[১৮৭]

দরস-তাদরীস :

ফারেগ হওয়ার পর মাওলানা দেহলভী দিল্লীতে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য স্বীয় পিতা হাজী মুহাম্মাদকে দিল্লীতে নিয়ে আসেন। দিল্লীর হাজী নূর ইলাহীর মেয়ে মুহাম্মাদী বেগমের সাথে তাঁর বিবাহ হলে দিল্লীর সাথে সম্পর্ক আরো গভীর হয়।

ফারেগ হওয়ার পর তিনি ১৩০০ হিজরীর প্রথম দিকে দিল্লীর কিষাণগঞ্জ মসজিদে 'দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ' নামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মহান আল্লাহ তাঁকে হাদীছের বুঝ এবং হাদীছ সমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন করার অপরিসীম যোগ্যতা দান করেছিলেন। ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন স্থান ও অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে ছাত্ররা তাঁর মাদরাসায় এসে জ্ঞানার্জন করে যোগ্য আলেম হিসাবে বের হয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্র ঝাণ্ডাকে উড্ডীন করতে থাকেন।

তিনি উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করতেন। দিন দিন দরস-তাদরীসের পরিধিও বাড়তে থাকে। কিন্তু এমন এক অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, মসজিদ ও মাদরাসা স্থানান্তরিত করতে হয়। এ খবর তাঁর ভক্ত হাজী আব্দুল গণী পাঞ্জাবী অবগত হলে দিল্লীর সদর এলাকায় একটা বড় প্লট ক্রয় করে সেখানে 'মসজিদে কালাঁ' (বড় মসজিদ) নামে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করে দেন।[১৮৮] মসজিদ নির্মাণের সময় নির্মাতা হাজী আব্দুল গণী মাওলানাকে বলেন, 'মসজিদের পাথরে আপনার নাম খোদাই করে দেই। যাতে আমার পরে আপনাকে কেউ এই মসজিদ থেকে বের করে দিতে না পারে'। জবাবে তিনি বলেন, 'মসজিদে আমার নাম লেখার প্রয়োজন নেই। মসজিদ থেকে বের করে দিলে মহান আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা করে দিবেন'। অবশেষে হাজী ছাহেব নিজের নামফলক মসজিদে স্থাপন করেন।[১৮৯] তাছাড়া মাওলানার থাকার জন্য একটা সুন্দর বাড়িও হাজী ছাহেব তৈরী করে দেন। ফলে কিষাণগঞ্জ থেকে মাদরাসাটি এ মসজিদে স্থানান্তরিত হয় এবং এখানে ইলমের বৃষ্টি অঝোর ধারায় বর্ষিত হতে থাকে। মাওলানার দরস, ওয়ায-নছীহত ও জুম'আর খুৎবা শ্রবণ করে লোকজন শিরক ও বিদ'আত থেকে তওবা করতে থাকে। এতে উক্ত এলাকা তাওহীদের রোশনীতে আলোকিত হয়ে উঠে।

ইত্যবসরে মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব হজ্জ সম্পাদন করতে গেলে হাজী আব্দুল গণী মৃত্যুবরণ করেন। তদীয় পুত্র মুহাম্মাদ ওমরকে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা হয়। তার চাচা গোঁড়া হানাফী ছিলেন। তিনি মাযহাবী কারণে মাওলানাকে মোটেই সহ্য করতেন না। মাওলানার হজ্জে যাওয়াকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে তিনি ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেন। তিনি ভাতিজাকে মাওলানার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন এবং এই পরিকল্পনা করেন যে, হজ্জ থেকে ফিরলে মাওলানাকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। বাস্তবেই হজ্জ থেকে ফেরার পর তাঁকে আর মসজিদে ঢুকতে দেয়া হয়নি। মাওলানাও জোর করে মসজিদে প্রবেশ করার চেষ্টা না করে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। মসজিদের হুজরা থেকে নিজের আসবাবপত্র ও বইপুস্তক চেয়ে নিয়ে ঘরে রেখে দেন। বাড়ির নিচের অংশ- যেটি মেহমানখানা হিসাবে ব্যবহৃত হত, সেটাকে মাদরাসার রূপ দান করে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করেন। এখানে জুম'আ ও জামা'আতের ব্যবস্থা করেন এবং পূর্বের ন্যায় দরস-তাদরীস চলতে থাকে। ১৩২৫ হিজরীর দিকে এ ঘটনা ঘটেছিল। এর কিছুদিন পর কালাঁ মসজিদের হিতাকাঙ্খীরা মাওলানার কাছে এসে ক্ষমা

১৮৫. *মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ৭; ড. মুহাম্মাদ বাহাউদ্দীন, তাহরীকে খতমে নবুঅত (লাহোর : মাকতাবা কুদ্দূসিয়াহ, ২০০৬), ৩/৪১৪-৪১৫।*
১৮৬. *মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৩২-৩৩।*
১৮৭. *মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ৮।*
১৮৮. *মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৫১-৫৩।*
১৮৯. *ঐ, পৃঃ ১০৬।*

Contents

চেয়ে তাঁকে ও ছাত্রদেরকে সেখানে নিয়ে যান। এভাবে পূর্বের সেখানে মতো পূর্ণোদ্যমে দরস-তাদরীস চলতে থাকে।[১৯০]

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা :

ঐ সময় কতিপয় আহলেহাদীছ আলেম মাওলানাকে রেঙ্গুনে যাওয়ার দাওয়াত দেন। মাওলানা তাদের আন্তরিক দাওয়াতে সেখানে যান এবং বক্তব্যের মাধ্যমে তাওহীদ ও সুন্নাহ্র বাণী প্রচার করেন। লোকজন তাঁর বক্তব্যে অত্যন্ত প্রভাবিত হয় এবং তারা মোটা অংকের অর্থ জমা করে মাওলানাকে দেন। রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে তিনি দিল্লীর সদর বাজার এলাকায় ঐ অর্থ দিয়ে জায়গা ক্রয় করে 'দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ' নামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্রদের জন্য রুম ও মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদ ও মাদরাসার ছাদে টিন দেয়া হয়েছিল। টিনের ছাদের নিচে দরস-তাদরীস ও জুম'আ-জামা'আতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মাওলানার লাগানো তাওহীদ ও সুন্নাতের এই বাগান আজও সবুজ ও সতেজ রয়েছে। দেশ বিভাগের পরে মাওলানার পরিবার দিল্লী থেকে হিজরত করে করাচীতে চলে আসেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ সালাফী শুভাকাঙ্খীদের জোরাজুরিতে দিল্লীতে থেকে যান এবং মাদরাসা দেখাশুনা করেন। তিনি ১৯৪৭-১৯৯৮ পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দী এ গুরুদায়িত্ব পালন করেন।[১৯১]

অল্প সময়ের ব্যবধানে এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে ভারত ছাড়াও কাশ্মীর, তিব্বত, বাংলা প্রভৃতি দেশ থেকে ছাত্ররা এখানে ভর্তি হ'তে থাকে। উক্ত মাদরাসায় মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব মুহাদ্দিছীনে কেরামের মানহাজ অনুযায়ী কুরআন ও হাদীছের দরস দিতেন। প্রথম থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত এখানে পড়ানো হত। যেসব দুর্বল ছাত্র কোথাও ভর্তির সুযোগ পেত না তারা এখানে পড়ার সুযোগ পেত। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে মাওলানা আব্দুল জলীল সামরূদী বলেন, 'তাঁর দরসের এমন সৌন্দর্য ছিল যা তার সমসাময়িকদের দরসে বাতি নিয়ে তালাশ করলেও খুঁজে পাওয়া যেত না। হানাফী আলেমরা পর্যন্ত দরস পরখ করার জন্য আসতেন। তিনি দরসে মাসআলাকে গভীরে নিয়ে গিয়ে ছাড়তেন। কোন কথা সূত্রবিহীন বলতেন না। তিনি হানাফীদের সূক্ষ্ম মূলনীতিগুলো এমনভাবে উল্লেখ করতেন যে, তাঁর উদ্ধৃতি প্রদান দেখে আমরা ঈর্ষান্বিত হতাম যে, তিনি এসব জিনিস কখন দেখেছেন'।[১৯২]

মাওলানা আব্দুল জলীল আরো বলেন, ফজরের ছালাতের পরে কুরআন মাজীদের তরজমার 'দরসে আম' হত। এরপর ছাত্রদেরকে একটি একটি করে আয়াতের অনুবাদ পড়ানো হত। এতে সব ছাত্রকে অংশগ্রহণ করতে হ'ত। এমনকি বুখারী জামা'আতের ছাত্র হ'লেও। এরপর তাফসীরুল কুরআন তারপর হাদীছের দরস হ'ত। যারা বুলূগুল মারাম পড়ত তাদেরকে তিনি প্রথমে একটি পরে দু'টি শেষে ৪টি হাদীছ এবং মিশকাত জামা'আতের ছাত্রদেরকে ২/৪টি হাদীছ পড়াতেন। সকাল থেকে এগারটা পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করে তারপর বাড়িতে যেতেন। কখনো সাড়ে এগারোটাও বেজে যেত। অতঃপর যোহরের ছালাতের জন্য মসজিদে আসতেন। ছালাত পর দরস দিতেন। মাগরিবের পর বাড়ি ফিরতেন। রাতের খাবারের পর মসজিদে আসতেন এবং পিতার সেবায় নিয়োজিত হতেন। তাঁর হাত-পা টিপে দিতেন। এশার পরেও পিতার সেবা করতেন। তাঁকে দো'আ শিখাতেন। তার ঘুমানোর পর বাড়িতে ফিরে আসতেন। পিতার মৃত্যুর পর এশার পরেই বাড়িতে ফিরতেন। এশার পরে ছাত্ররা তাকে ঘিরে ধরত। তারা বিভিন্ন বই পড়ত এবং তিনি মনোযোগ দিয়ে সেগুলো শুনতেন। ছাত্রদের প্রতি তিনি খুব খেয়াল রাখতেন। পিতা তার একমাত্র সন্তানের সাথে যেরূপ আচরণ করে, ছাত্রদের সাথে তিনিও তেমন স্নেহসুলভ আচরণ করতেন।

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাবের প্রিয় ছাত্র মাওলানা আব্দুল জলীল সামরূদী বলেন, এই অধম ১৩২২ হিজরীতে ১১ বছর বয়সে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে দিল্লী যায়। কিছু উর্দু ও কুরআন মাজীদ নাযেরানা পড়েছিলাম। অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে মিয়াঁ ছাহেবের মাদরাসায় আমাকে ভর্তি করা হয়নি। সেখানে গিয়ে মনে হল সদর বাজারে মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাবের নিকট যাই। তিনি ছোট-বড় সবাইকে তাঁর মাদরাসায় ভর্তি করে নেন। ওখানে পৌঁছলে মাওলানা ছাহেব অবস্থা জানার পর ভর্তি করে নেন। তিনি আমাকে ছাত্রদের সাথে কুরআনের অনুবাদ ক্লাসে শামিল করে নেন। তখন ৩য় পারার পড়া চলছিল। আমার ইলমী যোগ্যতার এই দৈন্যদশা ছিল যে, যখন আমার পড়ার পালা আসে তখন তিনি আমাকে একটি একটি শব্দের অনুবাদ করাতেন এবং ছীগাহগুলোরও অনুশীলন করানো হ'ত। এজন্য ছরফের বাবগুলোও পড়ানো শুরু করে দিয়েছিলেন। নিয়ম ছিল প্রত্যেকটি শব্দ পড়া শেষ হ'লে তিনি বলতেন, এখন সামনে অগ্রসর হও। ... আজ যে দু'হরফ জ্ঞান অর্জন করেছি তা তাঁর নিকট থেকেই করেছি। আল্লাহ্র কসম! দ্বীনী ইলম হাছিলের জন্য আমি কোন আলেমের কাছে নতজানু হয়ে বসিনি। ইলমে হাদীছে এই অকিঞ্চন তাঁর চেয়ে যোগ্য কাউকে পায়নি। তা না হলে আমাকে অন্য কারো জুতা বহন করতে হত'।[১৯৩]

ছাত্রবৃন্দ :

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব দেহলভী কুরআন ও সুন্নাহ্র পুনরুজ্জীবনের জন্য নিজের জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তিনি প্রায় ৬০ বছর শিক্ষকতা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা 'দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ' থেকে হাযার হাযার ছাত্র ইলমে দ্বীন হাছিল করে ফারেগ হন। এদের সঠিক

১৯০. *চার আল্লাহ কে অলি, পৃঃ ১২-১৩।*
১৯১. *মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ১১-১২।*
১৯২. *মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৫৪-৫৬।*
১৯৩. *ঐ, পৃঃ ১৪০-১০৫।*

সংখ্যা জানা যায় না। তাঁর কতিপয় উল্লেখযোগ্য ছাত্র হলেন- (১) খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল জলীল সামরূদী (২) মাওলানা আব্দুল জাব্বার খাণ্ডিলবী (৩) মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (৪) হারাম শরীফের ইমাম আব্দুয যাহির মাক্কী (৫) মাওলানা মুফতী আব্দুস সাত্তার কিলানূরী (৬) মাওলানা আব্দুল জলীল খান বালূচ (৭) মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ উড (৮) মাওলানা আব্দুল্লাহ মুহাদ্দিছ লায়ালপুরী (৯) মাওলানা আব্দুল হামীদ ঝংগাবী (১০) মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক কোটপুরী (১১) মাওলানা মুহাম্মাদ সুরাটী (১২) বিশ্ববরেণ্য আরবী সাহিত্যিক, আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির সাবেক প্রফেসর আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমান (১৩) মাওলানা আব্দুল কাদের হিছারী (১৪) মাওলানা ছূফী মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (১৫) মাওলানা আব্দুস সাত্তার দেহলভী (১৬) মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ প্রমুখ।[১৯৪]

মৃত সুন্নাত পুনর্জীবিতকরণ :

মৃত সুন্নাত পুনর্জীবিতকরণে তিনি অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে তাঁর নিম্নোক্ত ভূমিকা প্রাতঃস্মরণীয়।

(১) তিনিই দিল্লীতে প্রথম প্রকাশ্য ময়দানে ১২ তাকবীরে ঈদের জামা'আত কায়েম করেন (২) তিনিই প্রথম নিজের স্ত্রী-কন্যাদের সাথে নিয়ে পুরুষদের সাথে পর্দার মধ্যে মহিলাদের ঈদের জামা'আত চালু করেন (৩) তিনিই দিল্লীতে প্রথম মুছল্লীদের জন্য মাতৃভাষায় জুম'আর খুৎবা চালু করেন (৪) তিনিই প্রথম 'ছালাতে জানাযা'র কিরাআত সশব্দে পাঠ করা শুরু করেন (৫) তিনিই প্রথম দুষ্ট স্বামীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মযলূম স্ত্রীদেরকে স্বেচ্ছায় বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দিয়ে মযবুত দলীল সহকারে ফৎওয়া প্রকাশ করেন (৬) খতীব মিম্বরে বসার পরে জুম'আর জন্য একটি মাত্র আযান দেওয়ার সুন্নাতে নববী তিনিই দিল্লীতে পুনঃপ্রবর্তন করেন (৭) লোকেরা কালেমায়ে ত্বাইয়িবার দুই অংশকে একত্রে 'কালেমায়ে তাওহীদ' বা 'একত্ববাদের ঘোষণা' মনে করত। তিনি পরিষ্কারভাব বুঝিয়ে দেন যে, কালেমায়ে ত্বাইয়িবার প্রথম অংশটি মাত্র 'কালেমায়ে তাওহীদ' এবং দ্বিতীয় অংশটি হ'ল 'কালেমায়ে রিসালাত' (৮) জীবনমরণ সমস্যা দেখা দিলে হৃদয়ে ঈমান ঠিক রেখে 'কুফরী কালেমা' উচ্চারণ করার পক্ষে সূরায়ে নাহ্ল ১০৬ আয়াতের আলোকে তিনি ফৎওয়া প্রদান করেন- যা ছিল সে যুগের হিসাবে বড়ই ঝুঁকিপূর্ণ ফৎওয়া (৯) হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অজুহাতে মাওলানার সময়ে দিল্লীতে মুসলমানেরা গরু কুরবানী এবং সাধারণভাবে গরু যবেহ করত না। গরুর গোশতের ত্রুটি বর্ণনায় মুসলমানেরা বাড়াবাড়ি করতে থাকে। কোন কোন মৌলবী ছাহেব তো গরুর গোশত খাওয়াকে শূকরের গোশত খাওয়ার মত হারাম ফৎওয়া দেওয়া শুরু করেন। মুসলমানদের এই হীনমন্যতা দেখে মাওলানা দারুণ ক্ষুব্ধ হন এবং প্রবল হিম্মত নিয়ে কুরবানীর জন্য গরু ক্রয় করেন। কিন্তু প্রথম গরুটি বিরোধীরা ছিনিয়ে নেয়। পুনরায় ক্রয় করলে মুসলমান কসাইরা তা যবেহ করতে অস্বীকার করলে তিনি নিজে যবেহ করেন। পরে গরুর গাড়ীতে করে গোশত আনার সময় বিরোধীরা রাস্তায় আটকিয়ে গরু দু'টি ছেড়ে দেয় ও গাড়ীর চাকা খুলে নেয়। অবশেষে ছাত্ররা গোশত মাথায় করে বাড়ীতে আনে।

পরবর্তীতে সুধী ওলামায়ে কেরাম একবাক্যে স্বীকার করেন যে, যদি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব ঐ সময় ঐ দুঃসাহসিক পদক্ষেপ না নিতেন, তাহ'লে ভারতের বুক থেকে সম্ভবতঃ গরু কুরবানীর সুন্নাত উঠে যেত। কারণ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে যখন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের নেতারা গরু কুরবানী সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করার দাবী নিয়ে ইংরেজ ভাইসরয়ের নিকটে দরখাস্ত পেশ করেন, তখন ইংরেজ সরকার এই মর্মে ঘোষণা দেন করেন যে, 'কোথাও গরু কুরবানী না হওয়ার শর্তে এই বৎসর থেকে গরু কুরবানী আইনতঃ দণ্ডনীয় ঘোষণা করার জন্য আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করেছিলাম। কিন্তু কসাইখানার রেজিস্ট্রারে দেখা গেল যে, মৌলবী আব্দুল ওয়াহ্হাব নামক দিল্লীর জনৈক মুসলমান এ বছর গরু কুরবানী করেছেন। অতএব মুসলমানদের মধ্যে ভিন্নমত থাকায় আমরা গরু কুরবানীকে আইনতঃ দণ্ডনীয় ঘোষণা করতে পারি না'।[১৯৫]

[চলবে]

---

১৯৪. *মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ১৫-১৮; তাহরীকে খতমে নবুঅত ৩/৪১৫; আব্দুর রশীদ ইরাকী, হায়াতে নাযীর, পৃঃ ১৩০।*

১৯৫. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৯৬-৯৭।

সুধারণা ও কুধারণা

*ইহ্সান ইলাহী যহীর**

উপক্রমণিকা : অন্যান্য মহৎ গুণের পাশাপাশি একজন মুসলিমকে যে বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে তা হ'ল মানুষের প্রতি সুধারণা পোষণ করা। সুধারণা সমাজে কল্যাণ বয়ে আনে, ভ্রাতৃত্ববোধ অটুট রাখে। সুচিন্তা-সুধারণা আমাদেরকে বিবেকবান উন্নত মানুষে পরিণত করে। প্রত্যেক বিবেকবান মানুষেরই সুধারণামূলক মনোভাব থাকা আবশ্যক। কেননা অপরের উপর ভাল ধারণা পোষণ করা নেকীতে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ 'সুন্দর ধারণা সুন্দর ইবাদতের অংশ'।[১৯৬]

পক্ষান্তরে কুধারণা মোটেও কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। মন্দ ধারণা পোষণকারী ব্যক্তি হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ-কলহে ইন্ধন যোগায়। নানান অন্যায়-অসার কথাবার্তার বিস্তার ঘটায়। মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়ে মানব মনে অসন্তোষের দানা বাঁধতে শুরু করে। মন্দ ধারণার মধ্য দিয়ে মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধে চিড় ধরে। ফলে একতার বন্ধন ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। এজন্যই অপর মুসলিম ভাই সম্পর্কে সদা-সর্বদা সুধারণা পোষণ করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাক, কারণ কোন কোন ধারণা পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কর না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কর না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে ভালবাসে? বস্তুতঃ তোমরা একে ঘৃণাই কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তওবা কবুলকারী, কৃপানিধান' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। মন্দ ধারণা ও অতিরিক্ত ধারণা থেকেই হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি। আর হিংসা-বিদ্বেষ থেকে অন্যায়ের জন্ম। অনেক ক্ষেত্রে আমরা সুধারণার পরিবর্তে কুধারণাকে প্রাধান্য দিতে পসন্দ করি। অপর মুসলিম ভাইয়ের মানহানি করি, তার মানমর্যাদা নিয়ে টানাহেঁচড়া করি। অথচ এগুলো অমানবোচিত কাজ। হাদীছে সংশয়-সন্দেহ থেকে দূরে থেকে পরস্পরের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে বলা হয়েছে। মিথ্যা ও অনুমান ভিত্তিক বাগাড়ম্বর, বাকপটুতা তো দূরের কথা, অন্তরে মন্দ ধারণার বশবর্তী হ'তেও নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، لاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا 'তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কারণ, ধারণা ভিত্তিক কথাই হ'ল সবচেয়ে বড় মিথ্যাকথা। তোমরা একে অপরের দোষ অনুসন্ধান কর না। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ কর না এবং পরস্পর দুশমনি কর না, বরং তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও হে আল্লাহর বান্দারা'।[১৯৭]

ধারণার প্রকারভেদ : আল্লামা যামাখশারী (রহঃ) ধারণাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন- ১. সুধারণা ২. কুধারণা ও ৩. বৈধ ধারণা।

১. সুধারণা পোষণ করা ওয়াজিব : তা হ'ল আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণ করা। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে তাঁর মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে বলতে শুনেছি, لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ 'তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে'।[১৯৮] অনুরূপভাবে মুমিনদের প্রতি অপরাপর মুমিনদের সুধারণা পোষণ করাও ওয়াজিব ।

২. কুধারণা করা হারাম : আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং মুসলিমদের বাহ্যিক কাজকর্মের উপর কুধারণা বা মন্দ ধারণা পোষণ করা হরাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক'।[১৯৯]

৩. বৈধ ধারণা : যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম সম্পাদনে অত্যধিক পটু, তার মন্দ কাজ-কর্ম প্রকাশ্যে ধরা পড়ে ও মানুষের নিকট মন্দ বলেই সে পরিচিত; এরূপ মানুষ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা হারাম নয়, বরং বৈধ।[২০০] ছালাতে কারো যদি এই সন্দেহ হয় যে, সে কি তিন রাক'আত পড়ল, নাকি চার রাক'আত? তবে সন্দেহ অবসানের লক্ষ্যে কম সংখ্যক রাক'আতের উপর অনুমান করে, বাকী ছালাত পূর্ণ করে ছালাত শেষে সাহু সিজদা দিবে। এই প্রকারের ধারণা ইসলামে বৈধ।[২০১]

সুধারণা তৈরীকরণের কতিপয় উপায় : মানব মনে অপর ভাই সম্পর্কে সুধারণা সৃষ্টির কতিপয় উপায় নিম্নে তুলে ধরা হ'ল, যেগুলো পারস্পরিক ভাল ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

১. দো'আ করা : দো'আ হ'ল সকল কল্যাণের মূল উৎস। রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র কাছে 'ক্বালবে সালীম' তথা সুস্থ আত্মার জন্য শাদ্দাদ বিন আওস (রাঃ)-কে দো'আ শিখিয়েছিলেন। শাদ্দাদ বিন আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'হে শাদ্দাদ বিন

** বি.এ (অনার্স) দ্বিতীয় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১৯৬. *আহমাদ হা/৮০৩৬; আবুদাঊদ হা/৪৯৯৩, সনদ হাসান।*

১৯৭. *বুখারী হা/৪৮৪৯, ৫১৪৩।*

১৯৮. *মুসলিম হা/২৮৭৭।*

১৯৯. *বুখারী হা/৬০৬৪।*

২০০. *ছান'আনী, সুবুলুস সালাম ৪/১৮৯।*

২০১. *বুখারী হা/৩৮৬; মুসলিম হা/৮৮৯।*

আওস! তুমি যখন মানুষকে সোনা-রূপা জমা করতে দেখবে তখন এই কথাগুলো বেশী বেশী বল,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِيْ الأَمْرِ، والعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وأَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْباً سَلِيْماً، وَلِسَاناً صَادِقاً، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِمَا تَعْلَمُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ؛ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কাজের দৃঢ়তা, সৎ পথের উপর অবিচলতা প্রার্থনা করছি; আপনার রহমতের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্বলিত ভাল কাজ ও অনুপম ক্ষমা প্রার্থনা করছি। নে'মতের শুকরিয়া, উত্তম ইবাদত ও 'ক্বালবে সালীম' তথা সুস্থ আত্মা, সত্যবাদী জিহ্বার জন্য দো'আ করছি, আপনার পরিজ্ঞাত সকল কল্যাণ প্রার্থনা করছি ও অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এবং যা আপনি জানেন তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য সমূহের মহাজ্ঞানী'।[২০২]

২. মুসলিম ভাইয়ের প্রতি সর্বাবস্থায় ভাল ধারণা করা : আমাদের প্রত্যেকেই যদি কোন কথা বা কাজ ঘটার সাথে সাথেই অপর মুসলিম ভাই সম্পর্কে উত্তম ধারণা করি, তবে যে কোন পরিস্থিতিতে আমাদের অন্তরাত্মা সুধারণা পোষণ করতে বাধ্য থাকবে। এমনই একটি ঘটনার বৃত্তান্ত আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আয়েশা (রাঃ)-এর উপর যখন অপবাদ আরোপ করা হ'ল, তখন মুমিনদের উচিৎ ছিল মুনাফিকদের খপ্পরে না পড়ে উক্ত অপবাদ শ্রবণের প্রথম ধাপেই তাঁদের উপর সুধারণা পোষণ করা। আল্লাহ বলেন, لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ 'যখন তোমরা একথা শুনলে তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারীগণ নিজেদের বিষয়ে কেন ভাল ধারণা করনি এবং বলনি এটা সুস্পষ্ট অপবাদ?' *(নূর ২৪/১২)*।

৩. কথা শ্রবণের সাথে সাথে সেটাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করা : সালাফে ছালেহীনের কর্মপদ্ধতি ছিল যে, তারা কোন কথা শুনামাত্রই সেটাকে খারাপ অর্থে না নিয়ে উত্তমভাবে গ্রহণ করতেন। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهُ فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا 'তোমার ভাইয়ের ভিতর থেকে যে কথা বের হয়েছে, তাকে তুমি খারাপ অর্থে নিবে না। বরং কোন কথা শুনামাত্রই উত্তমভাবে নিবে'।[২০৩]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) অসুস্থ হ'লে তার কতিপয় ভাই তাকে দেখতে এসে তাকে বলেন, 'আল্লাহ আপনার দুর্বলতাকে শক্তিশালী করুন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ যদি আমার দুর্বলতাকে শক্তিশালী স্থায়িত্ব দেন, তবে তো আমার মৃত্যু হবে! তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি কল্যাণ ছাড়া কিছুই কামনা করিনি। তখন ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, আপনি যদি আমাকে গালিগালাজও করতেন, তবুও আমি তা ভাল অর্থেই নিতাম।[২০৪]

৪. অপরের ওযর-আপত্তি গ্রহণ করা : অপর মুসলিম ভাইয়ের যে কোন কথায় বা কাজে তার ওযর-আপত্তি তালাশ করতে হবে। সালাফে ছালেহীনের উত্তম ধারণার কথা স্মরণ করতে হবে। তাঁরা মানুষকে ক্ষমা করার নিমিত্তে তার ওযর-আপত্তি সমূহ তালাশ করতেন। তাঁদের কথাই ছিল : فَاطْلُبُوْا لَهُ سَبْعِيْنَ عُذْرًا 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের সত্তরটি ওযর অনুসন্ধান কর'।[২০৫]

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, إِذَا بَلَغَكَ عَنْ أَخِيكَ الشَّيْءُ تُنْكِرُهُ فَالْتَمِسْ لَهُ عُذْرًا وَاحِدًا إِلَى سَبْعِينَ عُذْرًا، فَإِنْ أَصَبْتَهُ وَإِلَّا قُلْ: لَعَلَّ لَهُ عُذْرًا لاَ أَعْرِفُهُ 'তুমি যদি তোমার মুসলিম ভাইয়ের মন্দ কিছু আঁচ করতে পার, তবে তাঁর ওযর গ্রহণ কর। যদি কোনই ওযর না পাও তবে বল, হয়তবা তার এমন ওযর আছে যা আমি জানি না।[২০৬] আমরা যদি অপরের ওযরখাহী গ্রহণ করতে পারি তবে মন্দ ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের অন্তরে প্রশান্তি নেমে আসবে।

৫. মানুষের অন্তঃস্থ নিয়তে হস্তক্ষেপ না করা : অন্যের মনের কথায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করলেই আমাদের মনে সুধারণা তৈরী হবে। মানুষের উচিৎ হ'ল মনের সকল বিষয়কে একমাত্র গায়েবজান্তা আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করা। আল্লাহ আমাদেরকে মানুষের অন্তর চিড়ে তার স্বরূপ উদঘাটনের নির্দেশ দেননি। উসামাহ বিন যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে হুরাক্বাহ নামক স্থানে জুহাইনা গোত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য পাঠালেন। সেখানে আমরা প্রভাতে তাদের উপর হামলা করলাম। আমি ও একজন আনছার মিলে তাদের একজনকে আক্রমণ করলাম। আমরা তাকে কাবু করে ফেললে সে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলল। ফলে আনছার ছাহাবী তাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু আমি আমার বল্লম দ্বারা আঘাত করে তাকে হত্যা করলাম। যখন আমরা ফিরে আসলাম, তখন এ সংবাদ রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে পৌঁছল। তখন তিনি বললেন, يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذاً مِنَ الْقَتْلِ فَكَرَّرَهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّى لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ 'হে উসামা! 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'

---

২০২. *আহমাদ হা/১৭১১৪; ছহীহাহ/৩২২৮।*

২০৩. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৯৯২; জামেউল আহাদীছ হা/৩১৬০৪।*

২০৪. *বায়হাক্বী, মানাক্বিবুল ইমাম শাফেঈ ২/১১৬-১১৭; তাবাকাতুশ শাফেঈয়্যাহ আল-কুবরা পৃঃ ১৩৫/১৩৮।*

২০৫. *আবুদাঊদ হা/৫১৬৪, সনদ ছহীহ; শু'আবুল ঈমান হা/৮৩৪৪।*

২০৬. *বায়হাক্বী হা/৭৯৯১; ১০৬৮৪।*

বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে? আমি বললাম, সে হত্যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য কালিমা পড়েছে। রাসূল (ছাঃ) কথাটার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। আর আমি আফসোসের সাথে কামনা করলাম, হায়! আমি যদি এ দিনের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করতাম।[২০৭]

৬. মন্দ ধারণার কুফল সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকা : অধিকাংশ মানুষের স্বভাব হ'ল অপর ভাই সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা। আর এই মন্দ বা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে মানুষ একে অপরের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ মনে করে। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى 'তোমরা আত্মপ্রশংসা কর না, তিনিই সর্বাধিক অবগত কে বেশী পরহেযগার' *(নাজম ৫৩/৩২)*।

ইহুদীদের আত্মপ্রশংসার নিন্দা করে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছেন। আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا 'তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা স্বীয় আত্মার পবিত্রতা প্রকাশ করে? বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন এবং তারা সূতা পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না' *(নিসা ৪/৪৯)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ-

'ইহুদী ও নাছারাগণ বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়ভাজন। তুমি বল, তবে তোমাদের পাপকর্মের দরুণ কেন তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়? বরং তাঁর সৃষ্টি মানুষের মত তোমরাও মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন' *(মায়েদাহ ৫/১৯)*। তাই মন্দ ধারণাযুক্ত বাকচতুরতা থেকে বিরত থেকে তার কুফল থেকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।

সুধারণার প্রশিক্ষণ দিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) : সামাজিক জীবনে আমাদের পারস্পরিক আন্তরিকতা বজায় রাখতে হবে। অযথা সন্দেহ পোষণ থেকে বিরত থাকতে হবে। অনুমান নির্ভর ও গুজবের উপর ভর করে সমাজে অঘটনের অনেক নযীর আছে। কথার সত্যতা যাচাই না করেই অন্যের বিরুদ্ধে বিষোদগার রচনার অপতৎপরতাও সমাজে কম নয়। মুসলমান হিসাবে আমাদের উচিত নিজেদেরকে মন্দ ধারণা থেকে পরহেয করে ঘটনার সত্যতা যাচাই করা। ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে, অটুট থাকবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ। অপর ভাই সম্পর্কে ভাল ধারণা তৈরী করার মানসে নবী করীম (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিলেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁর নিকটে অভিযোগ করল যে, আমার স্ত্রী কাল সন্তান প্রসব করেছে। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার কোন উট আছে কি? সে বলল, জী আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি রং সেগুলোর? সে বলল, সেগুলো লাল রংয়ের। তিনি বললেন, সেগুলোর মধ্যে কোন কাল বাচ্চা আছে কি? সে বলল, অবশ্যই আছে। তিনি বললেন, কালগুলো কোথা থেকে আসল? সে বলল, সম্ভবত পূর্ব বংশের কোন রগের ছোঁয়া লেগেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, لَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ 'সম্ভবত তোমার সন্তানও পূর্ববর্তী কোন বংশের ছোঁয়া পেয়েছে'।[২০৮]

এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মন্দ ধারণা পরিবর্তনে রাসূল (ছাঃ) ছিলেন উত্তম প্রশিক্ষক। ঐ ব্যক্তির ধারণা ছিল যে, তার স্ত্রী ব্যভিচারের শিকার হয়েছে এবং এ সন্তান তার ঔরসজাত সন্তান নয়। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে উন্নত মননের অধিকারী বানাতে সহায়তা করলেন।

ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আব্দুল্লাহ নামের এক ব্যক্তি ছিল, যাকে হিমার তথা গাধা উপাধিতে ডাকা হ'ত। সে আল্লাহর রাসূলকেও হাসাতে পারত। মদ্যপানের অভিযোগে রাসূল (ছাঃ) তাকে চাবুক মারার নির্দেশ দেন। একই অপরাধে অন্য একদিন আবারো তাকে উপস্থিত করা হ'ল। আবারো তাকে চাবুক মারার নির্দেশ প্রদান করা হ'ল। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ তার উপর লা'নত বর্ষণ কর। একই অপরাধে শাস্তির জন্য কতবার তাকে আনা হ'ল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, لاَ تَلْعَنُوهُ ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ 'তোমরা তাকে লা'নত দিও না। আল্লাহর কসম! আমি জানি যে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভলবাসে'।[২০৯]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ 'নিশ্চয়ই সুন্দর ধারণা সুন্দর ইবাদতের অংশ'।[২১০]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ 'তুমি যখন কাউকে বলতে শোন যে, সে বলল, লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেল, তবে জেনে রেখ সেই সর্বাধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত'।[২১১]

নেতিবাচক ধারণা ধ্বংসমুখী করে : মানুষের প্রতি নেতিবাচক ধারণা মানুষকে যেভাবে বিপথে পরিচালিত করে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

---

২০৭. *বুখারী হা/২৪৬৯; মুসলিম হা/১৯০*।

২০৮. বুখারী *হা/৬৮৪৭*।

২০৯. *বুখারী হা/৬৭৮০*।

২১০. *আহমাদ হা/ ৮১৭৬; আবুদাউদ হা/ ৪৯৯৩, সনদ হাসান*।

২১১. *মুসলিম হা/৬৭৭৬; আদাবুল মুফরাদ হা/৭৫৯*।

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا–

‘বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল (ছাঃ) ও মুমিনগণ তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে কিছুতেই ফিরে আসবে না। আর এ ধারণা তোমাদের জন্য খুবই সুখবর ছিল। তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে, আর তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী সম্প্রদায়’ *(ফাতহ ৪৮/১২)*। উল্লিখিত আয়াতটি হুদায়বিয়ার সন্ধির পরপরই নাযিল হয়। আরব বেদুইনদের কতিপয় লোক কুধারণা করেছিল যে, মক্কার কুরাইশ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে মুহাম্মাদ (ছাঃ) সদলবলে নিহত হবেন (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু তারা যখন দেখল যে তাঁরা ফিরে এসেছেন, তখন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার মিথ্যা অজুহাত পেশ করতে লাগল। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করে তাদের গোমর ফাঁস করে দেন।

মুমিনের ভিত্তি অপর মুমিনের উপর পূর্ণ সুধারণার উপরে গড়ে উঠবে। কথা বা কাজ উত্তম ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করবে। মন্দ ধারণার উপর ভিত্তি করে কত বন্ধুত্বে ফাটল ধরেছে,আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, ভাইয়ে ভাইয়ে খুনাখুনি হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এসবেরই মূল হ'ল নিছক ধারণা ও অনুমান। এই অন্যায় ধারণার কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই বিভ্রান্ত। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ‘তুমি যদি দুনিয়াবাসীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে। তারা নিছক ধারণা ও অনুমানেরই অনুসরণ করে, আর তারা ধারণা ও অনুমান ছাড়া কিছুই করছে না’ *(আন'আম ৬/১১৬)*। নেতিবাচক ধারণা ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বত্রই শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-কলহের সূত্রপাত ঘটায়।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে আল্লাহ কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন। তথ্যের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস না থাকলে অথবা তথ্যদাতা অমুসলিম বা ফাসেক-ফাজের হলে তাদের সংবাদ যাচাই করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ–

‘হে মুমিনগণ! কোন ফাসিক যদি তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ কোন সম্প্রদায়কে তোমরা কষ্ট না দাও অতঃপর তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত হয়ে যাও’ *(হুজুরাত ৪৯/৬)*।

রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে সর্বদা ভাল ধারণা পোষণ করতে বলতেন এবং মন্দ ধারণা থেকে সর্বদা নিরুৎসাহিত করতেন। কুধারণাকে পরিহার করার গভীর অনুশীলন করাতেন। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুবাইর ও মিক্বদাদ সহ আমাকে ‘রাওযাতু খাখ’ নামক স্থানে পাঠালেন। আর বললেন, সেখানে এক শিবিকারোহিনী রয়েছে, যার সাথে লিখিত একটি পত্র আছে। তোমরা তার কাছ থেকে সেটা নিয়ে নিবে। অতঃপর আমাদের ঘোড়াগুলো পরস্পর প্রতিযোগিতা করে ছুটল। আমরা মহিলার কাছে পৌঁছে বললাম, হে মহিলা পত্রটি বের কর! সে বলল, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, অবশ্যই তুমি পত্র বের কর অন্যথায় তোমার কাপড় খুলে চেক করা হবে। অতঃপর সে তার চুলের খোপার ভিতর থেকে চিঠিটি বের করল। আমরা সেটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হ'লাম। তাতে লেখা ছিল, ‘হাত্বেব ইবনে আবু বালতা'আর পক্ষ থেকে মক্কার মুশরিকদের প্রতি’। এতে তিনি তাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর কিছু কর্মকৌশলের সংবাদ পাচার করেছিলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘হে হাত্বেব! এটা কি’? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বিষয়ে ক্ষিপ্রতা অবলম্বন করবেন না। আমি কুরাইশদের ঘনিষ্ঠ ছিলাম। (সুফিয়ান বলেন, তিনি কুরাইশদের মিত্র ছিলেন, কিন্তু তাদের বংশীয় ছিলেন না। হাত্বেব অন্য ছাহাবার সাথে হিজরত করে মক্কায় চলে এসেছেন বটে, কিন্তু তার পরিবার মক্কায় তার আত্মীয়দের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।) আমি আমার আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নের আশংকা করলাম। তাই আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রেখে তাদেরকে হাত করার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। কুফরী বশত কখনো আমি এ কাজ করিনি এবং আমি আমার ধর্ম থেকে মুরতাদ হয়ে যাইনি। আর ইসলাম গ্রহণের পর কুফরীর উপর আমি সন্তুষ্ট নই। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, সে সত্য বলেছে। অন্যদিকে ওমর (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! এই মুনাফিকের ঘাড়ে তলোয়ার মারতে আমাকে সুযোগ করে দিন। রাসূল (ছাঃ) তখন বলেন, إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ‘নিশ্চয়ই হাত্বেব বদরী ছাহাবী, তুমি কি জান না আল্লাহ বদরী ছাহাবীদের প্রতি উঁকি দিয়ে দেখে বলেন, তোমরা যাচ্ছেতাই কর; আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম’। অতঃপর আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ

'হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ কর না। তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তার সাথে তারা কুফরী করেছে। তারা রাসূল (ছাঃ) ও তোমাদেরকে এ কারণেই বহিষ্কার করেছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাক তবে তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা কর। তোমরা যা গোপন কর বা প্রকাশ কর সে বিষয়ে আমি সম্যক অবগত' *(মুমতাহিনা ৬০/১)*। অপর বর্ণনা মতে, রাসূল (ছাঃ) আমাকে, যুবাইর, তালহা, মিক্বদাদ বিন আসওয়াদকে পাঠালেন।[২১২]

সুফিয়ান ইবনে হুসাইন বলেন, আমি ইয়াস ইবনু মু'আবিয়ার নিকট কোন এক লোকের বদনাম করলাম। তিনি আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, ভারতবর্ষ, তুর্কী, সিন্ধু প্রদেশের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ? আমি বললাম, জী না। তিনি বললেন, তোমার থেকে রোমান, সিন্ধু, তুর্কী, ভারতীয়রা নিরাপদে রইল, অথচ তোমার মুসলিম ভাই তোমার থেকে নিরাপদ নয়! তিনি বলেন, এরপর থেকে আর কখনো আমি এরূপ করিনি।[২১৩]

আবু হাত্বেব ইবনে হিব্বান আল বাসাতী (রহঃ) বলেন, জ্ঞানীদের উপর আবশ্যক হ'ল অপর মানুষের মন্দচারী থেকে নিজেকে পূর্ণভাবে মুক্ত রাখা, নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধনার্থে সর্বদা নিমগ্ন থাকা। যে ব্যক্তি অপরেরটা ত্যাগ করে নিজের ভুলত্রুটি সংশোধনে সদা ব্যস্ত থাকে, তার দেহ-মন শান্তিতে থাকে। আর যে অন্য মানুষ সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে, তার অন্তর মরে যায়, আত্মিক অশান্তি বেড়ে যায় এবং তার অন্যায় কর্মও বৃদ্ধি পায়।[২১৪]

রাসূল (ছাঃ) মানুষের দোষ ও ছিদ্রান্বেষণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি মানুষকে স্ব-স্ব দোষত্রুটি সংশোধনে আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহর কাছে যেসব কথাবার্তা-ধ্যানধারণার মূল্য নেই তা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيْمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِى بَيْتِهِ 'ওহে যারা মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে ঈমান এনেছ, অথচ এখনো অন্তঃকরণে ঈমান পৌঁছেনি! তোমরা মুসলিমদের নিন্দা কর না, তাদের ছিদ্রান্বেষণ কর না। কেননা যে ব্যক্তি অপরের দোষ খোঁজে আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আর আল্লাহ যার দোষ তালাশ করেন, তাকে তার নিজস্ব বাসগৃহেই অপদস্থ করেন'।[২১৫]

সমাপনী : পরিশেষে বলা যায় যে, সুধারণা পোষণ উন্নত চরিত্রের ভূষণ। অন্যের সম্পর্কে সুধারণার ফলে পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির অবসান পুরোপুরিভাবে সম্ভব। ফলে সমাজের দ্বন্দ্ব কলহ নিঃশেষ হয়ে সমাজের মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ অটুট হবে। দৃঢ় হবে সামাজিক মেলবন্ধনের সেতু। তাই অপর মুসলিম ভাই সম্পর্কে স্বচ্ছ, নিষ্কলুষ ধারণা রেখে আমরা সমাজে বসবাস করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে অপর মুসলিম সম্পর্কে সুধারণা পোষণের 'ক্বালবে সালীম' তথা সুস্থ অন্তঃকরণ দান করুন-আমীন!

২১২. *বুখারী হা/৩০০৭; মুসলিম হা/৬৪৮৫।*
২১৩. *বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১৩/১২১।*
২১৪. *রওয়াতুল উক্বালা পৃঃ ১৩১।*
২১৫. *আবুদাঊদ হা/৪৮৮০, আলবানী একে ছহীহ বলেছেন।*

মহিলা তা'লীম বৈঠক : সমাজ সংস্কারে ভূমিকা

শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন

ভূমিকা :

তা'লীমী বৈঠক দ্বীন চর্চার অন্যতম একটি মাধ্যম। এটি হ'তে পারে কোন মাহফিল-জালসা বা দ্বীন শিক্ষার কোন প্রশিক্ষণ সমাবেশ অথবা ঘরোয়া পরিবেশে পারিবারিক বৈঠক কিংবা মহিলা সমাবেশ। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে হ'লেও সবগুলোই মূলতঃ দ্বীন শিক্ষার আসর। মহিলা তা'লীমী বৈঠক বর্তমান সমাজে কম প্রচলিত ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে কম গুরুত্বের হ'লেও সমাজ সংস্কারে রয়েছে এর রয়েছে নীরব ভূমিকা।

দায়িত্বশীল আল্লাহভীরু নারীকে পরিবারের 'হৃদয়' বলা যেতে পারে। কোন ব্যক্তির ক্বলব বা হৃদয় ঠিক থাকলে যেমন তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড সুসংহত থাকে, তেমনি পরিবারে নারী তাক্বওয়াশীল হ'লে তার তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির মৃদু সমীরণ পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে শীতলতায় পরিতৃপ্ত করে। পরিবারের পুরুষ যত উচ্চমান আল্লাহভীরু হোক না কেন, সন্তানের ক্ষেত্রে পিতার আল্লাহভীরুতার উত্তাপ তাক্বওয়াহীন মায়ের সামনে শুকনো মড়মড়ে পাতার ন্যায় গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যায়। সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব এতটাই বেশী।

মা হ'লেন সন্তান গড়ার কারিগর আর পিতা তার সহায়ক শক্তি। এ বিবেচনায় মহিলা তা'লীমী বৈঠককে গুরুত্বহীন মনে করা যায় না। বরং পরিবারকে সুশৃংখল রাখতে এবং দ্বীনী ছাঁচে গড়ে তুলতে মহিলা তা'লীমী বৈঠকের গুরুত্ব অপরিসীম। সেকারণ তা'লীমী বৈঠকের প্রতি মহিলাদের উৎসাহিত করা, তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে সুযোগ করে দেওয়া ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা পুরুষেরও দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মহিলাদের তা'লীম :

রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেই সূচনা হয় মহিলা তা'লীমী বৈঠকের। মসজিদে নববীতে মহিলা ছাহাবীরা যদি পুরুষদের পাশাপাশি ছালাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই সেখানে তারা দ্বীন শিক্ষাও করতে পারতেন। কিন্তু দ্বীনী জ্ঞানের পিপাসা নিবারণের লক্ষ্যে তারা নিজেদের জন্য পৃথক একটি দিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট দাবী করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, قَالَت النِّسَاءُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَيْنِ 'নারীরা রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, (জ্ঞানের দিক দিয়ে) পুরুষরা আপনার কাছে অগ্রগামী হয়ে গেল। আপনি আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন। অতঃপর তিনি তাদেরকে নির্ধারণ করে দিলেন। তারা সমবেত হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে উপদেশ দিলেন, শিক্ষাদান করলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান হবে তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে। একজন জিজ্ঞেস করল, দু'টি হ'লে? রাসূল (ছাঃ) বলেন, দু'টি হ'লেও'।[২১৬]

অত্র হাদীছে কয়েকটি বিষয় ফুটে ওঠেছে। ১. নারীর শিক্ষা গ্রহণের অধিকার শরী'আত স্বীকৃত ২. নারী তার প্রয়োজন নির্দ্বিধায় পেশ করতে পারে ৩. নারী অধিক সুবিধার প্রয়োজনে তার ক্ষেত্রকে পৃথক করতে পারে। সুতরাং বর্তমান সময়েও নারী সমাজ মহিলা তা'লীমী বৈঠকের আয়োজন করে এবং তাতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

নারী সমাজে দাওয়াতের হালচাল :

দাওয়াতের ময়দানে বাতিলপন্থীদের থাবা সুবিস্তৃত। উপযুক্ত দাঈ ছাড়া দ্বীনের স্বচ্ছ অনুসারী বানানো অসম্ভব। অথচ সমাজে এক শ্রেণীর দাঈ গোচরীভূত হয়, যারা ইলমের জগতে একেবারেই আনাড়ি। তারা ইসলামের মূল বিষয়াদির তেমন কিছুই সঠিকভাবে জানে না। তাওহীদ-শিরক, সুন্নাত-বিদ'আতের স্বচ্ছ জ্ঞান তাদের নেই। নেই জাল ও যঈফ হাদীছ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা। তাদের অজ্ঞতা রয়েছে হিজাব সম্পর্কে, নারীর ঘর থেকে বের হওয়ার নিয়ম-কানুনে। অথচ তারা দ্বীনের দাঈ! আমরা এসব অজানাকে সমালোচনা করি না। সমালোচনা করে কারো জ্ঞানের দরজায় করাঘাত করা গেলেও এটি শোভনীয় নয়। সমালোচনা করতে হয় তখন যখন এসব অজানা মানুষগুলো মানুষের দুয়ারে গিয়ে নিজেকে দ্বীনের মস্তবড় দাঈ হিসাবে দাবী করেন এবং ভুল দ্বীন শিক্ষা দিয়ে অবলা-সরলা মা-বোনদের বিভ্রান্ত করেন। এপ্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) যথার্থই বলেছেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا– 'আল্লাহ বান্দার অন্তর থেকে ইলম টেনে বের করে ইলম উঠিয়ে নিবেন না। বরং আলেমগণকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে যখন কোন আলেমই বাকী থাকবেন না তখন লোকেরা অজ্ঞ লোকেদেরকে তাদের নেতা বানিয়ে নিবে। তারা ইলম (জানা) ছাড়াই (মনগড়া) ফৎওয়া দিবে। ফলে নিজেরা গোমরাহ হবে এবং অপরকেও গোমরাহ করবে'।[২১৭]

এসব দা'ঈদের সংখ্যাধিক্যের কারণে ইসলামের খাঁটি রূপে দেখা দিয়েছে নানান বিকৃতি। গ্রাম-গঞ্জে দেখা যায়, মহিলা বক্তা

** সহকারী শিক্ষিকা, মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

২১৬. বুখারী হা/১০১; আহমাদ হা/১১৩১৪; 'ইলম' অধ্যায়, 'নারীদের জন্য কি একটি দিন নির্ধারণ করা হয়েছিল'? অনুচ্ছেদ।
২১৭. বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩; মিশকাত হা/২০৬।

আসার ঘোষণা দিয়ে পাথেয় দেয়ার জন্য চাঁদা তোলা হয়। দা'ঈ নারীরা এসে গ্রামের সহজ-সরল মা-বোনদেরকে ইসলামের নামে যে উদ্ভট শিক্ষা দিয়ে যান, ছহীহ হাদীছের কষ্টি পাথরে হাযারো ঘর্ষণের পরও সে ভুল শিক্ষা মুছে যেতে চায় না।

অনেক মহিলা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার কাজ করে থাকেন। তাদের কেউ বিশুদ্ধ কুরআন পাঠ করতে পারেন, আবার কেউ পারেন না। তারা সাধারণ মহিলাদের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হন। অনেক ক্ষেত্রে তারা সঠিক সমাধান না জেনেও সমাধান দিয়ে ফেলেন। আর এভাবে দ্বীন বিকৃত হয়। একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কুরআন শিক্ষা দেওয়া ও মাসআলার জবাব দেওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি বিষয়। মাসআলায় পারদর্শী হ'লে তবে তার নিকট থেকে জবাব নেওয়া যাবে, অন্যথায় নয়।

অনেকে আবার সাজগোজ করেন, মোহনীয় ভঙ্গি অবলম্বন ও সুন্দর উচ্চারণভঙ্গি ব্যবহার করে থাকেন দ্বীনের পথে ডাকার মাধ্যম হিসাবে। তাদের যুক্তি, তাদের স্মার্টনেস, অবস্থান ও ফ্যাশনেবল উপস্থিতির কারণে সমাজের ধনিক শ্রেণী ও আধুনিকমনা মানুষ দ্বীনকে সহজেই গ্রহণ করবে।

মূলতঃ এগুলো দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি নয়। মহিলারা নিজ এলাকা ছেড়ে পুরুষদের ন্যায় দেশ-বিদেশে ঘুরে দাওয়াত দিবে এটিও ইসলামের দাবী নয়। বরং তারা নিজ নিজ পাড়া-মহল্লার মধ্যেই দাওয়াতের ক্ষেত্র তৈরী করবেন। তবে মনে রাখতে হবে যিনি মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবেন তার মধ্যে দাঈর গুণাবলীর ঘাটতি থাকলে তার দাওয়াতের ফল সুদূর প্রসারী হবে না। একজন দাঈর আবশ্যিক প্রথমগুণ হ'ল- তাক্বওয়া বা আল্লাহ্র ভয়। দ্বিতীয় গুণ হ'ল যোগ্যতা। এই দ্বিবিধ গুণের সমন্বয় ঘটলে তার দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের আশা করা যায়। শুধুমাত্র তাক্বওয়া দিয়ে আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন হ'তে পারলেও যেমন দাঈ হওয়া যায় না, তেমনি শুধু যোগ্যতা দিয়ে জ্ঞানী হওয়া গেলেও সফল দাঈ হওয়া যায় না।

বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রদর্শন কিংবা অতি সাদামাটা ভাব প্রকাশ কোনটিই দ্বীনের পথে আহ্বানের মাধ্যম নয়। সুন্দর পোষাক ব্যবহারে অনুমতির যেমন স্পষ্ট হাদীছ রয়েছে, তেমন বিলাসিতা পরিহারের স্পষ্ট দলীল রয়েছে। ব্যক্তি তার স্বভাব, রুচিবোধ, সামর্থ্য ও তাক্বওয়ার ভিত্তিতে পোষাক পরবে। বাহ্যিক প্রদর্শনী দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে নয়। দাওয়াতে একনিষ্ঠতা, আল্লাহভীতি, যোগ্যতা, পরিস্থিতি অনুযায়ী কথা বলার ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তার সাথে মাসআলা-মাসায়েলের ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাধান, ব্যক্তিগত গাম্ভীর্য প্রভৃতির মাধ্যমে একজন সফল দাঈ হওয়া যায়। অতএব বাতিলপন্থী দাঈদের বিপরীতে ছহীহ আক্বীদা ও আমল ভিত্তিক হকপন্থী মা-বোনদের কালবিলম্ব না করে স্ব স্ব পরিবারে, সমাজে নিয়মিত বৈঠক চালু করা সময়ের অনিবার্য দাবী।

তা'লীমী বৈঠক পরিচালনার পদ্ধতি :

নিয়মিত বৈঠককে প্রাণবন্ত রাখার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ যরূরী। বৈঠকে উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে বৈঠক পরিচালিত হবে। উপস্থিত সদস্যের বয়স, মেধা ও আগ্রহের উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। নিম্নোক্তভাবে বৈঠক পরিচালনা করা যেতে পারে।-

কুরআন শিক্ষার জন্য একটি বোর্ড থাকবে। যাতে মাদ্দ-মাখরাজের চর্চা সহজে করা যায়। বোর্ডে প্রয়োজনীয় অংশ লিখে বুঝিয়ে দিবেন। মাখরাজের ভিন্নতায় কিভাবে অর্থের বিকৃতি ঘটে উদাহরণের মাধ্যমে (যেমন- قُلْ 'তুমি বল', كُلْ 'তুমি খাও' عَلِيْمٌ 'মহাজ্ঞানী', أَلِيْمٌ 'যন্ত্রণাদায়ক') ফুটিয়ে তুলবেন।

তাজবীদ কঠিন নিয়মে মুখস্থ না করিয়ে উদাহরণের মাধ্যমে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে অতঃপর নিয়ম মুখস্থ করাবেন। কুরআন শিক্ষার সাথে সাথে নিয়মিত দো'আ শিখাবেন। তাদের মধ্যকার আচরণ-আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের সুন্নাত শিক্ষা দিবেন। যেমন- কেউ হাই তুলল কিন্তু মুখে হাত দিল না, তখন নিয়মিত পাঠ শেষে সুন্দর করে হাই তোলার সুন্নাতী তরীকা বুঝিয়ে দিবেন। তাছাড়া বিশুদ্ধ ছালাত শিক্ষার বাস্তব প্রশিক্ষণ, তাফসীরুল কুরআন, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), নবীদের কাহিনী ও অন্যান্য ছহীহ বইয়ের উপর ধারাবাহিক আলোচনা এবং বিভিন্ন উপলক্ষে বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য থাকবে। বৈঠক সোনামণি বৈঠক হ'লে তাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য মাঝে-মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং হালকা পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বৈঠকের সমাপ্তিকালে সুন্নাতী তরীকায় বৈঠক শেষের দো'আ পড়ে বৈঠক শেষ হবে। মোটকথা উপস্থিত শিক্ষার্থীদের পরিবেশ বুঝে বৈঠকটি সজীব রাখার স্বার্থে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। বৈঠকের দায়িত্বশীলকে লক্ষ্য রাখতে হবে, কোনক্রমে যেন এটা শিক্ষার্থীর কাছে একঘেঁয়ে না হয়ে যায়। নিজের সুযোগ, তাদের আগ্রহ মেধা ও মনোযোগ পর্যবেক্ষণ করে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করলে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

মহিলা তা'লীমী বৈঠকের ভূমিকা :

সমাজ সংস্কারে মহিলা তা'লীমী বৈঠকের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। কোন পরিবারে মায়ের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে সচেতন অনুভূতি থাকার অর্থ হ'ল সে ঘরটি দ্বীনের একটি অনুশীলন ঘর। আর এ অর্জনটি হওয়া সম্ভব মহিলা তা'লীমী বৈঠকে নিয়মিত যোগদানের মাধ্যমে। কোন মা-বোন যদি তা'লীমী বৈঠকের সংস্পর্শে এসে দ্বীন মেনে নেন এবং পরিবর্তনের পথে এগিয়ে আসেন, তবে পরিবার ও সমাজ নিম্নোক্ত উপকার তার নিকট থেকে পেতে পারে।

১. দাম্পত্য জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য : স্ত্রী ভীতি বিবাহিত পুরুষদের একটি কমন ফোবিয়া বা আতঙ্কের নাম। কার নেই স্ত্রীভীতি? কি বারাক ওবামা, কি বিল ক্লিন্টন আর কি সাকিব আল-হাসান- মগজের ভীতি অংশের হিটলিষ্টে রয়েছে নিজ নিজ স্ত্রীদের নাম। পোশাকের মান-মূল্য, বাজার-ঘাট, সম্পদ

অর্জন, ব্যয়-বণ্টন এমনকি স্বামী বেচারার হাঁটাচলাও রয়েছে স্ত্রীর আধিপত্য। একান্তই স্ত্রীর মনোবৃত্তির অনুগত হয়ে তাকে মেনে নিতে হয় সব। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَنْظُرُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ ‘আল্লাহ ঐ নারীর দিকে করুণার দৃষ্টি দেন না যে স্বামীর শুকরিয়া আদায় করে না এবং নিজের জন্য স্বামীকে পরিপূর্ণ মনে করে না’।[২১৮] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ‘কোন স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল ছিয়াম পালন করা বৈধ নয় এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে অনুমতি দেয়া জায়েয নয়’।[২১৯]

এছাড়াও আরো অনেক হাদীছ রয়েছে যেগুলোতে পুরুষ জাতির মর্যাদা ও সম্মানকে স্পষ্ট করা হয়েছে। অনুরূপভাবে নারীর মর্যাদা সম্পর্কেও বহু হাদীছ এসেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا ‘তোমাদের মধ্যে পূর্ণতর মুমিন সে, যে আচরণে ভাল। আর তোমাদের মধ্যে উত্তম সে, যে তার স্ত্রীর নিকটে উত্তম’।[২২০] অর্থাৎ স্ব স্ব স্থানে সবারই একটা মর্যাদা রয়েছে। রয়েছে নিজস্ব একটা ক্ষমতা। যাতে কোন মানুষই নিজেকে তুচ্ছ-হীন মনে না করে। এভাবে যখন স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক মর্যাদা ও অধিকারের কথা জানতে পারবে, তা অবশ্যই তাদের দাম্পত্য জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করবে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হ’ল শ্রদ্ধামিশ্রিত, ভালবাসাপূর্ণ। তারা একে অপরের অকৃত্রিম বন্ধু। জীবনে চলার পথে বন্ধুত্বের গতি কখনোবা মন্থর হ’তেও পারে। তাই বলে দাম্পত্য কলহ স্থায়ী হ’তে পারে না। স্ত্রীর মেজায যখন খড়খড়ে হয়ে যায়, তখন স্বামী কি একটু চুপ থাকতে পারেন না? স্ত্রী যদি আপনার সাথে অভিমান না করে, তবে তার অভিমান দেখানোর জায়গা কোথায়? এজন্য তাকেও দু’চার কথা বলার সুযোগ দিন। আর স্ত্রীকেও মনে রাখতে হবে, স্বামীর মর্যাদা তার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। সঙ্গত কারণে তার দায়িত্বপূর্ণ ও যৌক্তিক কথা মেনে নিতে হবে। নতুবা পরিবারে শৃংখলার ব্যত্যয় ঘটবে। হালে নারীরা স্বামীদেরকে তাদের ‘অধীনস্ত’ কিছু একটা মনে করতে শুরু করেছে। যা সম্পূর্ণ অন্যায় ও অযৌক্তিক। যে স্ত্রীর মধ্যে দ্বীনের সামান্যতম জ্ঞান থাকে তার দ্বারা এই অন্যায় ধারণা আদৌ সম্ভব নয়। অতএব স্বামী-স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপনে তা’লীমী বৈঠক যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। নিয়মিত বৈঠকে যোগদান এবং কুরআন-হাদীছের আলোচনা শ্রবণে স্ত্রীর মনোজগতে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে পারে। দু’দিন আগের স্বামী বিদ্বেষী স্ত্রী পরিণত হ’তে পারে চরম স্বামীভক্ত স্ত্রীতে। হাছিল করতে পারেন অনন্ত সুখের চিরন্তন স্থান জান্নাত।

২. সন্তান প্রতিপালন : সন্তানের জন্য মায়ের উষ্ণ কোলের যেরূপ তুলনা নেই, তেমন মাতৃশিক্ষার সমতুল্য আর কিছু নেই। ‘গোবরে পদ্মফুল’ ফুটে গেলেও পদ্মের গায়ে গোবরের নির্যাস লেগে থাকে। এজন্য আমরা দেখে থাকি, ছোট ঘর থেকে ওঠে আসা বড় মানুষগুলোর মধ্যে ‘পারিবারিক লোগো’ টাইপের কিছু বৈশিষ্ট্য থেকেই যায়। যে বাচ্চা মায়ের কাছে ইলম-আদবের ছবক পায়, সে বড়ই ভাগ্যবান। কারণ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে সে শৈশবের সেই আদবের অনুশীলন তীব্রভাবে অনুভব করে নিজের মধ্যে। ছোটবেলায় যারা মা শিক্ষকের শিক্ষা লাভ করতে পারেননি, তারা নিজের প্রতি লক্ষ্য করুন! আত্মিক পশুত্বকে দূর করতে নিজের সাথে কতটা কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে! সুতরাং ইসলামী মূল্যবোধের পরিবার গড়তে সৎকর্ম পরায়ণ মায়ের বড়ই প্রয়োজন রয়েছে। আর সৎকর্মপরায়ণ মা গঠনে নিয়মিত তা’লীমী বৈঠকে অংশগ্রহণ আবশ্যক।

৩. প্রতিবেশীর অধিকার : প্রতিবেশীর ফিৎনা প্রতিটি সমাজেই রয়েছে। প্রতিবেশীর যন্ত্রণা যে কত দুঃসহ তা শুধু ভুক্তভোগীই বুঝে। কারো জন্য পরিস্থিতি কখনো কখনো এতটাই জটিল হয়ে যায় যে, ভিটা-মাটি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যায়। অথচ ইসলাম প্রতিবেশীকে দিয়েছে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের এক গুরু দায়িত্ব। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ ‘আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম সাথী সে, যে তার সাথীর নিকটে উত্তম। আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম সে, যে তার প্রতিবেশীর নিকটে উত্তম’।[২২১]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ ‘কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীর দেয়ালে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে’। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ ‘তোমাদের কি হ’ল? আমি তোমাদেরকে এই বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এই বিধান তোমাদের ঘাড়ের উপর ফেলব (অর্থাৎ তোমাদেরকে এ বিধান পালনে বাধ্য করব)’।[২২২]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ ‘হে আবূ যার!

২১৮. *হাকেম হা/২৭৭১, ছহীহ।*
২১৯. *মুসলিম হা/১০২৬; মিশকাত হা/২০৩১।*
২২০. *তিরমিযী হা/১১৬২; মিশকাত হা/৩২৬৪।*
২২১. *তিরমিযী হা/১৯৪৪, সনদ হাসান।*
২২২. বুখারী হা/২৪৬৩; মুসলিম হা/১৬০৯; মিশকাত হা/২৯৬৪।

তুমি যখন ঝোল রাঁধ, তাতে পানি বাড়িয়ে দাও এবং তোমার প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখ'।[২২৩] রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ 'জিবরীল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এমনভাবে উপদেশ করতে থাকেন যে, অবশেষে আমার মনে হ'ল, তিনি প্রতিবেশীকে আমার ওয়ারিছ (সম্পদের ভাগীদার) বানিয়ে দিবেন'।[২২৪]

উল্লিখিত হাদীছগুলোতে প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্কের একটা পরিধি ফুটে ওঠেছে। এক সমাজে চলতে গেলে কখনো কখনো মনোমালিন্য হয়ে গেলেও, এটাকে গেঁথে না রেখে পূর্ব সম্পর্কে ফিরে আসার দ্রুত চেষ্টা করতে হবে। তার অন্যায় প্রতিরোধ করতে তাকে বাড়িতে ডেকে এনে গল্পচ্ছলে সদুপদেশ দিতে হবে। সে উপদেশ গ্রহণ না করলেও তার মন্দ আচরণ ও যুলূম প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আর এ মহতী কাজে নারীর ভূমিকা অনেকাংশেই বেশী।

মহিলা তা'লীমী বৈঠক একজন নারীকে তার প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের বাস্তব ভিত্তিক শিক্ষা দিতে পারে। যে শিক্ষা লাভ করে সে এমনই সদাচারী ও সহমর্মী হবে যে, তার দ্বারা প্রতিবেশীর সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সুন্দরতম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে।

৪. ফকীর-মিসকীনের সাথে আচরণ : সমাজে সবচেয়ে অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্র ফকীর-মিসকীন। সর্বনিম্ন শ্রেণীর এই মানুষগুলোর তাচ্ছিল্যের কারণ অবশ্য ব্যবসায়ী, মিথ্যুক ও শঠ ভিক্ষুকেরা। তারা প্রকৃত ফকীরদের কষ্টে ফেলেছে। এজন্য ব্যবসায়ী ফকীরদের থেকে কৌশলে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আপনি তাকে ঠুনকো কাজে দিন নির্ধারণ করে জোরালোভাবে চুক্তিবদ্ধ করুন, দেখবেন সে পরের দিন আপনার পাশের দরজায় কড়া নাড়লেও আর আপনার দরজায় আসবে না। তাদেরকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তবে কোনভাবেই আচরণ মন্দ করা যাবে না। অথচ প্রকৃত ভিক্ষুকের কথা সমাজের কেউ ভাবে না। কত যন্ত্রণাময় ও বেদনাকাতর তাদের জীবনকাহিনী তা জানার প্রয়োজনটুকুও আমরা মনে করি না। এমন হতভাগ্য জীবন তাদের, মানব সমাজে তারা কাজের লোকের সাথেও দাঁড়াতে পারে না। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ، يَشُكُّ الْقَعْنَبِىُّ كَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ 'বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করার চেষ্টায় রত ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা তিনি একথাও বলেন, সে ঐ নফল ছালাত আদায়কারীর ন্যায়, যে ক্লান্ত হয় না এবং ঐ ছিয়ামপালনকারীর ন্যায় যে ছিয়াম ছাড়ে না'।[২২৫] অন্যত্র তিনি বলেন, شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার ঐ ওয়ালীমার খাবার, সেখানে যে আসে (অর্থাৎ গরীব) তাকে বাধা দেয়া হয় এবং যাকে দাওয়াত দেয়া হয় (অর্থাৎ ধনী), সে আসতে অস্বীকার করে। আর যে দাওয়াত কবুল করে না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধিতা করল'।[২২৬]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওয়ালীমার খাবার হ'ল যাতে ধনীদেরকে দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদেরকে বর্জন করা হয়'।[২২৭] দুর্ভাগ্য আমাদের স্বভাব হচ্ছে, বাসায় সাধারণ কেউ আসলে খালি মুখে বিদায় দেই। আর মান সম্পন্ন কেউ আসলে যারপর নাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। একেই বলে 'তেলা মাথায় তেল দেয়া'। আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া উচিত। মানীর মান তো রাখতেই হয়। সেই সাথে দরিদ্র মেহমানদের জন্যও আমাদের হৃদয় কোণে মেহমানদারীর এক চিলতে দায়িত্ব থাকা সুন্নাতের দাবী। নিয়মিত তা'লীমী বৈঠকে যোগদান ও দ্বীনী পরিবেশে থাকার মাধ্যমে এই মন্দ স্বভাবের পরিবর্তন হওয়া সম্ভব।

৫. সদাচরণ : সদাচরণ মানব চরিত্রের এক অমূল্য অর্জন। সদাচরণ এমন একটি গুণ যাতে লুকিয়ে আছে ধৈর্য, বিনয়-নম্রতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখা, প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা, পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও সমাজ চালানোর যোগ্যতা, সর্বোপরি আত্মিক মযবুতির বড় উপকরণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোমল। তিনি কোমলতাকে ভালবাসেন। কোমলতার উপর তিনি যা দেন, কঠোরতা ও অন্য জিনিসের উপর তা দেন না'।[২২৮]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক বেদুঈন মসজিদের ভিতর প্রস্রাব করে দিলে লোকেরা তাকে ধমকানোর জন্য উঠে দাঁড়াল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ তোমাদেরকে সহজ নীতি অবলম্বনের জন্য পাঠানো হয়েছে। কঠোর নীতি অবলম্বনের জন্য নয়'।[২২৯] লোকটি এখানে কয়েকটি অন্যায় করেছে- ১. নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়েছে, ২. মসজিদ অপবিত্র করেছে, ৩. রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে চরম বেয়াদবী করেছে, ৪. সমাজ বহির্ভূত কাজ করেছে ইত্যাদি। এক কথায়, সে

২২৩. *মুসলিম হা/২৬২৫।*
২২৪. বুখারী হা/৬০১৫; মুসলিম হা/২৬২৪; মিশকাত হা/৪৯৬৪।
২২৫. বুখারী হা/৬০০৭; মুসলিম হা/২৯৮২; মিশকাত হা/৪৯৫১।
২২৬. বুখারী হা/৫১৭৭; মুসলিম হা/১৪৩২; মিশকাত হা/৩২১৮।
২২৭. *বুখারী হা/৫১৭৭।*
২২৮. *মুসলিম হা/২৫৯৩।*
২২৯. *বুখারী হা/২২০।*

Contents

তার উক্ত কাজে সকলকে হতভম্ব করে দিয়েছে। অথচ এরপরেও সৃষ্টির সর্বসেরা মানুষ (রাসূল (ছাঃ), তাতে সহজ নীতি অবলম্বন করার পরামর্শ দিলেন। কত সুমহান সদাচরণ! কত উন্নত শিক্ষা! হাদীছের শিক্ষা কত অসীম, ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

আমরা যারা ঠুনকো ব্যাপার নিয়ে নিজেদেরকে সামলে রাখতে পারি না, তাদের কাছে এই হাদীছ কি কোন আবেদন তৈরী করতে পারছে না? বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে বড় একটি ব্যাপারকে হজম করে ফেলার ও সেটি এড়িয়ে যাওয়ার শিক্ষা পাওয়া যায় অত্র হাদীছে। নিজের দিকে ভাবলে একটু কেমন লাগে? যদি আমাদের সামনে অনুরূপ ঘটনা ঘটে যেত, তবে শত ভদ্রতার মাঝেও হয়ত মুখ দিয়ে বের হয়েই যেত, ছি! কত বেশরম! আফসোস! এই শিক্ষা যে মহান শিক্ষক দিলেন, তাঁকে আজ জাতির একশ্রেণীর শিক্ষিত মূর্খ 'যুদ্ধবাজ' বলছে। তাঁকে ব্যঙ্গ করছে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে, উপহাস করছে। ধিক, শত ধিক! তাদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।

ইসলাম মানুষের বিবেককে ভালোর মাধ্যমে জাগিয়ে তোলার শিক্ষা দেয়। যেহেতু নারীর হাতে পরিবারের পরিচালনার ভার রয়েছে, সেহেতু নারী নিজে উত্তম আচরণের শিক্ষা রপ্ত করে পরিবারের সদস্যদের সেই আবেশে গড়ে তুলবেন। এজন্যই মহিলাদের দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করা অতীব যরূরী। আর এক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে 'তা'লীমী বৈঠক'।

তা'লীমী বৈঠক বাস্তবায়নে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ভূমিকা :

নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এ দেশের অনন্য দ্বীনী সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চারটি স্তরে সমাজে দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। শিশু-কিশোরদের মধ্যে 'সোনামণি' সংগঠন, ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ', বয়স্কদের মধ্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং মা-বোনদের জন্য 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'। সমাজ সংস্কারে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াতী পদ্ধতির অন্যতম হচ্ছে 'সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক'। এটি অত্র সংগঠনের অধীনস্ত সকল শাখা-এলাকার প্রতি সাংগঠনিক নির্দেশ। সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে মহল্লার মসজিদে বা বিশেষ কোন স্থানে নির্ধারিত সময়ের জন্য এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত মুছল্লীগণ এর মাধ্যমে দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় এবং বিশুদ্ধ ইবাদত, দো'আ-কালাম ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করেন। অনরূপভাবে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র উদ্যোগেও 'মহিলা তা'লীমী বৈঠক' হয়ে থাকে। মহল্লার অবলা-সরলা শিক্ষিত-অশিক্ষিত মহিলারা উক্ত বৈঠকে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা লাভ করে নিজ পরিবারে এর বাস্তব অনুশীলন করেন। কাজেই যোগ্য নারীদের উচিত মা-বোনদের মধ্যে সঠিক দ্বীন প্রচারের স্বার্থে নিজ নিজ পাড়া-মহল্লায় নিরাপদ পরিবেশে মহিলা তা'লীমী বৈঠকের আয়োজন করা। আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই একটি নির্দেশ যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি তাহ'লে সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন অশান্ত সমাজে শান্তি ফিরে আসবে, পারিবারিক কলহ, কুসংস্কার চিরতরে বিদূরিত হয়ে এক একটি পরিবার জান্নাতী পরিবারে পরিণত হবে।

সমাপনী :

পরিবারের সদস্যরা সেভাবেই গড়ে ওঠে মা যেভাবে গড়ে তুলেন। এ নীতিতে বিশ্বাস করলে নারীকে দ্বীন শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা করা সুবিবেকের কাজ। সমাজের স্থিতিশীলতার স্বার্থে নারীকে দ্বীন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। তাকে দ্বীনের বড়-ছোট নানাবিধ মাসআলা, বিধি-বিধান জানতে হবে। দুর্ভাগ্য আজ অবস্থা এমন হয়েছে যে, কোন কাজ ইসলামী পদ্ধতিতে করার অর্থই হ'ল সেকেলে। নারীরা নিজেকে সস্তা বানাতে বানাতে এমন পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে যে, তারা যেন ঝুড়ির তলায় থাকা উচ্ছিষ্ট পণ্য। সমঅধিকারের জন্য চিৎকার করতে করতে আজ যেন তারা নিঃস্ব। আমরা কি এমন স্বপ্ন দেখতে পারি না যে, প্রতিটি পাড়ায় একটি মহিলা তালীমী বৈঠক হবে? সেই বৈঠকের নরম-কোমল আলোয় ঝলমলে হবে পাড়া থেকে পাড়ান্তর। বদলে যেতে থাকবে মানুষের জীবনচিত্র। পরিবর্তন আসবে পোশাকে, আমল-আক্বীদায়। পাল্টে যেতে থাকবে জীবন পদ্ধতি। দূরীভূত হবে আঁধার। মহান আল্লাহ আমাদের কবুল করুন-আমীন!

হাদীছের গল্প

ইবাদত পালনে আবুবকর (রাঃ)-এর ত্যাগ ও রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরত

ইয়াহ্ইয়া ইবনু বুকায়র (রহঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার মাতাপিতাকে কখনো ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন পালন করতে দেখিনি এবং এমন কোন দিন অতিবাহিত হয়নি যেদিন সকালে কিংবা সন্ধ্যায় রাসূল (ছাঃ) আমাদের বাড়ীতে আসেননি। যখন মুসলমানগণ (মুশরিকদের নির্যাতনে) অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, তখন আবুবকর (রাঃ) হিজরত করে আবিসিনিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হ'লেন। অবশেষে 'বারকুল গিমাদ' নামক স্থানে পৌঁছলে ইবনু দাগিনার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সে ছিল তার গোত্রের নেতা। সে বলল, হে আবুবকর! কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমার স্ব-জাতি আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি মনে করছি পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব এবং আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। ইবনু দাগিনা বলল, হে আবুবকর (রাঃ)! আপনার মত ব্যক্তি (দেশ থেকে) বের হ'তে পারে না। আপনি তো নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করে দেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমদের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানদের মেহমানদারী করে থাকেন এবং সত্য পথের পথিকদের বিপদ-আপদে সাহায্য করেন। সুতরাং আমি আপনাকে আশ্রয় দিচ্ছি, আপনাকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতার অঙ্গীকার করছি। আপনি ফিরে যান এবং নিজ শহরে আপনার রবের ইবাদত করুন। আবুবকর (রাঃ) ফিরে আসলেন। তাঁর সঙ্গে ইবনু দাগিনাও আসল। ইবনু দাগিনা বিকেল বেলা কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট গেল এবং তাদের বলল, আবুবকরের মত লোক দেশ থেকে বের হ'তে পারে না এবং তাকে বের করে দেওয়া যায় না। আপনারা কি এমন ব্যক্তিকে বের করবেন, যিনি নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমদের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং ন্যায়ের উপর থাকার দরুণ বিপদ এলে সাহায্য করেন। ইবনু দাগিনার আশ্রয়দান কুরাইশরা মেনে নিল এবং তারা ইবনু দাগিনাকে বলল, তুমি আবুবকরকে বলে দাও, তিনি যেন ঘরের মধ্যে তাঁর রবের ইবাদত করেন। ছালাত সেখানে আদায় করেন ও ইচ্ছামাফিক কুরআন তিলাওয়াত করেন। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের যেন তিনি কষ্ট না দেন। এসব যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেননা আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের ফিৎনায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। ইবনু দাগিনা আবুবকর (রাঃ)-কে এসব কথা বলে দিলেন। সে মতে কিছুদিন আবুবকর (রাঃ) নিজের ঘরে ইবাদত করতে লাগলেন। তিনি প্রকাশ্যে ছালাত আদায় করতেন না এবং ঘরেই কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এরপর আবুবকর (রাঃ)-এর মনে (একটি মসজিদ নির্মাণের কথা) উদিত হ'ল। তাই তিনি তাঁর ঘরের পাশেই একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন। সেখানে তিনি ছালাত আদায় করতেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন। ফলে তাঁর কাছে মুশরিক মহিলা ও যুবকরা ভীড় জমাতে লাগল। তারা আবুবকর (রাঃ)-এর এ কাজে বিস্মিত হ'ত এবং তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। আবুবকর (রাঃ) ছিলেন একজন ক্রন্দনশীল ব্যক্তি, তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন তাঁর চোখের অশ্রু ধরে রাখতে পারতেন না। এ ব্যাপারটি কুরাইশ নেতৃস্থানীয়দের আতঙ্কিত করে তুলল। তারা ইবনু দাগিনাকে ডেকে পাঠাল এবং বলল, তোমার আশ্রয় প্রদানের কারণে আমরাও আবুবকরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এই শর্তে যে, তিনি তাঁর রবের ইবাদত তাঁর ঘরে করবেন। কিন্তু সে শর্ত তিনি লংঘন করেছেন। আমাদের ভয় হচ্ছে, আমাদের নারী ও সন্তানরা ফিৎনায় পড়ে যাবে। কাজেই তুমি তাঁকে নিষেধ করে দাও। তিনি তাঁর রবের ইবাদত তাঁর গৃহে সীমাবদ্ধ রাখতে পসন্দ করলে তা করতে পারেন। আর যদি তিনি তা অস্বীকার করে প্রকাশ্যে করতে চান তবে তাঁকে তোমার আশ্রয় প্রদান ও দায়-দায়িত্বকে প্রত্যার্পণ করতে বল। আমরা তোমার আশ্রয় প্রদানের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করাকে অত্যন্ত অপসন্দ করি, আবার আবুবকরকেও এভাবে প্রকাশ্যে ইবাদত করার জন্য ছেড়ে দিতে পারি না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইবনু দাগিনা এসে আবুবকর (রাঃ)-কে বলল, আপনি অবশ্যই জানেন যে, কোন্ শর্তে আমি আপনার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলাম। আপনি হয় তাতে সীমিত থাকবেন, অন্যথা আমার যিম্মাদারী আমাকে ফেরৎ দিবেন। আমি এ কথা আদৌ পসন্দ করি না যে, আমার সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং আমার আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ আরববাসীর নিকট প্রকাশিত হোক। আবুবকর (রাঃ) তাকে বললেন, আমি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার আল্লাহ্‌র আশ্রয়ের উপরই সন্তুষ্ট আছি। এসময় নবী করীম (ছাঃ) মক্কায় ছিলেন। তিনি মুসলমানদের বললেন, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান (স্বপ্নে) দেখানো হয়েছে। সে স্থানে খেজুর বাগান রয়েছে এবং তা দু'টি প্রস্তরময় প্রান্তরে অবস্থিত। এরপর যারা আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন, তাদেরও অধিকাংশ সেখান থেকে ফিরে মদীনার চলে আসলেন। আবুবকর (রাঃ)ও মদীনায় দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর। আশা করছি আমাকেও অনুমতি দেওয়া হবে। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনিও কি হিজরতের আশা করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সাহচর্য লাভের জন্য নিজেকে হিজরত থেকে বিরত রাখলেন এবং তাঁর নিকট যে দু'টি উট ছিল এ দু'টি চার মাস পর্যন্ত (ঘরে রেখে) বাবলা গাছের পাতা (ইত্যাদি) খাওয়াতে থাকলেন। ইবনু শিহাব উরওয়া (রাঃ)-এর সূত্রে আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইতিমধ্যে একদিন আমরা ঠিক দুপুর বেলায় আবুবকর (রাঃ)-এর ঘরে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আবুবকর (রাঃ)-কে সংবাদ দিল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাথা ঢাকা অবস্থায় আসছেন। তা এমন সময় ছিল যে, সে সময় তিনি পূর্বে কখনো আমাদের এখানে আসেননি। আবুবকর (রাঃ) তাঁর আগমন বার্তা শুনে বললেন, আমার মাতাপিতা তাঁর প্রতি কুরবান হউক। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি এ সময় নিশ্চয়ই কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনেই আসছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পৌঁছে (প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেওয়া হ'ল। প্রবেশ করে নবী করীম (ছাঃ) আবুবকর (রাঃ)-কে বললেন, এখানে অন্য যারা আছে তাদের বের করে দাও। আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হউক! এখানে তো আপনারই পরিবার। তখন তিনি বললেন, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হউক! আমি আপনার সফরসঙ্গী হ'তে ইচ্ছুক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঠিক আছে। আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতামাতা কুরবান হউক! আমার এ দু'টি উট থেকে আপনি যে কোন একটি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

(ঠিক আছে) তবে মূল্যের বিনিময়ে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা তাঁদের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করলাম এবং একটি থলের মধ্যে তাঁদের জন্য খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করে দিলাম। আমার বোন আসমা বিনতু আবুবকর (রাঃ) তার কোমর বন্ধের কিছু অংশ কেটে সে থলের মুখ বেঁধে দিল। এ কারণেই তাঁকে 'জাতুন নেতাক' (কোমর বন্ধ বিশিষ্ট) বলা হ'ত।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) (রওয়ানা হয়ে) ছাওর পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তাঁরা সেখানে তিন রাত অবস্থান করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আবুবকর (রাঃ) তাঁদের পাশেই রাত যাপন করতেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ। তিনি শেষ রাতে ওখান থেকে বেরিয়ে মক্কায় রাত্রি যাপনকারী কুরাইশদের সাথে ভোর বেলায় মিলিত হ'তেন এবং তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করা হ'ত তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন ও স্মরণ রাখতেন। যখন আঁধার ঘনিয়ে আসত তখন তিনি সংবাদ নিয়ে তাঁদের উভয়ের কাছে যেতেন। আবুবকর (রাঃ)-এর গোলাম আমের ইবনু ফুহায়রা তাঁদের কাছেই দুধালো বকরীর পাল চরিয়ে বেড়াত। রাত্রের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সে বকরীর পাল নিয়ে তাঁদের নিকটে যেত এবং তাঁরা দু'জন দুধ পান করে আরামে রাত যাপন করতেন। তাঁরা বকরীর দুধ দোহন করে সাথে সাথেই পান করতেন। তারপর শেষ রাতে আমের ইবনু ফুহায়রা বকরীগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যেত। এ তিনটি রাতের প্রত্যেক রাতে সে এরূপই করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর (রাঃ) বনী আবদ ইবনু আদী গোত্রের এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে 'খিররীত' (পথ প্রদর্শক) হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। আদী গোত্রের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। সে ছিল কাফির কুরাইশের ধর্মাবলম্বী। তাঁরা উভয়ে তাকে বিশ্বস্ত মনে করে তাঁদের উট দু'টি তার হাতে দিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় রাতের পরে সকালে উট দু'টি ছাওর গুহার নিকট নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। সে যথাসময়ে তা পৌঁছে দিল। আর আমের ইবনু ফুহায়রা ও পথ প্রদর্শক তাঁদের উভয়ের সঙ্গে চলল। প্রদর্শক তাঁদের নিয়ে উপকূল পথ ধরে চলতে লাগল।

ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, আব্দুর রহমান ইবনু মালেক মুদলেজী আমাকে বলেছেন, তিনি সুরাকা ইবনু মালেকের ভ্রাতুষ্পুত্র। তার পিতা তাকে বলেছেন, তিনি সুরাকা ইবনু জু'শুমকে বলতে শুনেছেন যে, আমাদের নিকট কুরাইশ কাফিরদের দূত আসল এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) এ দু'জনের যে কোন একজনকে যে হত্যা অথবা বন্দী করতে পারবে তাকে (একশ' উট) পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিল। আমি আমার কওম বনু মুদলীজের এক মজলিসে বসা ছিলাম। তখন তাদের নিকট থেকে এক ব্যক্তি এসে আমাদের নিকটে দাঁড়াল। আমরা বসাই ছিলাম। সে বলল, হে সুরাকা, আমি এই মাত্র উপকূলের পথে কয়েকজন মানুষকে যেতে দেখলাম। আমার ধারণা এরা মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীগণ হবেন। সুরাকা বললেন, আমি বুঝতে পারলাম যে, এঁরা তাঁরাই হবেন। কিন্তু তাকে বললাম, এরা তারা নয়, বরং তুমি অমুক অমুককে দেখেছ। এরা এই মাত্র আমাদের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল। তারপর আমি কিছুক্ষণ মজলিসে অবস্থান করে (বাড়ী) চলে আসলাম এবং আমার দাসীকে আদেশ করলাম, তুমি আমার ঘোড়াটি বের করে নিয়ে যাও এবং অমুক টিলার আড়ালে ঘোড়াটি ধরে দাঁড়িয়ে থাক। আমি বর্শা হাতে নিলাম এবং বাড়ির পিছন দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বর্শাটির এক প্রান্ত হাতে ধরে অন্য প্রান্ত মাটি সংলগ্ন অবস্থায় আমি টেনে নিয়ে চলছিলাম ঐ অবস্থায় মাটি সংলগ্ন অংশ দ্বারা মাটির উপর রেখাপাত করতে করতে আমার ঘোড়ার নিকট গিয়ে পৌঁছলাম এবং ঘোড়ায় আরোহণ করে তাঁকে খুব দ্রুত ছুটালাম। সে আমাকে নিয়ে ছুটে চলল। আমি প্রায় তাঁদের নিকট পৌঁছে গেলাম, এমন সময় আমার ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে আমাকে নিয়ে পড়ে গেল। আমিও তাঁর পিঠ থেকে ছিটকে পড়লাম। তারপর আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং তূনীরের দিকে হাত বাড়ালাম। তূনীর থেকে তীরগুলো বের করলাম ও তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করে নিলাম যে, আমি তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারব কি-না। তখন তীরগুলো দুর্ভাগ্যবশতঃ এমনভাবে বেরিয়ে এল যে, ভাগ্য নির্ধারণের বেলায় এমনটি হওয়া পসন্দ করি না। আমি পুনরায় ভাগ্য পরীক্ষার ফলাফল অমান্য করে অশ্বারোহণ করে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এত নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যে, তাঁর তিলাওয়াতের আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি (আমার দিকে) ফিরে তাকাচ্ছিলেন। আবুবকর (রাঃ) বার বার তাকিয়ে দেখছিলেন। এমন সময় আমার ঘোড়ার সামনের পা দু'টি হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে গেল এবং আমি তার উপর থেকে পড়ে গেলাম। তখন আমি ঘোড়াকে ধমক দিলাম, সে দাঁড়াতে ইচ্ছা করল। কিন্তু পা দু'টি বের করতে পারছিল না। অবশেষে যখন ঘোড়াটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তখন হঠাৎ তার সামনের পা দু'টি যে স্থানে গেড়েছিল সে স্থান থেকে ধোঁয়ার ন্যায় ধূলি আকাশের দিকে উঠতে লাগল। তখন আমি তীর দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। এবারও যা আমার অপসন্দনীয় তা-ই প্রকাশ পেল। তখন আমি উচ্চৈঃস্বরে তাঁদের নিরাপত্তা চাইলাম। এতে তাঁরা থেমে গেলেন এবং আমি আমার ঘোড়ায় আরোহণ করে আসলাম। আমি যখন ইত্যাকার অবস্থায় বার বার বাধাপ্রাপ্ত ও বিপদে পতিত হচ্ছিলাম, তখনই আমার অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এ মিশনটি অচিরেই প্রভাব বিস্তার করবে। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনার কওম আপনাকে ধরে দিতে পারলে একশ' উট পুরস্কার ঘোষণা করেছে। মক্কায় কাফিররা তাঁর সম্পর্কে যে ইচ্ছা করেছে তা তাঁকে জানালাম। অতঃপর আমি তাঁদের জন্য কিছু খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী পেশ করলাম। তাঁরা তা থেকে কিছুই নিলেন না। আর আমার কাছে এ কথা ছাড়া কিছুই চাইলেন না যে, আমাদের সংবাদটি গোপন রেখ। এরপর আমি আমাকে একটি নিরাপত্তালিপি লিখে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম। তখন তিনি আমের ইবনু ফুহায়রাকে আদেশ করলেন। তিনি একখণ্ড চামড়ায় তা লিখে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রওয়ানা দিলেন।

ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, উরওয়া ইবনু যুবায়ের (রাঃ) আমাকে বলেছেন, পথিমধ্যে যুবায়েরের সঙ্গে নবী করীম (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি মুসলমানদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন। তখন যুবায়ের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-কে সাদা রঙের পোশাক দান করলেন। এদিকে মদীনায় মুসলমানগণ শুনলেন যে, নবী করীম (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনার পথে রওয়ানা হয়েছেন। তাই তাঁরা প্রত্যহ সকালে মদীনার বাইরে গিয়ে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। দুপুরের রোদ প্রখর হ'লে তাঁরা ঘরে ফিরে আসতেন। একদিন তাঁরা পূর্বাপেক্ষা অধিক সময় অপেক্ষা করার পর নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। এমন সময় একজন ইহূদী তার নিজ প্রয়োজনে একটি টিলায় আরোহণ করে এদিক-ওদিক কি যেন দেখছিল। তখন নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর সাথী-সঙ্গীদেরকে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় মরীচিকাময় মরুভূমির উপর দিয়ে আগমন করতে দেখতে পেল। ইহূদী তখন নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলে উঠল, হে আরব সম্প্রদায়! এই-তো সে ভাগ্যবান ব্যক্তি, যাঁর জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ। মুসলমানগণ তাড়াতাড়ি হাতিয়ার তুলে নিয়ে এবং মদীনার হাররার উপকণ্ঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর

Contents

সঙ্গে মিলিত হ'লেন। তিনি সকলকে নিয়ে ডান দিকে মোড় নিয়ে বনু আমর ইবনু আউফ গোত্রে অবতরণ করলেন। এ দিনটি ছিল রবীউল আউয়াল মাসের সোমবার। আবুবকর (রাঃ) দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আর রাসূল (ছাঃ) নীরব থাকলেন। আনছারদের মধ্য থেকে যাঁরা এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেননি তাঁরা আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে সমবেত হ'তে লাগলেন, তারপর যখন রৌদ্রত্তাপ নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর পড়তে লাগল এবং আবুবকর (রাঃ) অগ্রসর হয়ে তাঁর চাদর দিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর ছায়া করে দিলেন। তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে চিনতে পারল। নবী করীম (ছাঃ) আমর ইবনু আউফ গোত্রে দশদিনের চেয়ে কিছু বেশী সময় অতিবাহিত করলেন এবং সে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন, যা (কুরআনের ভাষায়) তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতে ছালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি তাঁর বাহনের পিঠে আরোহণ করে রওয়ানা হ'লেন। লোকেরাও তাঁর সঙ্গে চলতে লাগল। মদীনায় (বর্তমান) মসজিদে নববীর স্থানে পৌঁছে উটটি বসে পড়ল। সে সময় ঐ স্থানে কপিতয় মুসলিম ছালাত আদায় করতেন। এ জায়গাটি ছিল আস'আদ ইবনু যুরারার আশ্রয়ে পালিত সাহল ও সুহায়েল নামক দু'জন ইয়াতীম বালকের খেজুর শুকাবার স্থান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে উটটি যখন এ স্থানে বসে পড়ল, তখন তিনি বললেন, ইনশাল্লাহ এ স্থানটিই হবে মনযীল। তারপর তিনি (ছাঃ) সেই বালক দু'টিকে ডেকে পাঠালেন এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য তাদের নিকট জায়গাটি মূল্যের বিনিময়ে ক্রয়ের আলোচনা করলেন। তাঁরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! বরং এটি আমরা আপনার জন্য বিনামূল্যে দিচ্ছি। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাদের কাছ থেকে বিনামূল্যে গ্রহণে অসম্মতি জানালেন। অবশেষে স্থানটি তাদের থেকে ক্রয় করে নিলেন। তারপর সেই স্থানে তিনি মসজিদ নির্মাণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদ নির্মাণ কালে ছাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে ইট বহন করছিলেন এবং ইট বহনের সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন, এ বোঝা খায়বারের (খাদ্যদ্রব্য) বোঝা নয়। হে রব! এর বোঝা অত্যন্ত পুণ্যময় ও পবিত্রের। তিনি আরো বলছিলেন, হে আল্লাহ! পরকালের প্রতিদানই প্রকৃত প্রতিদান। সুতরাং আনছার ও মুহাজিরদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। নবী করীম (ছাঃ) জনৈক মুসলিম কবির কবিতা আবৃত্তি করেন, যার নাম আমাকে বলা হয়নি। ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ কবিতাটি ছাড়া অপর কোন পূর্ণাঙ্গ কবিতা পাঠ করেছেন বলে কোন বর্ণনা আমার কাছে পৌঁছেনি *(বুখারী হা/৩৯০৫, ৩৯০৬; আহমাদ হা/১৭৬২৭; শারহুস সুন্নাহ ১/৮৯৭)*।

-আব্দুর রহীম,
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

চিকিৎসা জগৎ

হৃদরোগ সংক্রান্ত কিছু পরামর্শ

বর্তমানে দেশে হৃদরোগের বিস্তার ঘটেছে ব্যাপকভাবে। এ রোগ থেকে সুস্থ থাকতে কতিপয় পরামর্শ নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

১. সকল প্রকার তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বর্জন করা। ২. অতিরিক্ত তেল অথবা চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করা। ৩. খাদ্য তালিকায় তাজা শাক-সব্জি এবং ফল অন্ত ভুক্ত করা। ৪. তরকারিতে পরিমিত লবণ ব্যবহার এবং খাবারে বাড়তি লবণ মিশিয়ে খাওয়া পরিহার করা। ৫. চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা। ৬. ঘাম ঝরানো শারীরিক পরিশ্রম করা এবং নিয়মিত হাঁটা। ৭. উচ্চরক্তচাপ বা হাইপারটেনশন (ব্লাড প্রেসার) এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা। ৮. শরীরের বাড়তি ওযন কমিয়ে ফেলা এবং ওযন নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা।

৯. রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত রাখা, লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষা করে রক্তে কোন ধরনের চর্বি বেশী আছে, জেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা নেওয়া এবং খাদ্য তালিকা তৈরী করা। ১০. যাদের পারিবারে হৃদরোগ আছে তাদের অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা এবং নিয়মিত রক্তচাপ, রক্তের চর্বি, ডায়াবেটিস পরীক্ষা করে নিজের অবস্থান জেনে নেওয়া। ১১. মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করা। কেননা মানসিক চাপ হৃদরোগ ঘটায়। দৈনিক নিয়মিত ছালাত আদায় করা। ১২. দৈনিক অল্প কিছু সময় শিশু এবং বয়োবৃদ্ধদের সাথে কাটানো এবং সব সময় হাসিখুশী থাকার চেষ্টা করা। ১৩. দৈনিক পরিমিত নিদ্রা গ্রহণ করা এবং দৈনন্দিন জীবনে যথেষ্ট বিশ্রাম গ্রহণ করা। ১৪. ছোট শিশুদের গলা ব্যথা হ'লে বা বাতজ্বর হ'লে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

করোনারি বা অন্যান্য জটিল হৃদরোগ হবার সুনির্দিষ্ট কোন বয়স নেই। তাই সব বয়সেই হার্টের যত্ন নেবার প্রতি সচেষ্ট হ'তে হবে। সন্দেহ হ'লে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হ'তে হবে।

কিডনি সুস্থ রাখার ৭টি উপায়

কিডনি ফেইলুর বা রেনাল ফেইলুর শরীরের এক নীরব ঘাতক, প্রায় প্রতিটি পরিবারেরই কেউ না কেউ এই ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হয়। কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলে ইনশাআল্লাহ এই রোগ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। যেমন-

১. কর্মঠ থাকা : নিয়মিত হাঁটা, দৌড়ানো, সাইকিং করা বা সাঁতার কাটার মত হাল্কা ব্যায়াম করে শরীরকে কর্মঠ ও সতেজ রাখা। কর্মঠ ও সতেজ শরীরে অন্যান্য যেকোন রোগ হবার মত কিডনি রোগ হবার ঝুকিও খুব কম থাকে।

২. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা : ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর শতকরা ৫০ জনই কিডনি রোগে আক্রান্ত হন। রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে না থাকলে কিডনি নষ্ট হবার ঝুকি আরো বেড়ে যায়। তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা, নিয়মিত রক্তের সুগার পরীক্ষা করিয়ে দেখতে হবে তা স্বাভাবিক মাত্রায় আছে কি-না। শুধু তাই নয় অন্ত ত তিন মাস পরপর হ'লেও একবার কিডনি পরীক্ষা করিয়ে জেনে নেওয়া উচিত যে, সেটা সুস্থ আছে কি-না।

৩. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা : অনেকেরই ধারণা যে উচ্চ রক্তচাপ শুধু ব্রেইন স্ট্রোক (stroke) আর হার্ট এটাকের (heart attack) ঝুকি বাড়ায়। কিডনি ফেইলুর হবার প্রধান কারণ হ'ল অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ। তাই এ রোগ থেকে বাঁচতে অবশ্যই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কোন কারণে তা ১২৯/৮৯ মি,মি, এর বেশী হ'লে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। নিয়মিত ঔষধ সেবন এবং তদসংক্রান্ত উপদেশ মেনে চললে সহজেই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

৪. পরিমিত আহার করা এবং ওযন নিয়ন্ত্রণে রাখা : অতিরিক্ত ওযন কিডনির জন্য ঝুকিপূর্ণ। তাই সুস্থ থাকতে হ'লে ওযন কমিয়ে স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসতে হবে। পরিমিত স্বাস্থ্যকর খাবার খেলে কিডনি রোগ হবার ঝুকি অনেক কমে যায়। অন্য দিকে হোটেলের তেলমশলা যুক্ত খাবার, ফাষ্টফুড, প্রক্রিয়াজাত খাবার খেলে রোগ হবার ঝুকি অনেকাংশে বেড়ে যায়। মানুষের দৈনিক মাত্র ১ চা চামচ লবণ প্রয়োজন, খাবারে অতিরিক্ত লবণ খাওয়াও কিডনি রোগ হবার ঝুকি বাড়িয়ে দেয়। তাই খাবারে অতিরিক্ত লবণ পরিহার করতে হবে।

৫. ধূমপান পরিহার করা : অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের কিডনি ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা শতকরা ৫০ গুণ বেশী। শুধু তাই নয় ধূমপানের কারণে কিডনিতে রক্তপ্রবাহ কমে যেতে থাকে এবং এর ফলে কিডনির কর্মক্ষমতাও হ্রাস পেতে শুরু করে। এভাবে ধূমপায়ী একসময় কিডনি ফেইলুর রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়।

৬. অপ্রয়োজনীয় ঔষধ সেবন : আমাদের মাঝে অনেকেরই অভ্যাস আছে প্রয়োজনে/অপ্রয়োজনে দোকান থেকে ঔষুধ কিনে খাওয়া। এদের মধ্যে ব্যথার ঔষধ (NSAID) রয়েছে শীর্ষ তালিকায়। স্মর্তব্য যে, প্রায় সব ঔষধই কিডনির জন্য কমবেশী ক্ষতিকর। আর এর মধ্যে ব্যথার ঔষুধ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর। নিয়ম না জেনে অপ্রয়োজনীয় ঔষধ সেবন মনের অজান্তেই কিডনিকে ধ্বংস করে। তাই যে কোন ঔষুধ ব্যবহারের আগে অবশ্যই নিবন্ধিত চিকিৎসকের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে হবে।

৭. নিয়মিত কিডনি পরীক্ষা করানো : আমাদের মাঝে কেউ কেউ আছেন যাদের কিডনি রোগ হবার ঝুকি অনেক বেশী, তাদের অবশ্যই নিয়মিত কিডনি পরীক্ষা করানো উচিত। কারো যদি ডায়াবেটিস অথবা উচ্চ রক্তচাপ থাকে, ওযন বেশী থাকে (স্থূলতা/Obesity), পরিবারের কেউ কিডনি রোগে আক্রান্ত থাকেন, তাহ'লে ধরে নিতে হবে তার কিডনি রোগে আক্রান্ত হবার ঝুকি অনেক বেশী। তাই এসব কারণ থাকলে অবশ্যই নিয়মিত কিডনি পরীক্ষা করাতে হবে।

কিডনি ফেইলুর হয়ে গেলে ভালো হবার কোন সুযোগ নেই, ডায়ালাইসিস কিংবা প্রতিস্থাপন (Renal Transplant) করে শুধু কিছুদিন সুস্থ থাকা সম্ভব মাত্র। আল্লাহই প্রকৃত হেফাযতকারী।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

রাজহাঁস পালন ও তার পরিচর্যা

রাজহাঁস শুধু বাড়ীর শোভাবর্ধন করে না। বাড়ি-ঘর পাহারা দেয়, চোর তাড়ায়, ঘাস সমান করে খেয়ে নেয়। পোকা-মাকড় খেয়ে জায়গা-জমি ঝকঝকে করে দেয়। রাজহাঁসের গোশত খাওয়া হয়। ওর পলক দিয়ে লেপ-তোষক, বালিশ তৈরি হয়। বছরে খুব কম ডিম দেয়। এই কারণে রাজহাঁস পালনকারী তার ডিম না খেয়ে সেটা থেকে বাচ্চা উৎপাদন করতেই বেশি উৎসাহী হয়ে থাকেন।

রাজহাঁসের প্রজাতি : রাজহাঁসের বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে। তার মধ্যে টুলুজ, এমডেন, চিনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজহাঁসের বাসস্থান : রাজহাঁসের ঘর খোলা-মেলা, বায়ু চলাচলযুক্ত হবে। কিন্তু রোদ বৃষ্টি যাতে ভিতরে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মেঝে নানা ধরনের হ'তে পারে- পাকা, শক্ত অথচ কাঁচা।

ঘরে যাতে চোর না ঢোকে এবং শেয়াল বা অন্য কোন বন্যপ্রাণী এদের ক্ষতি না করে। ঘরের সামনে বা পিছনে কিছুটা জায়গা তারের জাল দিয়ে ঘিরে দিলে ভাল হয়। এই জায়গাটা ওদের বিচরণের কাজে আসবে। এই ধরনের জায়গা হাঁস পিছু ৪ বর্গ মিটার দিতে হবে। রাজহাঁসের ঘরের মধ্যে এবং বাইরে তিনটি হাঁস পিছু একটি করে ডিম পাড়ার বাক্স দিতে হবে। বাক্সে মাপ হবে ৫০ বর্গ সেঃ মিঃ। পানি ও খাবার জন্য আলাদা পাত্র থাকবে।

রাজহাঁসের প্রজনন করাতে চাইলে ভারি জাতের ৩/৪ টি মাদি হাঁস পিছু একটি মর্দা হাঁস রাখতে হবে। রাজহাঁসদের এক বছর বয়স না হ'লে প্রজনন কাজে ব্যবহার না করাই ভাল। সবচেয়ে ভাল হয় যদি ওদের দু'বছর বয়সে প্রজনন কাজে লাগানো যায়। মাদি হাঁস ১৫ বছর পর্যন্ত প্রজননক্ষম থাকে। কিন্তু মর্দা সাত বছরে প্রজননে কিছুটা অক্ষম হয়ে পড়ে।

ডিম ও ডিম ফোটানো : সাধারণত এরা বসন্তকালে ডিম দিতে শুরু করে। চিনে রাজহাঁস শুরু করে শীতকালে। এরা সকালের দিকেই ডিম দেয়। প্রথম বছরের তুলনায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছরে বেশি ডিম দিয়ে থাকে। ২য় এবং ৩য় বছরের ডিম আকারেও বেশ বড় হয়ে থাকে। শঙ্কর জাতীয় রাজহাঁস অর্থাৎ অক্সিকান রাজহাঁস বা চিনে এবং টুলুজ বা এমডেনের সঙ্কর রাজহাঁস এমডেন বা টুলুজ চিনে রাজহাঁস দের চেয়ে বেশি ডিম দেবে।

ডিমে তা দেওয়া : রাজহাঁস নিজের ডিম ফুটিয়ে থাকে এবং যখন ডিমে তা দেয় তখন ডিম পাড়া বন্ধ রাখে। সুবিধা থাকলে টার্কি মুরগি বা মস্কোডি হাঁস দিয়ে রাজহাঁসের ডিম ভালোভাবে ফুটিয়ে নেওয়া যায়।

মুরগি দিয়েও রাজহাঁসের ডিম ফোটানো যায়। এক্ষেত্রে মুরগি প্রতি ৪/৬ টি ডিম এবং রাজহাঁস দিয়ে বসালে রাজহাঁস পিছু ১০-১৫ টি ডিম বসাতে হবে। মুরগির নিচে রাজহাঁসের ডিম বসানো হ'লে ডিম ঘোরানোর ব্যবস্থা খামারীকে নিজেই করতে হবে। কারণ বড় আকারের বলে মুরগি রাজহাঁসের ডিম ঘোরাতে পারে না।

রাজহাঁসের বাচ্চাদের খাবার : রাজহাঁসের খাবার মোটামুটি সাধারণ হাঁসের খাবারের মতো। তবে প্রথমে চার সপ্তাহ রাজহাঁসের বাচ্চারা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে বলে বাচ্চা হাঁসের তুলনায় ওদের খাবারে আমিষের ভাগ বেশি হওয়া দরকার। ভারি জাতের রাজহাঁসের একদিনের বাচ্চার ওযন প্রায় ৮৫ গ্রাম এবং ৪ সপ্তাহে এর ওজন ১ কেজি ৬০০ গ্রাম পর্যন্ত।

প্রজননক্ষম রাজহাঁসের যত্ন : প্রাপ্তবয়স্ক রাজহাঁস দের প্রজনন ঋতুর আগে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত ভালোভাবে ঘাসে চরতে দিতে হবে। ওদের এই সময় প্রতিদিন ১৬৫ গ্রাম সুষম খাদ্য খেতে দিতে হবে, যাতে আমিষের ভাগ থাকবে শতকরা ১৬ ভাগ।

রাজহাঁসের রোগ : রাজহাঁস পালন তথা ব্যবসায় এটা একটা বড় সুবিধা যে এদের তেমন রোগ-ব্যধি হয় না। রোগের মড়ক নেই বললেই চলে। বাজারে বিক্রি করার বয়স পর্যন্ত মৃত্যুর হার শতকরা ২ ভাগও নয়। তবে রাজহাঁস পালনে নিম্নোক্ত রোগ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত ককসিডিও সিস, কলেরা, কোরাইজ, স্পাইরোকিটোসিস, অপুষ্টিজনিত রোগ প্রভৃতি।

মানুষের সেবায় রাজহাঁসের পাহারাদারী : রাজহাঁস তার পারিপার্শ্বিক প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে খুব সহজেই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে এবং সেই সুবাদে যে কোন অপরিচিত শব্দ, লোকজন, জন্তু, জানোয়ার দেখামাত্র প্যাঁক-প্যাঁক শব্দ করে আশ-পাশের সকলকে তটস্থ করে তোলে। এমনকি প্রবল উত্তেজনায় অনেক সময় আক্রমণ পর্যন্ত করে বসে। তবে রাজহাঁসের মধ্যে পাহারাদারি কাজে চীনা রাজহাঁস দক্ষতম।

রাজহাঁসের ডিম এবং গোশত : রাজহাঁসের গোশত ও ডিম উপাদেয় খাবার হিসাবে সমাদৃত। ১০ সপ্তাহ বয়সের রাজহাঁস গোশত হিসাবে খাওয়া চলে এবং সেই সময় ঐ গোশতের ব্যবসাও ভালো চলে। দশ সপ্তাহ বয়সে রাজহাঁসের ওযন ৪.৫ কেজি হয়। গোশত হিসাবে কাটার ১২ থেকে ১৮ ঘন্টা আগে আগে রাজহাঁসের পানি ছাড়া সবরকম খাবার খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে।

রাজহাঁসের পালক বিক্রয় : রাজহাঁসের পালক দিয়ে গদি, লেপ, তোষক, তাকিয়া, কুশন এককথায় বসবার এবং হেলান দেবার সব জিনিস তৈরি করা যায়। এই গদি তৈরির জন্য রাজহাঁসের বুক পিঠ এবং পেটের নরম পালকের খুব চাহিদা। রাজহাঁসের পালক তুলতে হবে রাজহাঁস যখন প্রথম ডিম পাড়া বন্ধ করবে। বছরে তিন থেকে চারবার এই পালক তোলা হয়। শীতকালে পালক তোলা উচিত নয়। ৫০ টি পূর্ণবয়স্ক রাজহাঁস সাড়ে চার কেজি পালক দিতে পারে।

॥ সংকলিত ॥

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

পিতা-মাতার খেদমতে বরকত লাভ

পিতা-মাতা হ'লেন মানুষের পৃথিবীতে আসার একমাত্র মাধ্যম। একজন সন্তানকে সৎ ও আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পিতা-মাতার। সন্তান আদর্শবান না হ'লে সারাজীবন পিতা-মাতাকে কষ্ট ভোগ করতে হয়। কেবল আদর্শবান সন্তান তার পিতা-মাতাকে প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে থাকে। মাতা অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে দীর্ঘ প্রায় দশ মাস সন্তানকে পেটে ধারণ করে। তারপর সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে প্রসব করে। দুই-আড়াই বছর যাবৎ দুধ পান করিয়ে বড় করে তোলে। এখানেই শেষ নয়, তার পড়ালেখা, চাকুরী-বাকরী সব নিয়ে পিতা-মাতা চিন্তায় থাকেন। পিতা সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে সন্তান ও তার মাতার চিকিৎসা, প্রতিপালনসহ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ উপার্জন করেন। এজন্য সন্তানরা পিতা-মাতার খিদমত করবে। তাদেরকে কষ্ট দিবে না, তাদের জন্য দো'আ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া তোমরা অন্যের উপাসনা করবে না। আর তোমরা পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। যদি তোমাদের সামনে তাদের একজন বা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহ'লে তোমরা তাদের প্রতি বিরক্তিকর কিছু বলবে না এবং তাদের তিরস্কার করবে না। বরং তাদের প্রতি বলবে সম্মনসূচক নম্র কথা বলবে' *(ইসরা ১৭/২৩)*।

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের খেদমত কর। কারণ তোমার মায়ের পায়ের সন্নিকটে তোমার জান্নাত' *(ছহীহ তারগীব হা/২৪৮৫; মিশকাত হা/৪৯৩৯)*। বাবা-মায়ের খেদমতে বরকত রয়েছে। এ সম্পর্কিত একটি গল্প আমরা এখানে উপস্থাপন করব।-

আরবে এক সময় এক সৎ লোক বাস করতেন। তার চারটি ছেলে ছিল। যখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হ'লেন এবং মৃত্যু শয্যায় শায়িত হ'লেন, তখন তার ছোট ছেলে স্বীয় ভাইদেরকে বলল, তোমরা পিতার খেদমত কর এবং তার অতিরিক্ত সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাক। অথবা তোমরা আমাকে তার খেদমত করার সুযোগ দাও। আমি তার খেদমতের বিনিময়ে বেশী সম্পদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকব।

অন্যান্য ভাইদের জন্য এটা ছিল সুযোগ। কারণ খেদমত না করেই বাবার সম্পদ পেয়ে যাবে। এমনকি তাদের ছোট ভাই পিতার সম্পদ থেকে খেদমতের বিনিময়ে কোন কিছু নিবে না। তাই তারা বলল, বরং তুমি পিতার খেদমত কর এবং তার সম্পদ থেকে বেশী কিছু গ্রহণ থেকে বিরত থাক। এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

ছোট ভাই পিতার খেদমত করতে থাকল। লোকটি খুশি হয়ে একদিন আল্লাহ্‌র কাছে হাত তুলে ছোট ছেলের জন্য দো'আ করে বললেন, হে আল্লাহ! আমার ছেলের সম্পদে বরকত দিয়ো। আল্লাহ্‌র ফায়ছালা অনুযায়ী তিনি একদিন মৃত্যুবরণ করলেন। ওয়াদা মাফিক ছোট ভাই সম্পদের অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকল। এদিকে আল্লাহ তা'আলা তাকে পিতার খেদমতের প্রতিফল এভাবে দিলেন যে, সে একদা স্বপ্নে দেখল, কেউ যেন তাকে বলছে, অমুক জায়গায় যাও সেখানে তুমি একশ' দীনার পাবে। সে বলল, এতে কি বরকত আছে? তাকে বলা হ'ল, না।

সকালে সে তার স্ত্রীকে স্বপ্নের কথা বলল। স্ত্রী বলল, যাও একশ' দীনার নিয়ে আস, তা দিয়ে আমরা কাপড় কিনে সেলাই করব এবং বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে তা দিয়ে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারব। কিন্তু সে অস্বীকার করল।

পরের রাতে আবার সে স্বপ্নে দেখল। কোন ব্যক্তি যেন তাকে বলছে, অমুক জায়গায় যাও তুমি সেখানে দশ দীনার পাবে। সে বলল, এতে কি বরকত আছে? তাকে বলা হ'ল, না।

সকালে সে তার স্ত্রীকে স্বপ্নের কথা বলল। তার স্ত্রী তাকে জোর দিয়ে বলল, যাও এবং তা থেকে উপকৃত হও। কিন্তু সে অস্বীকার করল। কেননা এতে বরকত নেই।

কিছুদিন পর সে আবার স্বপ্নে দেখল, কেউ যেন তাকে বলছে, অমুক স্থানে যাও, সেখানে তুমি এক দীনার পাবে। সে বলল, এতে কি বরকত আছে? তাকে বলা হ'ল, হ্যাঁ আছে।

সে সকালে সেখানে গেল এবং সত্যিই এক দীনার পেল। ফিরে আসার সময় সে বাজারে প্রবেশ করল। দেখল এক ব্যক্তি মাছ বিক্রি করছে। সে মাছের মূল্য জিজ্ঞেস করল এবং বিক্রেতার নিকট থেকে এক দীনারে দু'টি মাছ ক্রয় করে বাড়ি আসল। মাছ দু'টি কেটে-কুটে পরিস্কার করার সময় তাদের পেটে একটি করে মোতি পেল। যা অতি সুন্দর ও মূল্যবান ছিল। এত সুন্দর মোতি কম লোকেই দেখেছে। সে মোতিটি অনেক দামে বিক্রি করল। প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সে ব্যবসা-বাণিজ্য করে স্বাবলম্বী হ'ল। সে তার পিতার খেদমতের বদলা পেয়ে গেল। সে পিতার রেখে যাওয়া সম্পদে প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত গ্রহণ করেনি। কিন্তু আল্লাহ তার জন্য রিযিকের দরজাসমূহ এভাবে খুলে দিলেন।

সুতরাং সন্তানের কর্তব্য পিতা-মাতার খেদমত করা এবং তাদের জন্য বেশী বেশী দো'আ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তাঁর এক সৎ বান্দাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দিবেন। তখন সে বলবে, এটা কী করে পেলাম? তাকে বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৯৮; ছহীহুল জামে' হা/১৬১৭; মিশকাত হা/২৩৫৪)*।

** আব্দুর রহীম*
গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

Contents

কবিতা

আত-তাহরীক তুমি

মুসাম্মাৎ জুলিয়া আখতার
দৌলতখালী, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

আত-তাহরীক তুমি
বাতিলের তরে অগ্নি বারুদ
কাল বৈশাখীর ঝড়
তোমার দাপটে শত মিথ্যাবাদীর
কাঁপে ভীরু অন্তর।
আত-তাহরীক তুমি
যালিমের প্রাণ, করে খান খান
দাও মযলূমের মুক্তি
দুঃখে জরা হতাশ বক্ষে
জাগাও দুর্বার শক্তি।
আত-তাহরীক তুমি
সদা দুর্বার, ভেঙ্গে কর চূরমার
শত নমরূদের সিংহাসন
পাপ বিদগ্ধ মরুর ধরায়
কায়েম করতে তৎপর হক শাসন।
আত-তাহরীক তুমি
অন্ধের দৃষ্টি, গ্রীষ্মের বৃষ্টি
শরতের শিউলি ফুল
তোমার সুবাসে মত্ত আজি
সমগ্র আশরাফুল।
আত-তাহরীক তুমি
মুক্তির হাসি, সত্যের শশী
জ্বলবে চিরদিন
মিথ্যা পবনে তোমার আভা
হবে না কভু বিলীন।

***

তাবলীগী ইজতেমা

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

তাবলীগী ইজতেমা!
তুমি '৯১ এর দুর্দমনীয় এক দাওয়াতী প্রেরণা
তুমি পালন করেছ বিশ্বের বুকে সংস্কার সাধনা
তুমি শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে এক মরণপন যন্ত্রণা
তুমি করোনি আপোষ বাতিলের সাথে হওনি হীনমনা
তুমি শুনিয়েছ বিশ্বকে হেদায়াতের নমুনা।

তাবলীগী ইজতেমা!
তুমি '০২ এ জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনা
তুমি সহ্য করোনি ইসলামের নামে এমন প্ররোচনা
তুমি দাওনি হ'তে ইসলামের সামান্য অবমাননা
তুমি ঘোষণা করেছ জঙ্গীবাদ কখনো জিহাদ হয় না
তুমি চরমপন্থার বিরুদ্ধে এক লক্ষ্যভেদী নিশানা

তাবলীগী ইজতেমা!
তুমি '০৫ এর শিকার সরকারী বর্বরতার
তুমি তবুও এতটুকু দমনি চেয়েছিল যা সরকার
তুমি চলেছ অবিরাম গতিতে হয়েও ষড়যন্ত্রের শিকার
তুমি করছ প্রচার কুরআন-সুন্নাহ জানে বিশ্ব দরবার
তুমিই পার দেখিয়ে দিতে রাস্তা সফলতার।

***

আত-তাহরীকের আলো

ছানাউল্লাহ আব্বাসী
রসূলপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

মন শুধু চায় পেতে তাহরীকের আলো
ধুয়ে মুছে যাক চলে যাক সকল আধার কালো
এ আলোয় মধু মাখা নবরূপে দিক দেখা
সকলের প্রাণ সখা হোক সে ভালো
মন পেতে চায় শুধু তাহরীকের আলো।
জীবনে আছে যত সুখ হাসি গান
ব্যথা-বেদনায় ঘেরা দুঃখ অফুরাণ।
সব ব্যথা দূর করে তাহরীকের অহি-র জ্ঞান।
তাই মন শুধু খোঁজে তাহরীকের আলো
ধুয়ে মুছে চলে যাক সকল আধার কালো।

***

আত-তাহরীক

মুহাম্মাদ আবুল ফযল খন্দকার
রামশার কাযীপুর, নলডাঙ্গা, নাটোর।

কে দিয়েছে নাম তোমার আত-তাহরীক,
খোঁজ শুধু হক, সন্ধান দাও সঠিক।
আলাহ্র দীদার পাইতে তাইতো তোমায় পড়ি।
বাতিলকে ছুড়ে ফেলে সঠিকের সন্ধান করি।
তোমার নামের অর্থ হয় 'বিশেষ আন্দোলন',
সকল বাধা পেরিয়ে হোক তোমার বিচরণ।
জ্ঞানপাপিদের কাছে তুমি হবে না তো ভালো,
তাই বলে তোমার আবার কি এলো-গেলো?
জেগে থেকে ঘুমালে কারও যায় না ঘুম ভাঙ্গা,
একবার পড়েই দেখো আত-তাহরীক কি চাংগা!
হক কথায় বন্ধু বেজার গরম ভাতে বিড়াল
ছহীহ হাদীছ দিয়ে তুমি রোধ কর যঈফ ও জাল।
ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে কর গবেষণা
অনেক বিদ'আতীর আছে তা আজও অজানা।
তুমি যে জ্ঞানের আলো জাগিয়েছো সাড়া
তাইতো সব ছেটে ফেলে তোমাকে এত পড়া।
প্রতিটি পাতা তোমার পড়তে লাগে ভালো
তুমিইতো দিয়েছ আমায় সঠিক পথের আলো।
শিরক বিদ'আতে ভরে গেছে মোদের এই দেশটা
অহি-র দাওয়াত দিয়ে কর তুমি ভুল ভাঙ্গানোর চেষ্টা।
সামনের দিকে এগিয়ে চল পিছু হঠবে না কভু
তোমার সাথে আছেন মহান আলাহ প্রভু।
তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করতে আত-তাহরীক পড়।
বাতিলকে বাদ দিয়ে অহি-র আলোয় জীবন গড়।

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. আল্লাহ্র আকার আছে।
২. আল্লাহ্র ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে *(বুখারী হা/২৭৩৬)*।
৩. আরশে *(ত্ব-হা ২০/৫)*।
৪. সপ্তম আকাশের উপরে।
৫. না, বরং তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (সাহিত্য বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ইমরাউল কায়েস। ২. আহমাদ শাওকী।
৩. হাফেয ইবরাহীম। ৪. মুতানাব্বী।
৫. মাইকেল মধুসুধন দত্ত।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ক)

১. তাওহীদ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি?
২. শিরক কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি?
৩. বড় শিরক কাকে বলে? তার পরিণাম কি?
৪. ঈমান কাকে বলে? ঈমানের শাখা কয়টি? সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখা কি কি?
৫. ঈমানের স্তম্ভ কয়টি ও কি কি?
৬. ইসলাম কাকে বলে? ইসলামের স্তম্ভ কয়টি ও কি কি?
৭. ফেরেশতারা কিসের তৈরী? তাদের সরদার কে এবং অহী নিয়ে নবী-রাসূলগণের নিকটে আগমনের দায়িত্ব কার ছিল?
৮. মক্কার কাফেররা কি তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল?
৯. কাফেররা কি কোন ইবাদত করত?
১০. নবী বা ওলীকে অসীলা করে দো'আ করার হুকুম কি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী বিষয়ক)

১. কোন প্রাণী গায়ের রঙ পরিবর্তণ করে আত্মরক্ষা করে?
২. কোন প্রাণীর সামনের পাগুলিতে কান রয়েছে?
৩. পানিতে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে সাঁতার কেটে চলে কোন প্রাণী?
৪. স্থলপথে দ্রুতগামী কোন প্রাণী?
৫. কোন পাখি ডানা না ঝাপটিয়ে সারাদিন নিরলসভাবে উড়তে পারে?
৬. কোন পাখির ডানার প্রসারতা সবচেয়ে বেশী?

সংগ্রহে : ইবরাহীম খলীল
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সোনামণি সংবাদ

হড়গ্রাম, রাজশাহী ২৬শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে রাজপাড়া থানাধীন হড়গ্রাম পূর্ব শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সহকারী অর্থ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক মুকাম্মাল হোসাইন, রাজশাহী মহানগর 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আকমাল হোসাইন, হড়গ্রাম শাখা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাকীব ও রাজশাহী কলেজের সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র রাকীবুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সজীব হাসান এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সুমাইয়া খাতুন।

ঘোলহাড়িয়া, পবা, রাজশাহী ১১ই মার্চ বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'সোনামণি' ঘোলহাড়িয়া শাখার উদ্যোগে পবা থানাধীন ঘোলহাড়িয় ইসলামিক স্কুলে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার সভাপতি রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক সাখাওয়াত হোসাইন, রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল্লাহ ও 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে হাফেয রহমাতুল্লাহ।

আত-তাহরীক

রবীউল ইসলাম
মুরারীপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

আত-তাহরীক!
তুমি আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচারক
লক্ষ-কোটি প্রশংসা আল্লাহ্র
যিনি স্রষ্টা মোদের অদ্বিতীয় ইলাহ একক।
আত-তাহরীক!
তুমি সত্য প্রচারে নির্ভীক সৈনিক
তোমার পরশে হকের দিশা পেয়েছে
পথহারা হাযারো পথিক।
আত-তাহরীক!
তুমি মানবতার মুক্তির দিশারী
তুমি নির্ভেজাল তাওহীদের নিশান বরদার
বাতিলের বিরুদ্ধে হকের শাণিত তরবারি।
আত-তাহরীক!
তুমি বিশ্ব নন্দিত ইসলামী সাহিত্য
তোমায় পড়ে পাঠক হৃদয় হয় বিমোহিত
সুপ্ত প্রতিভা হয় তোমার ছোয়ায় জাগ্রত।
আত-তাহরীক!
তুমি যুগের শ্রেষ্ঠ বার্তাবাহক
দিনে দিনে বেড়ে চলুক
তোমার লক্ষ-কোটি গ্রাহক।

***

জান্নাত যদি চাও

মুহাম্মাদ তাওফীকুল ইসলাম
নাখোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

মহান প্রভুর সন্তুষ্টি আর জান্নাত যদি চাও
শিরক-বিদ'আত যুক্ত আমল আজই ছেড়ে দাও।
রাসূলের পদ্ধতিতে ছালাত ছিয়াম পালন কর তুমি
তবেই পাবে জান্নাত তুষ্ট হবেন অন্তর্যামী।
পীর আউলিয়া আলেম ইমাম ভক্ত তুমি হ'লে
সবার দোহাই অচল তোমার দেখবে পরকালে।
দেখাদেখি শিখলে তুমি বাতিল ইবাদত
কেমন করে পাবে তুমি প্রভুর রহমত?
পেটপূজারী আলেম হ'লে বিচার-বিবেকহীন
হক ছেড়ে আজ ভ্রান্ত পথে চলছ বিরামহীন।
সমাজের চাপে বিদ'আত তুমি কর কেমনে?
বাতিল আমল চালু করে থাক গভীর ঘুমে।
তওবা কর প্রভুর কাছে শিরক-বিদ'আত ছাড়
ছহীহ হাদীছ আঁকড়ে ধর সুন্দর জীবন গড়।

***

স্বদেশ

প্রিয় নবী (ছাঃ) যে নূর এ কথা যারা স্বীকার করে না, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

-আল্লামা কবি রূহুল আমীন খান

দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সিনিয়র সহ-সভাপতি, মসজিদে গাউসুল আজম-এর খতীব আল্লামা কবি রূহুল আমীন খান বলেন, আজকে একশ্রেণির আলেম নামধারী আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ)-কে সাধারণ মানুষের মতো মনে করে। প্রিয় নবী (সাঃ) যে নূর এ কথা তারা স্বীকার করে না। তারা কথায় কথায় প্রিয় নবী (সাঃ)-এর শানে ও মানে আঘাত হানছে। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদরাসার দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত বার্ষিক তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

[আল্লাহ বলেন, তুমি বল : আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ মাত্র'... (কাহফ ১৮/১১০)। তিনি মানুষের নবী হিসাবে মানুষই ছিলেন। তিনি পিতা-মাতার মাধ্যমে দুনিয়াতে এসেছিলেন। তাঁর বিয়ে-শাদী ও সন্তানাদি হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল এবং কাফন-দাফন কয়েছিল। এগুলি সবই বাস্তব। তাহ'লে কিভাবে তিনি 'নূর' হলেন? আল্লাহ বলছেন তিনি আমাদেরই মত মানুষ ছিলেন। অথচ এইসব আল্লামাগণ বলছেন তিনি নূর ছিলেন। আমরা তাহ'লে কি কুরআন-হাদীছ ছেড়ে তাঁদের কথা শুনব? মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন (স.স.)]

শরী'আহ আইন ছাড়াই চলছে ইসলামী বীমা ব্যবসা

দেশে চলমান বীমা ব্যবস্থায় শরী'আহ আইনের কোন বালাই নেই। তবু নামের আগে ইসলাম যোগ করে অবাধে চলছে ব্যবসা। নতুন আইনের একটি খসড়া হলেও তা অনুমোদন হয়নি। আর ধর্মের ব্যবহারে বীমা ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় শরীয়াহ উইংয়ের প্রতি দেশী-বিদেশী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ইসলামী চিন্তাবিদ ও বীমা বিশ্লেষকদের মতে, এ দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী মুসলিম এবং তারা ধর্মপ্রাণ। এটাকে পুঁজি করে ব্যবসারত কতিপয় বীমা কোম্পানী ইসলামী শরী'আহ নামে বীমা গ্রাহকের সঙ্গে প্রতারণা করছে। শরী'আহ বীমার নামে একদিকে যেমন মুনাফা কম দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে নানা ফাঁক -ফোকর দিয়ে সুকৌশলে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই বীমাকে বিশ্বাস কেন্দ্রে দাঁড় করিয়ে প্রকারান্তরে ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশ্বাসের সাথেই প্রতারণা করছে প্রতিষ্ঠানগুলি। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৯ সাল থেকে শরী'আহ মোতাবেক নন-লাইফ ও লাইফ বীমা পরিচালনার জন্য বীমা কোম্পানিগুলোকে অনুমোদন দেয়া শুরু করে। অনুমোদনের প্রায় ১৫ বছর পার হলেও তৈরী হয়নি ইসলামী বীমা পরিচালনার জন্য পৃথক কোন নীতিমালা কিংবা আইন। কবে নাগাদ এ আইন চূড়ান্ত হতে পারে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

কোম্পানীগুলি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান 'আইডিআরএর' চেয়ারম্যান এম শেফাক আহমাদ বলেন, বিদ্যমান ইসলামী বীমা কোম্পানিগুলো যেভাবে ব্যবসা করছে, তা শরী'আহভিত্তিক নয়।

'আইডিআরএ'-এর সদস্য কুদ্দুস খান বলেন, 'আইডিআরএ' তাকাফুল বিধি এখনো তৈরী করেনি। এক্ষেত্রে প্রত্যেক ইসলামী বীমা কোম্পানীর নিজস্ব কথিত শরী'আহ বোর্ড রয়েছে বলে তাদের দাবী। কিন্তু এ বোর্ডগুলো শরী'আহ আইন মানার পরিবর্তে কোম্পানীর স্বার্থকেই বেশী প্রাধান্য দেয়।

দেশে মোট ১১টি ইসলামী বীমা কোম্পানী ব্যবসা করছে। এছাড়া বিদেশী কোম্পানিগুলোও আলাদা উইং খুলে ব্যবসা করে আসছে। প্রাইম ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর শামসুল হুদা স্বীকার করে বলেন, শরী'আহ আইন ছাড়াই ইসলামী বীমা ব্যবসা করছে সবাই। তবে কিছুটা নিয়ম-কানুন পৃথক আছে।

দেশে পরিবেশ বান্ধব 'বায়োচার' চুল্লি উদ্ভাবন

জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিত্যনতুন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছেন বাংলাদেশের উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তির মানুষেরা। এবার 'বায়োচার' উৎপাদনের চুল্লি উদ্ভাবন করলেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শামীম মিয়া।

এ উদ্ভাবনের ফলে বাংলাদেশের কৃষি খাতের সামনে উন্মোচিত হয়েছে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার। একই সঙ্গে নগরজীবনকে আবর্জনার দুর্গন্ধযুক্ত অভিশাপ থেকে মুক্তির পথও খুলে গেছে। 'বায়োচার' এক ধরনের চার কোনাকার কয়লা, যা সীমিত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে তাপের সাহায্যে জৈব পদার্থ থেকে তৈরী করা হয়। কাঠ, কাঠের গুঁড়া, আগাছা বা শহরের আবর্জনা থেকে তৈরী করা যায় বায়োচার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে- বায়োচার মাটিতে প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে নানাভাবে। বায়োচার মাটিতে রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা বাড়ায়, গাছের খাদ্য উপাদানগুলোকে ধরে রাখে এবং মাটির অম্লত্ব দূর করে।

এছাড়া বায়োচার তৈরীর সময় যে তাপ উৎপন্ন হয়, তা রান্নার কাজেও ব্যবহার করা যায়। চুল্লির উদ্ভাবক শামীম মিয়া জানিয়েছেন, বাংলাদেশে ঢাকাসহ অন্যান্য শহরের আবর্জনা ব্যবহার করে বায়োচার উৎপন্ন করা গেলে একদিকে যেমন দূষণ কমে যাবে, অন্যদিকে সার হিসেবে জমিতে ব্যবহার করা যাবে। ৩ বছরেরও অধিক সময় ধরে গবেষণার পর তিনি এটি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন। বর্তমানে এর কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা চলছে।

দেশে প্রতিবছর কিডনী রোগে মারা যাচ্ছে ৪০ হাযার মানুষ

দেশের ২ কোটি মানুষ কোন না কোনভাবে কিডনঅ-সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত। প্রতিবছর প্রায় ৪ লাখ মানুষ নতুন করে এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এদের মধ্যে প্রায় ৪০ হাযার রোগী কিডনি বিকল হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। প্রতিদিনই বাড়ছে এই কিডনি রোগীর সংখ্যা। কিডনি রোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিসংখ্যানে এ তথ্য উঠে এসেছে। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, এ রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে পারলে এবং সময়মতো চিকিৎসা সম্ভব হলে এ ঘাতকব্যাধি অনেকাংশেই রোধ করা সম্ভব। এছাড়া ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার ও ভেজাল খাবারের জন্য কিডনি বিকল অনেকাংশেই দায়ী বলে উল্লেখ করেন।

কিডনিকে একটি নীরব ঘাতক উল্লেখ করে ঢাকা মেডিকেলের কিডনি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সহেলী আহমাদ বলেন, শিশু বয়স থেকেই কিডনি সংরক্ষণে উদ্যোগ নিতে হবে। সব ধরনের ফাস্ট ফুড, কোমল পানীয় এবং পরবর্তীতে ধূমপান পরিহার করতে হবে। একই সঙ্গে একজন মানুষের কোনভাবেই একদিনে ৬ চামচ চিনি এবং ৫ চামচ লবণের বেশি খাওয়া ঠিক নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি।

অপর কিডনি বিশেষজ্ঞ ডা. এম এ ছামাদ বলেন, কিডনি রোগ অত্যন্ত ভয়াবহ। কিডনি সচল ও সুস্থ রাখতে তিনি অধিক পানি পান ও ব্যায়াম করার ওপর সবচেয়ে গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে তিনি কয়েকটি বিষয় মেনে চলার পরামর্শ দেন। সেগুলো হলো– কায়িক পরিশ্রম, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়েবেটিকস নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ, ওযন নিয়ন্ত্রণে রাখা, ধূমপান থেকে বিরত থাকা, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন ওষুধ সেবন না করা এবং নিয়মিত কিডনির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা।

Contents

বিদেশ

ইবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ১০ সহস্রাধিক

ইবোলো ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত ১০ হাযারের বেশী লোকের মৃত্যু হয়েছে। এদের অধিকাংশই পশ্চিম আফ্রিকার বাশিন্দা। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' একথা জানিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী সিয়েরালিওন, গিনি ও লাইবেরিয়ায় প্রাণঘাতী এই রোগের সবচেয়ে বেশী প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এই তিন দেশে ২৪ হাযার ৩৫০ জনের শরীরে ইবোলা ভাইরাস ধরা পড়েছে। এক বছরের বেশী সময় আগে শুরু হওয়া এই মহামারীতে এখন পর্যন্ত ১০ হাযার ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ইবোলায় আক্রান্ত হয়ে মালিতে ৬ জন, যুক্তরাষ্ট্রে একজন ও নাইজেরিয়ায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে।

৯০ বছর পর জামা'আতে ছালাত আদায়ের সুযোগ পেলেন তুর্কী সেনা সদস্যরা

দীর্ঘ ৯০ বছর পর জামা'আতে ছালাত আদায়ের সুযোগ পেল তুর্কী সেনাবাহিনী। প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোগান ৯০ বছর ধরে চলা এই নিষেধাজ্ঞা গত ১৮ই মার্চ রাতে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কামাল আতাতুর্ক উছমানীয় খেলাফত উচ্ছেদের পর সৈন্যদের জামা'আতে ছালাত আদায়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। তিনি সৈনিকদের মধ্যে ইসলাম অনুসারীদের ওপর বেশ বিরূপ ছিলেন। তার উত্তরসূরীরাও কড়াভাবে নযর রাখতেন যাতে কেউ ইসলামী অনুশাসন পালন না করে। এমনকি ছালাত আদায় করলে এতদিন চাকরিচ্যুত পর্যন্ত করা হ'ত তুর্কী সেনা সদস্যদের। এরদোগান ক্ষমতায় আসার পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

[আলহামদুলিল্লাহ! মোর্দা সুন্নাত যিন্দা করার মহা পুরস্কারে তিনি ভূষিত হবেন। তুরস্ক তার হারানো খেলাফতী ঐতিহ্য ফিরে পাক। আমরা আল্লাহর নিকট সেই প্রার্থনা করব (স.স.)]

ইউরোপে ২০৫০ সাল নাগাদ ২০ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে

আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে মুসলিম জনসংখ্যার হার ২০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। সম্প্রতি এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ইউরোপে মুসলিম জনসংখ্যার হার মোট জনসংখ্যার চার শতাংশের মতো। তবে অভিবাসী এবং ইউরোপীয় মুসলিমদের উচ্চ জন্মহার মিলিয়ে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হ'ল ইউরোপের অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চেয়ে মুসলিমদের বৃদ্ধির হার গাণিতিক হারে বাড়ছে। এতে করে আশা করা যায়, ৪০ বছর পর ইউরোপের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ হবে মুসলিম। সম্প্রতি ব্রিটেনে কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে মুসলিম জন্যসংখ্যা বোমা হিসাবে আখ্যা দিয়েছে।

সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর সিঙ্গাপুর, কম ব্যয়বহুল করাচী

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর হিসাবে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সিঙ্গাপুর। ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট প্রকাশিত এক গবেষণার ফলাফলে এ তথ্য উঠে এসেছে। বিশ্বের সবচেয়ে কম ব্যয়বহুল শহর হিসাবে তালিকার শীর্ষে আছে পাকিস্তানের করাচী। এরপর আছে ভারতের ব্যাঙ্গালুর। ভারতের আরো দু'টি শহর শীর্ষ অবস্থানে থাকলেও তিন নাম্বারে আছে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস। প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, এক বছর ধরে বিশ্বের শীর্ষ ব্যয়বহুল শহরগুলোর অবস্থান অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। প্রথমে সিঙ্গাপুর, এরপর প্যারিস, তারপর যথাক্রমে অসলো, জুরিখ ও সিডনী। ২০১৪ সালে টোকিওকে সরিয়ে সিঙ্গাপুর সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর হিসাবে শীর্ষস্থান দখল করে।

প্রতিবেদনে উঠে আসা বিভিন্ন দিকগুলি বিশ্লেষণে দেখা যায় দৈনন্দিন মুদী পণ্যের মূল্য বিবেচনায় নিউইয়র্ক থেকে সিঙ্গাপুর ১১ শতাংশ বেশী ব্যয়বহুল। পোশাকের জন্য সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর সিউল। নিউইয়র্ক থেকে এখানে পোশাকের মূল্য ৫০ শতাংশ বেশী। অপরদিকে সিঙ্গাপুরের জীবনযাত্রায় পরিবহন খরচ অত্যন্ত বেশী, যা নিউইয়র্কের তুলনায় প্রায় তিনগুণ।

ইরাকে আমেরিকান সেনা অভিযানই 'আইএসআইএল' সৃষ্টি করেছে

-বারাক ওবামা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা স্বীকার করেছেন, ইরাকে মার্কিন সেনা অভিযানের ফলেই 'আইএসআইএল' বা 'আইএস'-এর সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি এমন মন্তব্য করেন। ওবামা বলেন, আল-কায়েদা থেকে সরাসরি 'আইএসআইএল'-এর সৃষ্টি হয়েছে এবং ইরাকে আমেরিকার সেনা অভিযানের ফলেই এর উদ্ভব ঘটেছে। তিনি তার ভাষায় ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্ট পরিস্থিতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা অভিযানের অনাকাংখিত প্রতিক্রিয়া হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, এ কারণেই আমেরিকার উচিত কোনো বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার আগে লক্ষ্যবস্তু সঠিকভাবে নির্ধারণ করা।

এছাড়া পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের নীতিও তিনি অনুসরণ করছেন না বলেও জানান ওবামা। তিনি বলেন, ৬০টি দেশকে নিয়ে জোট গঠন করা হয়েছে এবং এ জোট ধীরে ধীরে ইরাক থেকে আইএসআইএলকে হটিয়ে দেবে। ইরাকে মার্কিন

আগ্রাসনের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে চরমপন্থী মতবাদের উদ্ভবের সম্পর্কের কথা এই প্রথম স্বীকার করলেন কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ২০০৩ সালে ইরাকে আগ্রাসন চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

প্রথমবারের মত আকাশে উড়ল সৌরচালিত বিমান

প্রথমবারের মত জ্বালানী ছাড়াই সফলভাবে আকাশে উড়ল বিমান। সৌরশক্তিচালিত 'দ্য সোলার ইমপালস ২' নামের বিমানটি আরব আমিরাতের আবুধাবি থেকে যাত্রা শুরু করেছে। আগামী পাঁচ মাসে এই বিমানে করে গোটা বিশ্ব ভ্রমণ করবেন বিমানটির দুই চালক আন্দ্রে ও বার্নার্ড। অতিক্রম করবেন প্রায় ৩৫ হাযার কিলোমিটার। পাড়ি দিবেন প্রশান্ত ও আটলান্টিকের মত বিশাল মহাসাগর। সেই সঙ্গে বিশ্বে প্রচারিত হবে অপ্রচলিত শক্তি হিসাবে সৌরশক্তির এই অভাবনীয় সাফল্যের কথা। তবে বিশ্ব প্রদক্ষিণে বিমানটির মহাকাব্যিক এই যাত্রার সাফল্যের অনেকটাই নির্ভর করছে এর দুই পাখায় বসানো মোট ১৭ হাযার সৌর প্যানেলের ওপর।

[একেই বলে ভূতের মুখে রাম নাম। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল এইসব ভূতেরা কি দায়মুক্ত? এরা কি বিশ্বব্যাপী যুলুম চালিয়ে যাবার একচ্ছত্র লাইসেন্স পেয়ে গেছে? আন্তর্জাতিক আদালত কি এদের ব্যাপারে অপারগ? (স.স.)]

মুসলিম জাহান

২০১৪ সাল : সিরিয়া ও ইরাকের রক্তাক্ত একটি বছর

সিরিয়া ও ইরাক ভয়াবহ রক্তাক্ত একটি বছর পার করেছে ২০১৪ সালে। সিরিয়ায় সহিংসতা শুরুর পর থেকে এ বছরেই সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ ৭৬ হাযার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। একই বছর ইরাকে নিহত হয়েছে ১৫ হাযারেরও বেশি মানুষ, যা গত সাত বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। 'সিরিয়ান অবজারভেটরী ফর হিউম্যান রাইটস' নামক একটি সংস্থা জানায়, গত বছর সিরিয়ায় বহুমুখী সংঘর্ষে ৭৬ হাযার ২১ জন নিহত হয়েছে। অপরদিকে ইরাকের অবস্থা সম্পর্কে দেশটির সরকারী হিসাবে জানানো হয়েছে, ২০১৪ সালে সহিংসতায় দেশটিতে ১৫ হাযারেরও বেশী সামরিক ও বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। যা গত বছরে ছিল ৬ হাযার ৫২২ জন।

এছাড়া এ সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী সিরিয়ায় গত চার বছর ধরে চলা যুদ্ধে এ পর্যন্ত দুই লাখ ১৫ হাযার মানুষ নিহত হয়েছে। যার মধ্যে ৬৬ হাযার কেবল বেসামরিক নাগরিক। বিগত চার বছরের সংঘাতে সিরিয়ার অর্ধেক জনগণই গৃহহীন হয়ে বিভিন্ন দেশে শরণার্থী জীবন কাটাচ্ছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর বলেছে, বর্তমান যুগে পৃথিবীতে এটাই একালের সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয়।

শাসনক্ষমতায় শী'আ হাওছী সম্প্রদায় : গভীর সংকটে ইয়ামন

গত ৬ ফেব্রুয়ারী ইয়েমেনের শী'আ অধ্যুষিত উত্তর অঞ্চলে হাওছী সম্প্রদায়ের যোদ্ধারা রাজধানী ছান'আ দখল করে শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে পদত্যাগ করেছেন। হাওছী বিদ্রোহীরা দেশটির পার্লামেন্ট বিলুপ্ত করে ৫ সদস্যের একটি প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিল এবং ৫৫১ সদস্যের জাতীয় পরিষদ ঘোষণা করেছে। যারা আগামী দু'বছরের জন্য দেশ পরিচালনা করবে। ইয়ামেনের বিরোধী দলগুলো এই ঘোষণাকে অভ্যুত্থান হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

তবে হাওছী নেতৃত্ব গোটা দেশের আস্থাভাজন না হওয়ার কারণে তারা নামে মাত্র সরকার গঠন করেছে। ইতিমধ্যে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সুন্নী অধ্যুষিত চারটি প্রদেশের কর্তৃপক্ষ বলেছে, এখন থেকে তারা রাজধানী ছান'আর নিয়ন্ত্রণ মানবে না। ঘটনাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ইয়েমেন সংকট অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে আরো ঘনীভূত হয়েছে।

এ প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বিভিন্নভাবে হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। অপরদিকে শী'আ হাওছীরা ক্ষমতাসীন হওয়ায় কৃত্রিম উদ্বেগ প্রকাশ করলেও ইয়ামেনের চলমান রাজনীতির ঘটনাবলী নিয়ে ষড়যন্ত্র না করতে পশ্চিমা দেশগুলোকে সতর্ক করে দিয়েছে।

ইয়েমেনের জনসংখ্যা প্রায় ২কোটি ৪০ লাখ। মোট জনসংখ্যার ৩৪ থেকে ৪০ শতাংশ শী'আ যায়দী বা হাওছী সম্প্রদায়। অবশিষ্ট সবাই সুন্নী। ২০১১ সালে তিউনিসিয়া থেকে উত্থিত কথিত আরব বসন্তের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বাতাসে ইয়ামনের জনগণও জেগে উঠে। ফলে ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিরতার পর ক্ষমতা ছাড়েন দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে ক্ষমতাসীন কথিত স্বৈরাচার প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ ছালেহ। ২০১২ সালের নির্বাচনে জাতীয় ঐকমত্যের প্রার্থী মনসূর হাদী প্রেসিডেন্ট হন। কিন্তু ইতিমধ্যে নড়বড়ে হয়ে যাওয়া শাসনক্ষমতা নিয়ে ৬০% সুন্নী, ৪০% শী'আ, পূর্ব থেকে লালিত উত্তর ও দক্ষিণ ইয়ামনের বিরোধ, চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলির আত্মঘাতী হামলা এবং শতধাবিভক্ত গোত্রগুলি ঐক্যবদ্ধ রাখা তার পক্ষে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়ে। যার ফলাফল চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা। অতঃপর আজকের হাওছী উত্থান।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

স্পন্দন ছাড়াই কাজ করবে কৃত্রিম হৃদযন্ত্র

অস্ট্রেলিয়ার একদল গবেষক বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম হৃদযন্ত্র বা হৃদপিণ্ড আবিষ্কার করেছেন, যা কোনো রকম স্পন্দন ছাড়াও রক্ত পাম্প করতে সক্ষম হবে। আগামী তিন বছরের মধ্যে মানবদেহে এই কৃত্রিম হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন করা যাবে বলে আশাবাদী গবেষকরা। বর্তমানে কৃত্রিম হৃদযন্ত্রটি পরীক্ষামূলকভাবে মানবদেহে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। 'বিভাকর' নামে এই ডিভাইসটির মধ্যে রয়েছে একটি ছোট ব্লেডওয়ালা ডিস্ক, যেটি প্রতি মিনিটে কোনো স্পন্দন ছাড়াই দু'হাযার বার পূর্ণ আবর্তে ঘুরে রক্ত পাম্প করবে। তিনি বলেন, ম্যাগনেটিক লেভিটেশন ব্যবহার করায় এ কৃত্রিম হৃদযন্ত্রটি বহুদিন কাজ করতে সক্ষম হবে।

চিন্তাশক্তি কমায় স্মার্টফোন!

স্মার্টফোন ব্যবহার করে অভ্যস্ত যারা, তাদের চিন্তা-ভাবনায় একধরনের আলসেমী তৈরী হয়। বিশ্লেষণমূলক চিন্তার সামর্থ্য ধীরে ধীরে কমে যায়। কারণ আঙুলের স্পর্শেই অনেক জটিল কাজকর্ম সম্পন্ন হয়ে যাওয়ায় নিজে নিজে চিন্তা করার ব্যাপারটা অজান্তেই এড়িয়ে যায় তারা। আর এভাবেই স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা নিজের মস্তিষ্কের চেয়ে যন্ত্রের ওপরই বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। কানাডার একদল গবেষক একথা জানিয়েছেন। ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী গর্ডন পেনিকুক বলেন, যেসব তথ্য সহজেই পাওয়া যায় এবং শেখা যায়, সেগুলো নিয়ে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা চিন্তা-ভাবনা করতে সাধারণতঃ অনিচ্ছুক হয়ে থাকে।

মননিয়ন্ত্রিত বায়োনিক হাত উদ্ভাবন

মানুষের তৈরী হাত বটে, তবে নিছক জড় কোনো বস্তু নয়। মানুষের মন যেমন তার রক্তমাংসের হাত নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি এই বায়োনিক হাতের ওপরও থাকবে মনের নিয়ন্ত্রণ। মননিয়ন্ত্রিত এমন বায়োনিক হাত উদ্ভাবনের দাবী করেছেন একদল ইউরোপীয় শল্যচিকিৎসক ও প্রকৌশলী। রক্তমাংসের প্রতিস্থাপিত অঙ্গের মতোই ঐ হাত কাজ করতে সক্ষম।

গাড়ি ও আরোহণজনিত দুর্ঘটনায় হাত হারানো তিন অস্ট্রেলীয় বিশেষ কৌশলের ঐ বায়োনিক হাতের সুবিধা ভোগ করছেন বর্তমানে। ২০১১ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৪ সালের মে মাসের মধ্যে ঐ তিন রোগীর শরীরে এই বায়োনিক হাত যুক্ত করা হয়। যুক্ত করা এই হাত দিয়ে তারা হাতে বল নেওয়া, জগ দিয়ে পানি ঢালা, চাবি ব্যবহার, ছুরি দিয়ে খাবার কাটা, দু'হাত ব্যবহার করে বোতাম লাগানো ইত্যাদি বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজ করতে সক্ষম হন। প্রযুক্তির উদ্ভাবক অস্কার আজমান দাবী করেন, দাতাদের কাছ থেকে নিয়ে প্রতিস্থাপনের চেয়ে এই বায়োনিক হাত কম ঝুঁকিপূর্ণ। তবে বায়োনিক হাতে অনুভূতি নেই বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

নতুন এই কৃত্রিম হাতের দাম ১৭ হাযার মার্কিন ডলার, বাংলাদেশী মুদ্রায় যা প্রায় ১২ লাখ ৯৪ হাযার টাকা। এ ছাড়া অস্ত্রোপচার ও পুনর্বাসনে প্রায় একই খরচ পড়ে। রোগীর পর্যাপ্ত স্নায়ু ও মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা এবং পরিবেশ অনুকূলে না থাকলে এই হাত সংযোজন করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট গবেষকেরা।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলামী সম্মেলন

মজীদপুর, নওগাঁ ৬ই মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার মান্দা থানাধীন মজীদপুর শাখার উদ্যোগে স্থানীয় মজীদপুর ফাযিল মাদরাসা ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামনি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন ও স্থানীয় জনাব মুরশেদ আলম (নওগাঁ) প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন অত্র ফাযিল মাদরাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা আকরাম হোসাইন। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ এনামুল হক (নওগাঁ)। সম্মেলনের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মজীদপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছানাউল্লাহ।

তাবলীগী সভা

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৭ই মার্চ শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে নওদাপাড়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। নওদাপাড়া বাজার শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ সেলিম রেযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে নাজী ফিরক্বার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে সমবেত মুছল্লীদেরকে উক্ত ফিরক্বার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক জনাব আশরাফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন নওদাপাড়া বাজার শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আব্দুল হাই, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আযীয এবং সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আব্দুল মালেক প্রমুখ।

যুবসংঘ

কমিটি গঠন

ঢাকা ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আহসান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও সহ-সভাপতি জামীলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকার, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ প্রমুখ। বৈঠকে মুহাম্মাদ হুমায়ূন কবীরকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। প্রধান অতিথি তার ভাষণে নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানান এবং ব্যাপক সফরের মাধ্যমে ঢাকার সর্বত্র 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে 'যুবসংঘ'-এর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী এলাকা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নাজীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হেফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মোশতাক আহমাদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক যয়নাল আবেদীন, দফতর সম্পাদক আব্দুল্লাহ ছাকিব, মারকাযের শিক্ষক মাওলানা আফযাল হোসাইন, মুহাম্মাদ লতীফুর রহমান ও তানযীল আহমাদ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফকে সভাপতি ও মুস্তাক্বীম আহমাদকে সাধারণ সম্পাদক করে মারকায এলাকা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

বগুড়া ৭ই মার্চ শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে শহরের সাবগ্রাম চৌরাস্তা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আব্দুর রায্যাককে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আবুবকরকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২-১৩ মার্চ বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ১২-১৩ই মার্চ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের সমন্বয়ে দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ নওদাপাড়া, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, এ প্রশিক্ষণ হ'ল দেশে প্রচলিত জাহেলিয়াতগুলো বুঝে তা থেকে যুবসমাজকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনার প্রশিক্ষণ। আর এজন্য আমাদের লেখা বই ও আত-তাহরীকের সম্পাদকীয়গুলি গভীর মনোযোগে পড়তে হবে। তিনি যুবসংঘের সদস্যদের স্ব স্ব এলাকায় ফিরে গিয়ে উপযেলা, এলাকা ও শাখা সমূহে অত্র প্রশিক্ষণ ছড়িয়ে দেবার আহ্বান জানান।

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা

নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি জামীলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। দু'দিনব্যাপী উক্ত প্রশিক্ষণ ১২ই মার্চ সকাল সাড়ে ৬-টায় শুরু হয়ে ১৩ই মার্চ শুক্রবার জুম'আ পর্যন্ত চলে।

মুযাফফর বিন মুহসিনের যামিনে মুক্তি লাভ

দীর্ঘ ৪ মাস ২দিন মিথ্যা মামলায় কারা নির্যাতন ভোগের পর গত ৮ই মার্চ রবিবার হাইকোর্ট থেকে যামিন পেয়ে পরদিন ৯ই মার্চ সোমবার রাত ৮-টার সময় গাযীপুরের কাশিমপুর-১ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মুযাফফর বিন মুহসিন। জেল গেইটে তাকে অভ্যর্থনা জানান 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসীবুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মাদ ইবরাহীম (ঢাকা) ও জনাব রিয়াযুল ইসলাম (ঢাকা) প্রমুখ। জেল গেইট থেকে বের হয়ে তিনি সাথীদের সাথে কুশল বিনিময়ের পর জনাব ইবরাহীম ছাহেবের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ঢাকার ভাসানটেকে তার বাসায় গমন করেন। সেখানে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব আলমগীর হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হুমায়ুন কবীর সহ অনেকে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এদিকে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মেহেরপুর থেকে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার নাইটকোচ যোগে ঢাকা রওনা হন। পরদিন সকালে তিনি ভাসানটেকে পৌঁছে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মাহফূযুল ইসলাম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ শরীফুদ্দীন ভূঁইয়া সহ আরও অনেকে সেখানে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর সেখান থেকে মাইক্রো যোগে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ তাকে নিয়ে সকাল ১০-টায় রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

পথিমধ্যে সিরাজগঞ্জের কড্ডার মোড়ে স্থানীয় মিন্টু চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে তার বাসায় কিছু সময় যাত্রা বিরতির পর বিকাল ৫-টায় তারা রাজশাহী মারকাযে পৌঁছেন। রাজশাহী পৌঁছলে মারকাযের শিক্ষক-ছাত্রসহ বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ তাকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি প্রথমে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর পশ্চিম পার্শ্বের মসজিদে অপেক্ষমাণ শিক্ষক, ছাত্র এবং রাজশাহী যেলা ও মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মী ও দায়িত্বশীলদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সেখানে গমন করেন। সেখানে সমবেত সুধীদের উদ্দেশ্যে তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণে জেলখানার স্মৃতি তুলে ধরেন। এ সময়ে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, বিপদে মুমিনের ঈমানের পরীক্ষা হয়। এ পরীক্ষায় ধৈর্য্যধারণ করলে এবং আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট থাকলে অশেষ নেকী লাভ হয়। অতএব তার এই কারাবরণ যেন পরকালীন মুক্তির অসীলা হয়, তিনি সেই দো'আ করেন।

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী ও মারকাযের শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও মারকাযের তরুণ শিক্ষক নূরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, গত ৭ই নভেম্বর শুক্রবার বাদ জুম'আ ঢাকার মুহাম্মাদপুর আল-আমীন জামে মসজিদে খুৎবা দিয়ে ছালাত শেষে বের হবার পর ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের দু'জন কর্মকর্তা জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে মুযাফফর বিন মুহসিনকে নিয়ে যায়। অতঃপর ২দিন ডিবি কার্যালয়ে আটকে রাখার পর অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তদের হাতে নিহত 'চ্যানেল আই'-এর উপস্থাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারুকী হত্যা মামলায় সন্দেহ ভাজন আসামী হিসাবে গ্রেফতার দেখায়।

পুরস্কার বিতরণী ও আলোচনা সভা

রাজশাহী ১৪ই মার্চ শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী যেলার পবা থানাধীন ভূগরইল শাখার উদ্যোগে স্থানীয় সানবীম একাডেমী মিলনায়তনে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা-২০১৫ এর পুরস্কার বিতরণী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন ও অর্থ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক মুকাম্মাল হোসাইন, ভূগরইল শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রবীউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আকমাল হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নাজীদুল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, গত ১৩ই মার্চ শুক্রবার বিকাল ৪-টায় ভূগরইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পূর্ব থেকে সরবরাহকৃত প্রায় ৮ শত প্রশ্নোত্তর সম্বলিত 'জাগ্রত প্রতিভা' বুকলেট-এর উপরে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থী উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপড়া, রাজশাহীর ৮ম শ্রেণীর ছাত্র মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। ২য় স্থান অধিকার করে একই প্রতিষ্ঠানের ৭ম (খ) শ্রেণীর ছাত্র মুহাম্মাদ এমদাদুল হক। ৩য় স্থান অধিকার করে রহনপুর ইউসুফ আলী কলেজ, চাঁপাই নবাবগঞ্জের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র জুয়েল রাণা। ১ম স্থান অধিকারীকে নগদ ১৫০০/= টাকা ও ৫০০ টাকার বই, ২য় স্থান অধিকারীকে নগদ ১০০০/= টাকা ও ৪০০ টাকার বই এবং ৩য় স্থান অধিকারীকে নগদ ৫০০/= টাকা ও ৩০০ টাকার বই পুরস্কার হিসাবে প্রদান করা হয়। এছাড়া ক্রমানুযায়ী ১১ জনকে বিশেষ পুরস্কার এবং অংশগ্রহণকারী সকলকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৪১) : রাসূল (ছাঃ)-এর কবর কারা খুঁড়েছিলেন?

-রায়হান ইউসুফ ছিয়াম,বগুড়া।

উত্তর : ছাহাবী আবু ত্বালহা আনছারী (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একদল ছাহাবী তাঁর জন্য 'লাহাদ' কবর খনন করেন *(আহমাদ হা/৩৯, ১২৪৩৮; ইবনু মাজাহ হা/১৫৫৭, আল-বিদায়াহ ৫/২৬৭)*।

প্রশ্ন (২/২৪২) : সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত শুনাতে হবে কি? না কেবল আযান শুনালেই যথেষ্ট হবে?

-আশরাফ আলী, হুগলী, ভারত।

উত্তর : সদ্য ভুমিষ্ট সন্তানের ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত শুনানোর হাদীছটি মওযূ' বা জাল *(মুসনাদে আবী ইয়া'লা, সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২১)*। এক্ষণে 'কেবল আযান দেওয়া' সম্পর্কিত হাদীছটি শায়খ আলবানী (রহঃ) ইতিপূর্বে 'হাসান' *(আবুদাউদ হা/৫১০৫, ইরওয়া হা/১১৭৩)* হিসাবে গণ্য করলেও পরবর্তীতে তিনি এটিকে 'যঈফ' হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, আমি ইতিপূর্বে আবু রাফে' বর্ণিত এ হাদীছটি 'হাসান' বললেও এখন আমার নিকটে বর্ণনাটি যঈফ হিসাবে স্পষ্ট হয়েছে *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১২১)*। তিনি বলেন, ...অতএব আমি সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের কানে আযান দেওয়ার বিধান সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে ফিরে আসলাম *(আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, অডিও ক্লিপ নং ৬২৩)*। এ ব্যাপারে অপর মুহাক্কিক শু'আইব আরনাউত্বও ঐক্যমত পোষণ করেছেন *(তাহকীক মুসনাদে আহমাদ হা/২৭২৩০)*। অতএব 'যঈফ' হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার পর আযান দেওয়ার বিষয়টি আর আমলযোগ্য থাকে না।

সংশোধনী : ইতিপূর্বে মাসিক আত-তাহরীকের বিভিন্ন সংখ্যার প্রশ্নোত্তর কলামে *(এপ্রিল ২০০০ (১/১৮১), জুন'০৩ (১০/৩১৫), মার্চ'০৫ (২/২০২)* উক্ত হাদীছের ভিত্তিতে আযান দেওয়ার বিষয়টি জায়েয হিসাবে বলা হয়েছিল। এক্ষণে তা যঈফ হিসাবে প্রমাণিত হওয়ায় আমরা পূর্বের ফৎওয়া থেকে ফিরে আসছি। অতএব এ থেকে বিরত থাকাই কর্তব্য হবে।

প্রশ্ন (৩/২৪৩) : অনেক মসজিদে দেখা যায় মিহরাবের দু'পাশে বা ভিতরে কা'বা শরীফ অথবা মসজিদে নববীর মিনারের ছবি লাগানো থাকে। এটা শরী'আতসম্মত কি?

-রশীদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম।

উত্তর : এটা শরী'আতসম্মত নয়। মসজিদে কোনরূপ সাজ-সজ্জা ও জাঁকজমক না করা এবং মুছল্লীর দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারে এরূপ যাবতীয় বস্তু মসজিদ থেকে সরিয়ে ফেলা আবশ্যক *(বুখারী হা/৫৯৫৯; মিশকাত হা/৭৫৮, ৭৫৭; আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৭১৮-১৯)*। অনেকে কেবল ভক্তি-ভালোবাসা দেখানোর উদ্দেশ্যে ক্বিবলার দিকে কা'বা ও মাসজিদুল হারাম অথবা মসজিদে নববীর মিনারের ছবি ব্যবহার করে থাকেন এবং এমন আকুতি পেশ করে থাকেন যেন স্বয়ং কা'বাই পূজনীয়। অথচ ক্বিবলা নির্দেশক এবং আল্লাহ্র ঘর হওয়া ব্যতীত কা'বার নিজস্ব কোন মর্যাদা নেই। আল্লাহ্র সামনে সিজদা করার জন্য আল্লাহ্র নির্দেশেই মুসলমান কা'বাগৃহের অভিমুখী হয়। অতএব পূজার বস্তুর ন্যায় ক্বিবলার দিকে কা'বার ছবি রাখা গর্হিত কাজ।

প্রশ্ন (৪/২৪৪) : জুম'আর ছালাতের পর ছয় রাক'আত সুন্নাত আদায়ের বিষয়টি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

-যার্রাফ যারীফ, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর : জুম'আর ছালাতের পর দুই, চার বা ছয় রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) জুম'আর ছালাতের পরে তাঁর বাড়িতে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন *(আবুদাউদ হা/১১৩২)*। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন জুম'আর ছালাত আদায় করবে তখন সে যেন তার পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে *(মুসলিম হা/৮৮১; মিশকাত হা/১১৬৬)*। ছয় রাক'আতের সমর্থনে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-এর আমল পাওয়া যায়। তারা জুম'আর ছালাতের পর প্রথমে দু'রাক'আত, এরপর চার রাক'আত আদায় করতেন এবং আদায়ের নির্দেশ দিতেন *(তিরমিযী হা/৫২৩; মিশকাত হা/১১৮৭)*। অতএব জুম'আর পর দুই, চার ও ছয় রাক'আত সুন্নাত ছালাত রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্ন (৫/২৪৫) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, একজন আহলেহাদীছ ফাসেক একজন শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত আবেদের চেয়ে বহুগুণ উত্তম। এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

*-চঞ্চল মাষ্টার**
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।
**[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : উক্ত বক্তব্যটি যথার্থ। কারণ একজন আহলেহাদীছ ফাসেক যত বড় গুনাহেই লিপ্ত হৌক না কেন সাধারণতঃ সে শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত হয় না। আর শিরক একটি অমার্জনীয় পাপ। যা থাকলে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দেন *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা শিরক ব্যতীত অন্য সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার নিকট ক্ষমার আশা রাখো এবং ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। ... তুমি যদি পৃথিবী

পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার নিকটে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে আমার সামনে আস, তাহ'লে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে উপস্থিত হব' *(তিরমিযী হা/৩৫৪০; মিশকাত হা/২৩৩৬)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে, তা প্রত্যাখ্যাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*। তিনি বলেন, ইসলামে প্রত্যেক নবোদ্ভূত বস্তু হ'ল বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম হ'ল জাহান্নাম' *(নাসাঈ হা/১৫৭৮)*।

বিদ'আতী কিয়ামতের দিন হাউয কাওছারের পানি পাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, দূর হও! দূর হও! যে ব্যক্তি আমার পরে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭১)*। অথচ অন্যান্য বড় পাপে জড়িত মুসলিমরা রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আতের অন্ত র্ভুক্ত হবে *(আবুদাউদ হা/৪৭৩৯; তিরমিযী হা/২৪৩৫, ইবনু মাজাহ হা/৪৩১০)*। জেনে-শুনে বিদ'আতকারীর কোন আমল গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না সে তওবা করে ফিরে আসে' *(বুখারী হা/৩১৭২; মুসলিম হা/১৩১৭; মিশকাত হা/২৭২৮, ত্বাবারাণী, ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৪)*।

প্রশ্ন (৬/২৪৬) : খেলাধুলার সামগ্রী যেমন ব্যাট, ফুটবল, লাটিম ইত্যাদি বিক্রয়ের দোকান করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-গোলাম রব্বানী,
ভোলাহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : নির্দোষ বিনোদন ও খেলাধুলার জন্য এসবের ব্যবহার ও ক্রয়-বিক্রয়ে কোন বাধা নেই। যদিও ব্যবহারকারীর মন্দ ব্যবহারের জন্য কখনো কখনো এসব খেলা হারামের পর্যায়ে চলে যায়। তবে তার জন্য ব্যবহারকারী দায়ী হবে, উক্ত সামগ্রী নয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (৭/২৪৭) : ওয়ায়ের কি নবী ছিলেন? নবী না হলে তিনি কোন নবীর আমলে দুনিয়ায় ছিলেন? এছাড়া কওমে তুব্বা' কোন নবীর কওম? বিস্তারিত জানতে চাই।

-আব্দুল ওয়ারেছ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : এ বিষয়ে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, ওযায়ের এবং তুব্বা' উভয়েই সৎ ব্যক্তি ছিলেন এবং তুব্বা দ্বীনে ইবরাহীমের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি জানি না তুব্বা' মাল'উন (অভিশপ্ত কাফের) ছিল কি না? আমি আরো জানি না যে, ওযায়ের নবী ছিলেন কি না? *(আবুদাউদ হা/৪৬৭৪)*। তিনি বলেন, তোমরা তুব্বা' কে গালি দিয়ো না। কারণ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪২৩)*। অর্থাৎ ইবরাহীমের দ্বীন কবুল করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, জঙ্গলবাসীরা ও তুব্বার কওম সবাই রাসূলদের মিথ্যা বলেছিল' *(ক্বাফ ৫০/১৪)*। ক্বাতাদাহ বলেন, এখানে আল্লাহ তুব্বার সম্প্রদায়কে মিথ্যারোপকারী বলেছেন, তুব্বাকে নয় *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ক্বাফ ১৪ আয়াত)*।

প্রশ্ন (৮/২৪৮) : বিভিন্ন সভা-সম্মেলনের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করা কি বিদ'আত? রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এরূপভাবে যেকোন অনুষ্ঠান শুরু হ'ত বলে প্রমাণ পাওয়া যায় কি?

-ডা. মোশাররফ হোসাইন
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কোন সভা-সম্মেলন শুরু করায় কোন বাধা নেই। তবে সর্বপ্রথম হামদ ও ছানা পাঠ করতে হবে *(আহমাদ হা/১৫২৬, ছহীহাহ হা/১৬৯)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم إذا جلسوا كان حديثهم يعني الفقه إلا أن يقرأ رجل سورة أو يأمر رجلا بقراءة سورة 'ছাহাবায়ে কেরাম যখন কোন আলোচনা তথা ফিক্বহী আলোচনার মজলিসে বসতেন তখন তাদের মধ্যে একজন কোন সূরা পাঠ করতেন অথবা একজনকে কুরআনের কোন একটি সূরা পাঠ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হ'ত *(হাকেম হা/৩২২, যাহাবী, সনদ ছহীহ, বায়হাক্বী, আল-মাদখাল হা/৩১৩; ইবনু সা'দ ২/৩৭৪)*।

খত়ীব বাগদাদী, ইবনুছ ছালাহ, ইবনু কাছীর, ইমাম নববী, সৈয়ূতী সহ অনেক ওলামায়ে সালাফ যেকোন মজলিস শুরুর পূর্বে হামদ ও ছানাসহ কুরআন তেলাওয়াতকে মুস্তাহাব বলে আখ্যায়িত করেছেন *(খত়ীব বাগদাদী, আল-জামে' ২/৬৮; মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ ২২৪ পৃঃ, ইবনু কাছীর, আল-বা'এছুল হাছীছ ১৫৩ পৃঃ, সৈয়ূতী তাদরীবুর রাবী ২/৫৭৩)*।

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, কুরআনের কিছু অংশ তেলাওয়াত করার মাধ্যমে মজলিস শুরু করার বিষয়টি সালাফে ছালেহীনের আমল দ্বারা প্রমাণিত *(আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, অডিও ক্লিপ নং ৪০২)*।

কোন কোন আলেম এভাবে তেলাওয়াত করার বিষয়টি দলীল বিহীন আখ্যায়িত করেছেন *(ওছায়মীন, আল-বিদউ ওয়াল মুহদাছাত ৫৪০ পৃঃ)*। কেউ কেউ এটাকে বিদ'আত বলে ১৩৪২ হিজরীর পূর্বে এর অস্তিত্ব ছিল না বলেছেন *(শায়খ বকর আবু যায়েদ, তাছহীহুদ দো'আ ৯৮ পৃঃ, ফাতাওয়া আব্দুর রাযযাক আফীফী ২২১ পৃঃ)*। যা আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত উপরোক্ত আছারটি দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন (৯/২৪৯) : আমাদের মসজিদের কিছু মুছল্লী মাঝে মাঝে ছালাতের পর বাড়ি ও দোকানে গিয়ে গিয়ে ছহীহ দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করেন। যা তাবলীগ জামা'আতে ভাইদের আমলের সাথে মিলে যায়। এক্ষণে এটি জায়েয হবে কি?

মুর্তাযা, টাঙ্গাইল।

উত্তর : বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের দাওয়াত মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ায় জন্য এরূপ পন্থা অবলম্বন করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। তা তাবলীগ জামা'আতের সাথে বা অন্য

কোন বাতিল দলের ভাল কাজের সাথে মিলে গেলেও তাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে দাঈকে স্থান-কাল-পাত্র বুঝে প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াত দিতে হবে। সেই সাথে যে বিষয়ে দাওয়াত দিবেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, 'তুমি হিকমত (কুরআন ও সুন্নাহ) ও উত্তম নছীহতের সাথে আল্লাহর পথে দাওয়াত দাও এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়' *(নাহল ১৬/১২৫)*। তিনি বলেন, 'বলুন! এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্‌র দিকে, জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

প্রশ্ন (১০/২৫০) : জামা'আত চলাকালীন সময়ে পিছনের কাতারে একাকী হয়ে গেলে সামনের কাতার থেকে কাউকে টেনে আনতে হবে কি?

-হান্নান সরকার
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : এমতাবস্থায় পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবেন। সামনের কাতার থেকে টেনে নেওয়া মর্মে বর্ণিত হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ *(ত্বাবরাণী আওসাত্ব হা/৭৭৬৪; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/২৫৩৭; যঈফাহ হা/ ৯২১-৯২২;)*। আর সামনের কাতার থেকে টেনে নিলে সে ব্যক্তি কাতারকে বিচ্ছিন্নকারী হিসেবে গণ্য হয়ে আল্লাহর রহমত থেকেও বিচ্ছিন্ন হবে *(আবুদাউদ হা/৬৬৬; মিশকাত হা/১১০২)*। তাছাড়া সামনের কাতার থেকে মুছল্লীকে পেছনে টেনে আনলে কাতারে শূন্যতা সৃষ্টি হয় *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১৩/৩৮)*।

উল্লেখ্য যে, একাকী পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে ছালাত হবে না মর্মে যে হাদীছ রয়েছে *(আবুদাউদ হা/৬৮২; তিরমিযী হা/২৩১; মিশকাত হা/১১০৫)* তা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন সামনের কাতার অপূর্ণ থাকবে । অতএব এরূপ অবস্থায় মুছল্লী কাতারে একাকীই দাঁড়াবে এবং তার ছালাত হয়ে যাবে। কিন্তু সামনের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ একাকী পেছনের কাতারে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে তার ছালাত হবে না *(ইরওয়া হা/৫৪১-এর আলোচনা দ্রঃ, ২/৩২৯)*।

প্রশ্ন (১১/২৫১) : ফরয ছালাতের পর নিয়মিত ১টি হাদীছ শুনাতে গেলে মাসবূক ব্যক্তিদের ছালাতে বিঘ্ন ঘটে। অন্যদিকে দেরী করলে মুছল্লীরা চলে যায়। এক্ষণে মাসবূক ছালাতরত অবস্থায় মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে কথা বলার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-আব্দুল আলীম, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : মাসবূকের ছালাত শেষ হওয়ার পর হাদীছ শুনানোই উত্তম। কোন কারণে বিশেষভাবে ব্যস্ত না হ'লে ঈমানদার শ্রোতা কখনোই হাদীছ না শুনে উঠে যাবে না।

প্রশ্ন (১২/২৫২) : সূরা আর রহমানে দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

-আলমগীর হোসাইন, ফকিরাপুল, ঢাকা।

উত্তর : এর দ্বারা গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে পৃথক দু'টি করে উদয়াচল ও অস্তাচল বুঝানো হয়েছে। অন্য আয়াতে 'বহু পূর্বের ও পশ্চিমের রব' *(মা'আরেজ ৭০/৪০)* বলা হয়েছে। এর দ্বারা সূর্যের সদা পরিবর্তনশীল উদয়াচল ও অস্তাচলের কথা বলা হয়েছে। কেননা সূর্য নিজের কক্ষপথে সদা সন্তরণশীল *(ইয়াসীন ৩৬/৩৮)*। যা আল্লাহ্‌র হুকুমে বান্দার কল্যাণে সর্বদা নিয়োজিত। এর মধ্যে সৌর বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩) : জনৈক ব্যক্তি কারু নিকট থেকে অর্থ ঋণ গ্রহণ করলে ফেরত দেওয়ার সময় কিছু বেশী প্রদান করেন। এরূপ দেওয়া বা নেওয়া শরী'আতসম্মত হবে কি?

-তৌফীকুল ইসলাম, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ঋণ গ্রহণকারী ঋণ পরিশোধের সময় কোন পূর্বশর্ত ছাড়াই স্বেচ্ছায় যদি কিছু বেশী প্রদান করে, তবে তা দেওয়া এবং গ্রহণ করা জায়েয। জাবের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আগমন করলাম। এমতাবস্থায় তিনি মসজিদে ছিলেন....। তিনি আমাকে আমার পাওনা পরিশোধ করলেন এবং কিছু বেশী দিলেন *(বুখারী হা/২৩০৫, মুসলিম হা/১৬০১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, জনৈক ব্যক্তি উট ঋণ নিয়ে পরবর্তীতে পরিশোধের সময় তার চেয়ে দামী উট ব্যতীত তার নিকটে ছিল না। অতঃপর সে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সেটা দ্বারাই ঋণ পরিশোধ কর। তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করে *(বুখারী হা/২৩৯০; মুসলিম হা/১৬০১; মিশকাত হা/২৯০৬)*। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঋণ গ্রহীতা স্বেচ্ছায় কিছু বেশী দিলে দিতে পারে এবং গ্রহীতাও তা নিতে পারে। তবে এক্ষেত্রে গ্রহীতা যদি বেশী পাওয়ার সুপ্ত কামনাও রাখে, তাহলে তা সূদে পরিণত হবে *(বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৬, সনদ মওকূফ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৪/২৫৪) : রোগমুক্তি বা পরীক্ষায় ভালো করার আশায় কুরআন তেলাওয়াত, দান-ছাদাক্বা, ছিয়াম ইত্যাদি পালন করা যাবে কি?

-হুমায়ূন, শিবগঞ্জ, সিলেট।

উত্তর : এতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। এগুলোর সাথে সাথে আল্লাহর কাছে তাওফীক কামনা করে দো'আ করবে। নেক আমল মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে *(তিরমিযী হা/২১; মিশকাত হা/২২৩৩; ছহীহাহ হা/১৫৪)*। ছাদাক্বাকে চিকিৎসার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা যায় *(ছহীহুল জামে' হা/৩৩৫৮)* তবে এ ক্ষেত্রে মানত করা ঠিক নয়। কারণ মানত কৃপণতা থেকে বের করা ছাড়া তাকদীরের কোন কিছু প্রতিহত করতে পারে না *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৬; আবুদাউদ হা/৩২৮৭)*। তবে কেউ মানত মানলে যদি তা আল্লাহর নাফারমানীর ক্ষেত্রে না হয় তাহলে পূর্ণ করা ওয়াজিব। পূর্ণ না করলে তাকে কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে *(তিরমিযী হা/১৫২৪, ১৫২৫; নাসাঈ হা/৩৮৩৪; আবুদাউদ হা/৩২৯০;মিশকাত হা/৩৪২৮, ৩৪৩৫)*।

প্রশ্ন (১৫/২৫৫) : বাসায় স্ত্রীর কাজকর্মে সহায়তার জন্য কাজের মেয়ে রাখার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি? সঊদী আরবে সরকারীভাবে খাদেমা নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এভাবে মাহরাম বিহীন সেখানে অবস্থান করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

মীযানুর রহমান
বড়পেটা, আসাম, ভারত।

উত্তর : বাসার কাজের জন্য কাজের মেয়ে রাখতে শরী'আতে বাধা নেই। তবে শর্ত হচ্ছে বালেগা হ'লে বাড়ীর পুরুষ সদস্যদের তার সামনে পূর্ণরূপে পর্দা করতে হবে এবং মনিবের সাথে তার স্ত্রী কিংবা মা-বোন কাউকে থাকতে হবে। কারণ পর-পুরুষের সাথে গায়ের মাহরাম নারীর একাকী হওয়া নিষিদ্ধ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১৩; তিরমিযী হা/২১৬৫)*। সঊদীআরবে বা অন্যান্য দেশে সরকারীভাবে যেসব গৃহকর্মী পাঠানো হচ্ছে তা চরম অন্যায়। কারণ প্রথমতঃ মাহরাম ছাড়া এরূপ বিদেশ ভ্রমণ নারীদের জন্য হারাম' *(বুখারী হা/১৮৬২ ;মুসলিম হা/১৩৩৮, মিশকাত হা/২৫১৩)*। দ্বিতীয়তঃ স্বামী-সন্তানের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বিদেশে অবস্থান করা নারী জাতির প্রকৃতি ও দায়িত্বের বিরোধী। কারণ নিজ গৃহে অবস্থান করা ও ঘর-সংসার করাই তার প্রধানতম কর্তব্য *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। তৃতীয়তঃ বিদেশে নারীর ইযযতের কোন নিশ্চয়তা নেই। অতএব প্রত্যেক নারীর জন্য এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬) : নবী-রাসূল, ছাহাবায়ে কেরাম বা অন্য কোন মানুষের নামের পূর্বে হযরত, জনাব ইত্যাদি শব্দটি ব্যবহার করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-মবীনুল ইসলাম
উপশহর, রাজশাহী।

উত্তর : حضرة 'হযরত' আরবী শব্দ, পুংলিঙ্গ। অর্থ নৈকট্য, নেতা, জনাব, সম্মানসূচক উপাধি। جناب 'জনাব' আরবী শব্দ, উভয় লিঙ্গ। অর্থ সম্মানিত ব্যক্তি, আশ্রয়স্থল ইত্যাদি *(ফীরোযুল লুগাত (উর্দূ)*। সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁদের নামের শুরুতে 'হযরত', 'জনাব' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যেমন, হযরতুল উস্তায/আদ-দাকতূর, হযরতুল মুহতারাম ইত্যাদি' *(মু'জামুল লুগাতিল আরাবিইয়াহ আল-মু'আছারাহ ১/৪০১, ৫১৪)*। আরবী ভাষায় 'হযরত' শব্দের ব্যবহার বহু পূর্ব থেকেই চালু আছে। যেমন ইমাম যাহাবী, হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্বোধনের ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহার করেছেন *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৫৫২, আল-বিদায়াহ ১৩/২৬১)*।

বস্তুতঃ প্রত্যেক দেশের প্রচলিত সর্বোচ্চ সম্মানসূচক শব্দ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন আরব দেশে উপনাম দিয়ে ডাকাকে সম্মানসূচক মনে করা হ'ত। যেমন, আবুল ক্বাসেম, আবু হুরায়রা, আবু হাফছ ইত্যাদি। বর্তমানে সেখানে শায়খ, সাইয়েদ, বহুবচনে সাদাত, সাইয়েদাত ইত্যাদি বলা হয়। এছাড়া ইংরেজীতে ইয়োর অনার, হিজ ম্যাজেস্টী, ইয়োর এক্সেলেন্সী এবং জাপানে 'সান', 'সামা', 'চ্যান' ইত্যাদি। একইভাবে উপমহাদেশে জনাব, হযরত, হুযুর, মাওলানা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়।

আল্লাহ পরস্পরকে মন্দ লকবে ডাকতে নিষেধ করেছেন *(হুজুরাত ৪৯/১১)*। অতএব প্রচলিত উত্তম লকব সমূহে আহ্বান করায় কোন দোষ নেই। তবে যদি কেউ এর দ্বারা মন্দ অর্থ গ্রহণ করেন, সেজন্য তিনি দায়ী হবেন। যেমন, মদীনায় মুসলমানরা রাসূল (ছাঃ)-কে 'রা'এনা' বলতেন *(বাক্বারাহ ২/১০৪)*। কিন্তু ইহূদীরা সেটা বলত গালি অর্থে। মুসলমানরা 'রব' বলতে আল্লাহকে বুঝেন, কিন্তু ফেরাঊন 'রব' বলতে নিজেকে বুঝিয়েছিল *(নাযে'আত ২৪)*। কুরআনে আল্লাহকে 'মাওলানা' (আমাদের প্রভু) বলা হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/২৮৬, তওবা ৯/৫১)*। কিন্তু বান্দার ক্ষেত্রেও 'মাওলা' বন্ধু বা গোলাম বা অভিভাবক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'মৌলবী' অর্থ দুনিয়াত্যাগী, বড় আলেম ইত্যাদি' *(আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)*।

উপমহাদেশে সম্মানসূচক সম্বোধন হিসাবে 'মাওলানা' (আমাদের অভিভাবক) বলা হয়ে থাকে *(ফীরোযুল লুগাত)*। 'শরীফ' অর্থ সর্বোচ্চ সম্মানিত। সে অর্থে কুরআন শরীফ, কা'বা শরীফ ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। এক্ষণে যদি কেউ শিরকের আড্ডাখানা কোন কবরকে 'শরীফ' বলেন, তার জন্য তিনি দায়ী হবেন। কিন্তু সেজন্য কুরআন শরীফ বলা যাবে না, এমনটি নয়। একইভাবে জনাব, হুযুর, মাওলানা, হযরত ইত্যাদি শব্দ সম্মানসূচক অর্থে ব্যবহার করায় কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭) : অন্যের গাছের নীচে পড়ে থাকা ফল অনুমতি না নিয়ে কুড়িয়ে খাওয়া যাবে কি?

-গোলাম রব্বানী,
ভোলাহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর ঃ অনুমতি নিয়ে খাওয়া যাবে। অনুমতি দেওয়ার মতো কাউকে না পেলে, ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়া পর্যন্ত উক্ত ফল খাওয়া যাবে। কিন্তু বহন করে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন কোন ছাগপালের নিকট আসবে (তখন দুধ পানের উদ্দেশ্যে) তার মনিবের অনুমতি নিবে। যদি সেখানে কেউ না থাকে, তাহ'লে তিনবার আওয়ায দিবে। অতঃপর উত্তর পেলে তার নিকট থেকে অনুমতি নিবে। আর যদি কেউ উত্তর না দেয়, তাহলে দুধ দোহন করবে ও পান করবে। কিন্তু বহন করে নিয়ে যাবে না' *(আবুদাঊদ হা/২৬১৯; মিশকাত হা/২৯৫৩)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ক্ষুধা নিবারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খেতে পারবে।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮) : গোসলখানা ও টয়লেট একত্রে থাকলে সেখানে ওযূ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-আশরাফুল ইসলাম
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাযীপুর।

উত্তর : গোসলখানা ও টয়লেট একত্রে থাকলেও যদি ওযূ করার স্থানে অপবিত্র বস্তু ছড়িয়ে না থাকে, তাহ'লে সেখানে ওযূ করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই *(ফাতওয়া লাজনা-দায়েমাহ ৫/৮৫; মাজমূ' ফাতাওয়া উছায়মীন ১২/৩৬৯)*।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯) : জনৈক ইমাম ছালাতের সময় কারো টাখনুর নীচে কাপড় দেখলে পুনরায় ওযূ করে আসতে বলেন। এটা কি ছহীহ হাদীছ সম্মত?

-আব্দুল কাদের, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। বর্ণনাটি হ'ল- আত্বা ইবনু ইয়াসির (রাঃ) জনৈক ছাহাবী হ'তে বর্ণনা করেন যে, একদা এক ব্যক্তি টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে ছালাত আদায় করছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, যাও ওযূ কর। তাই সে গেল এবং ওযূ করে আসল। তখন অপর এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি তাকে কেন ওযূ করতে বললেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে ছালাত আদায় করে, আল্লাহ তার ছালাত কবুল করেন না *(আবুদাঊদ হা/৪০৮৬, আহমাদ হা/২৩২৬৫, মিশকাত হা/৭৬১, সনদ যঈফ)*। হাদীছটি যঈফ হওয়ার কারণে ইমাম ছাহেবের এরূপ নির্দেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। বরং তিনি ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী এ সম্পর্কে সতর্ক করবেন যে, ছালাত ও ছালাতের বাইরে কোন অবস্থাতেই টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা যাবে না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'টাখনুর নীচে কাপড়ের যতটুকু যাবে, ততটুকু জাহান্নামে পুড়বে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪)*।

প্রশ্ন (২০/২৬০) : যেখানে রাসূল (ছাঃ) অমুসলিম দেশে কুরআন নিয়ে গমন করতে নিষেধ করেছেন সেখানে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইতালিয়ানদেরকে কুরআনের অনূদিত কপি উপহার দেওয়া যাবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
বলোনিয়া, ইতালী।

উত্তর : কুরআনের অনূদিত কপি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের উপহার দেওয়া যাবে। অমুসলিমদের জন্য কুরআন শ্রবণ, কুরআনের তাফসীর বা অনুবাদ সহ কুরআন স্পর্শ করে পড়ায় কোন বাধা নেই *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ২৪/৩৪০)*। রাসূল (ছাঃ) কুরআনের আয়াত সম্বলিত পত্র অমুসলিম শাসকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন' *(বুখারী হা/০৭, ১৯; মুসলিম হা/১৭৭৩; মিশকাত হা/৩৯২৬)*। তবে আরবী মূল মুছহাফ তাদেরকে দেওয়া যাবেনা। কেননা তা স্পর্শ করা মুশরিকদের জন্য জায়েয নয় *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৭৯; ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৭৭৮০)*।

প্রশ্ন (২১/২৬১) : ত্বক ফর্সা করার জন্য ছেলেরা বিভিন্ন ধরনের স্নো, ক্রীম ইত্যাদি প্রসাধনী ব্যবহার করতে পারবে কি?

-আব্দুল্লাহ
ধুনট, বগুড়া।

উত্তর : মানুষের ত্বক আল্লাহ্র সৃষ্টি এবং প্রকৃতিগত বিষয়, যা ফর্সা বা কালো করার ক্ষমতা মানুষের নেই। এ বিষয়ে যেসব প্রচারণা চালানো হয় সেগুলো পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীদের অপপ্রচার মাত্র। এগুলো করতে গিয়ে অনেকে ত্বকের নানা রোগের শিকার হয়। এমনকি এর ফলে ত্বকের ক্যানসারও হ'তে পারে। তবে দেহকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮ 'ক্রোধ ও গর্ব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২২/২৬২) : জনৈক আলেম বলেন, ছালাতের সালাম ফিরানোর পর আল্লাহু আকবার বলা যাবে না। বরং আসতাগফিরুল্লাহ বলতে হবে। একথা ঠিক কি?

-রায়হান
খয়রাবাদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত কথা সঠিক নয়। বরং সালাম ফিরানোর পরে একবার সরবে 'আল্লাহু আকবার' এবং তিনবার 'আস্ত াগফিরুল্লাহ' বলাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী ফাৎহসহ হা/৮৪১-৪২; মুসলিম হা/৫৮৩; মিশকাত হা/৯৫৯)*।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩) : কোন মুসলিম ব্যক্তির মাঝে কুফরী, মুনাফেকী ও শিরকী কার্যক্রম দেখতে পেলে তাকে কাফের, মুনাফিক বা মুশরিক নামে ডাকা যাবে কি?

-তালীম হোসাইন প্রধান
পাটগ্রাম, লালমণিরহাট।

উত্তর : কোন মুসলিমের মধ্যে এরূপ দেখতে পেলে তাকে মুশরিক বা কাফের বলে ডাকা যাবে না। আল্লাহ বলেন, তোমরা কাউকে মন্দ লকবে ডেকো না'... *(হুজুরাত ৪৯/১১)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ক্বাতাদাহ বলেন, এর অর্থ হ'ল, কাউকে হে মুনাফিক, হে ফাসেক ইত্যাদি বলে ডাকা যাবে না' *(বায়হাক্বী শু'আব হা/৬৭৪৮, কুরতুবী, তাফসীর হুজুরাত ১১ আয়াত)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যাকে কাফের বলা হবে সে সত্যিকারে কাফের না হ'লে যে কাফের বলল তার দিকেই সেটা ফিরে আসবে *(মুসলিম হা/৬০; বুখারী হা/৬১০৩)*। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার (মুসলিম) ভাইকে কাফের বলাটা তাকে হত্যা করার মত অপরাধ *(বুখারী হা/৬০৪৭; মিশকাত হা/৩৪১০)*। তবে কাউকে এরূপ কাজ করতে দেখলে, তোমার এ কাজটি কুফরী পর্যায়ভুক্ত বা তোমার মধ্যে মুনাফিকের এই আলামতটা দেখা যাচ্ছে এরূপ বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪) : হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশুনা শেষে সূদী কারবারের কারণে ব্যাংকে চাকুরী করতে পারছে না। এক্ষণে হিসাব বিভাগের সাথে জড়িত শরী'আত অনুমোদিত কোন কোন ক্ষেত্রে চাকুরী করা যেতে পারে?

-ওমর বিন হুসাইন
বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া।

উত্তরঃ ইসলামী নীতির বিরোধী নয় এরূপ দেশী-বিদেশী যেকোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে পারেন। ব্যাংক, বীমা এবং যেসব এনজিও সমাজ সেবার আড়ালে ক্ষুদ্র ঋণের নামে সূদী কারবার, ধর্মান্তরকরণ, নারীর পর্দাহীনতা, একসন্তান নীতি প্রভৃতি ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখছে, সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। কেননা গুনাহের কাজে সহায়তা করা নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (২৫/২৬৫) : রাসূল (ছাঃ)-এর শরীর থেকে নির্গত ঘাম সংরক্ষণ করে জনৈক ছাহাবী তার কবরে নাজাতের জন্য কাফনের কাপড়ে লাগিয়ে দিতে বলেছিলেন মর্মে বক্তব্যটির কোন সত্যতা আছে কি?

Contents

-হাসনা হেনা
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : কথাটি ভিত্তিহীন। রাসূল (ছাঃ)-এর শরীরের ঘামের মাধ্যমে নাজাত নয় বরং নাজাতের জন্য প্রয়োজন তাঁর আনুগত্য এবং সেমতে তাঁর আদেশ ও নিষেধ সমূহ মেনে চলা। রাসূল (ছাঃ)-এর শরীর থেকে যে ঘাম নির্গত হ'ত তা ছিল সবচেয়ে সুগন্ধিময়' *(মুসলিম হা/২৩৩১)*। সেকারণ রাসূল (ছাঃ)-এর খালা উম্মে সুলায়েম (রাঃ) একবার তাঁর ঘাম সুগন্ধি এবং বরকত হিসাবে নিয়েছিলেন *(মুসলিম হা/২৩৩১, মিশকাত হা/৫৭৮৮)*। এছাড়া অন্য কোন ছাহাবী এরূপ করেছিলেন বলে জানা যায় না।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬) : মামা বা চাচা মারা গেলে অথবা মামী বা চাচীকে তালাক দিলে ঐ মামী বা চাচীকে তার ভাগ্নে বা ভাতিজা বিবাহ করতে পারবে কি?

-রেযওয়ান
জামগড়া, বাইপাইল, ঢাকা।

উত্তর : পারবে। কেননা মামী বা চাচী ভাগ্নে বা ভাতিজার জন্য মুহাররামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ যে ১৪ জন মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ৪/২৩)*।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭) : যেসব বিবাহে যৌতুক আদান-প্রদান হয়, সেসব বিবাহ অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে কি?

-তারেক আযীয
রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : এধরনের দাওয়াতে অংশ গ্রহণ না করাই উত্তম। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন, 'ঐসব লোকদের পরিত্যাগ কর যারা তাদের ধর্মকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে *(আন'আম ৬/৭০)*। তবে এতে যেন পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ দাওয়াতের ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক হক-এর অন্তর্ভুক্ত *(নাসাঈ হা/১৯৩৮; মিশকাত হা/৪৬৩০)*। তাছাড়া এর ফলে উপদেশ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তবে যেসব বিবাহ অনুষ্ঠানে গান-বাজনা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা ইত্যাদি প্রকাশ্য শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ড হয়, যার কারণে দাওয়াতপ্রাপ্তদের গুনাহ হয়, সেসব অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করতে হবে *(আবুদাঊদ হা/৪৯২৪)*। যদিও তাতে সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে *(মুসলিম হা/১৮৪০; মিশকাত হা/৩৬৯৬)*।

প্রশ্ন (২৮/২৬৮) : ইসলামী বা সাধারণ ব্যাংক, বিকাশ, এ.টি.এম কার্ড এর মাধ্যমে টাকা-পয়সা লেনদেন করায় সার্ভিস চার্জ দিতে হয়। এক্ষণে এতে কোন বাধা আছে কি?

-মুস্তানতাছির বিল্লাহ
হোসেনীগঞ্জ, রাজশাহী।

উত্তর : এখানে আদান-প্রদানের সার্ভিস চার্জ হিসাবে অতিরিক্ত কিছু অর্থ দিতে হয়। অতএব লেনদেনের উদ্দেশ্যে এসব মাধ্যম ব্যবহারে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২৯/২৬৯) : কা'বাগৃহের কসম খাওয়া যাবে কি?

-ইবরাহীম
কাচারী রোড, দিনাজপুর।

উত্তর : কা'বাগৃহের কসম খাওয়া নিষিদ্ধ। ইবনু ওমর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে কা'বার কসম খেতে শুনে বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করল সে শিরক করল *(আবুদাঊদ হা/৩২৫১ সনদ ছহীহ)*। বরং কা'বার রবের তথা আল্লাহ্র কসম করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন কসম করার ইচ্ছা করে সে যেন বলে, কা'বার রবের কসম *(নাসাঈ হা/৩৭৭৩)*। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পিতাদের নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। অতএব যে কসম খেতে চায়, সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম খায় অথবা চুপ থাকে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪০)*।

প্রশ্ন (৩০/২৭০) : মূসা (আঃ)-এর লাঠি কি তার নিজস্ব ব্যবহৃত লাঠি ছিল? না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছিল?

-সুফিয়া খাতুন
পাঁচদোনা মোড়, নরসিংদী।

উত্তর : মূসা (আঃ)-এর লাঠি তাঁর নিজস্ব ব্যবহৃত লাঠি ছিল। মহান রাব্বুল আলামীন উক্ত লাঠির মাধ্যমেই তাঁর 'মু'জিযা' প্রকাশ করান *(শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর ৩/৩৬১)*। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি?' 'মূসা বললেন, এটা আমার লাঠি। এর উপরে আমি ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে নামাই। তাছাড়া এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও চলে'। 'আল্লাহ বললেন, তুমি ওটা ফেলে দাও'। 'অতঃপর তিনি ওটা (মাটিতে) ফেলে দিতেই তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল'। 'আল্লাহ বললেন, তুমি ওটাকে ধর, ভয় করো না, আমি এখুনি ওকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব' *(ত্বোয়াহা ২০/১৭-২১)*।

প্রশ্ন (৩১/২৭১) : অসুস্থ বা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার সন্তানেরা ক্বাযা ছিয়াম আদায় করতে পারবে কি?

-নাসরীন সুলতানা
কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উত্তর : এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মারা গেল এমতাবস্থায় যে, তার উপর রামাযান মাসের ছিয়ামের ক্বাযা রয়েছে, তার পক্ষ থেকে প্রতি ছিয়ামের বদলে প্রতিদিন একজন করে মিসকীন খাওয়াবে' *(তিরমিযী হা/৭১৮; মিশকাত হা/২০৩৪; মারফূ হিসাবে সনদ যঈফ। তবে মওকূফ হিসাবে ছহীহ)*।

জনৈক ব্যক্তি মারা গেল। যার উপরে রামাযানের অথবা মানতের ছিয়ামের ক্বাযা ছিল। এক্ষণে তার পক্ষে উক্ত ছিয়াম আদায় করতে হবে কি-না এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, কেউ কারু পক্ষে ছিয়াম পালন করবে না এবং কেউ কারু পক্ষে ছালাত আদায় করবে না। বরং

Contents

তোমরা তার পরিত্যক্ত মাল থেকে তার পক্ষে ছিয়ামের বদলে ছাদাক্বা দাও প্রতিদিনের জন্য একজন করে মিসকীন। যার পরিমাণ হ'ল এক মুদ করে গম *(বায়হাক্বী ৪/২৫৪, সনদ ছহীহ)*। এক মুদ হ'ল সিকি ছা' *(ইরওয়া হা/১৩৯, ১/১৭০২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত অপর বর্ণনায় এসেছে, উত্তরাধিকারীরা ছাদাক্বা দিতে পারেন কিংবা ছিয়ামও আদায় করতে পারেন *(বায়হাক্বী ৪/২৫৪)*।

প্রশ্ন (৩২/২৭২) : স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নাকফুল, কানের দুল, রঙিন শাড়ী ইত্যাদি খুলে ফেলে। এগুলি করা শরী'আত সম্মত কি?

-মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : এগুলি কুসংস্কার মাত্র। ইদ্দত কালে তথা চার মাস দশ দিন স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করবে। একান্ত যরূরী প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হবে না। রঙ্গিন বা অধিক সৌন্দর্য প্রকাশক কোন পোষাক পরিধান করবে না। অলঙ্কার ব্যবহার করবে না। বিশেষ কারণ ব্যতীত সুগন্ধি, সুরমা, মেহেদীও ব্যবহার করবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৩১; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৩৩২-৩৪)*। মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীর নাকফুল, কানের দুল, পরিহিত শাড়ী খুলে রাখার রেওয়াজ বাড়াবাড়ি বৈ কিছুই নয়। অন্যদিকে সদ্য বিধবা স্ত্রীকে নতুন শাড়ী উপহার দেওয়াও কুসংস্কার মাত্র।

প্রশ্ন (৩৩/২৭৩) : কোন মহিলা বা পুরুষ লোক মৃত্যুবরণ করার পর কোন কোন পুরুষ বা কোন কোন নারী তাকে দেখতে পারবে?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
চণ্ডিপুর, যশোর।

উত্তর : জীবিত অবস্থায় যাদের দেখা জায়েয মৃত্যুর পরেও তাদের দেখা জায়েয। মূলত মানুষ মারা গেলে একজন মুসলমানের জন্য যরূরী হ'ল তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা, তাকে দেখা নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪৩০)*। প্রচলিত আছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। যার কোন ভিত্তি নেই। এগুলি কুসংস্কার মাত্র।

প্রশ্ন (৩৪/২৭৪) : কবরের শাস্তি কমানোর জন্য কবরের উপর খেজুরের ডাল পুতে দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল জাব্বার,
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : পোতা যাবে না। যারা এরূপ করে থাকেন তারা একটি হাদীছের অনুসরণে এরূপ করে থাকেন। যেমন নবী করীম (ছাঃ) একদিন দু'টি কবরের শাস্তি জানতে পেরে একখানা খেজুরের ডাল দুই টুকরা করে দু'টি কবরে গেড়ে দেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এরূপ করলেন কেন? তিনি বললেন, হয়ত ডাল দু'টি শুকানো পর্যন্ত তাদের শাস্তি হালকা হয়ে থাকবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৮)*। কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ তাদের শাস্তি হালকা হয়েছিল রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষ সুপারিশের জন্য। কাঁচা ডালের জন্য নয়। যা ছহীহ মুসলিমে জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই খেজুরের কাঁচা ডাল বা অন্য কোন কাঁচা ডাল গেড়ে কবরের শাস্তি হালকা হবে বলে ধারণা করা একেবারেই ভ্রান্ত। কেননা যদি বিষয়টি তাই-ই হ'ত তহ'লে তিনি ডালটি চিরে ফেলতেন না। কেননা তাতে তো ডালটি দ্রুত শুকিয়ে যাবার কথা। আসল কারণ ছিল ঐ কবর দু'টিকে ঐ ডাল দ্বারা চিহ্নিত করা যে, তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করেছেন *(আলবানী, মিশকাত ১/১১০ পৃঃ; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল ২৪২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৭৫) : স্বামী স্ত্রীকে মোহরানা পরিশোধ না করে থাকলে সন্তান কি পিতার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দিতে পারবে?

-তাসলিমা আক্তার জুলি
নাচোল, মুরাদপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : স্বামীর জন্য ফরয কর্তব্য হ'ল মোহর পরিশোধ করা *(নিসা ৪, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৪৩)*। জীবিত অবস্থায় মোহর পরিশোধ না করলে মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদ হতে মোহর পরিশোধ করে তারপর বাকী অংশ ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। আর সম্পদ না থাকলে সন্তান বা অন্য যে কেউ তা পরিশোধ করতে পারে *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯০৯; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩২০৮)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৭৬) : ছালাত বিশুদ্ধভাবে আদায়ের জন্য পৃথক মসজিদ নির্মাণ করায় এলাকাবাসী উক্ত মসজিদকে যেরার মসজিদ বলে আখ্যায়িত করছে। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি? কি কি কারণে কোন মসজিদকে যেরার মসজিদ হিসাবে গণ্য করা যায়?

-রবীউল ইসলাম
বেড়া, পাবনা।

উত্তর : কোন মসজিদে ছহীহ তরীকায় ছালাত আদায়ে বাধাপ্রাপ্ত হ'লে পৃথক মসজিদ নির্মাণ করা যাবে। তবে সাধ্যপক্ষে একত্রে ছালাত আদায় করাই উত্তম হবে। কারণ ইমামের সুন্নাত বিরোধী আমলের জন্য তিনিই দায়ী হবেন, মুছল্লীরা নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইমামগণ তোমাদের ছালাত আদায় করান। যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করান, তাহ'লে সকলের জন্য নেকী। পক্ষান্তরে যদি বেঠিকভাবে আদায় করান, তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী ও তাদের জন্য পাপ *(বুখারী হা/৬৯৪, মিশকাত হা/১১৩৩)*।

একই সমাজে পরস্পরের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে যদি নতুন মসজিদ তৈরি করা হয় এবং যার দ্বারা মুমিন সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি ও ক্ষতি করা উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে উক্ত মসজিদকে 'মসজিদে যেরার' বা 'ক্ষতিকর মসজিদ' বলা হয়। এরূপ মসজিদ তৈরির ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে না এবং তা তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না *(কুরতুবী,*

তাফসীর সূরা তওবা ১০৭ আয়াত; আলবানী, আছ-ছামরুল মুসতাত্বাব, পৃঃ ৩৯৮)।

প্রশ্ন (৩৭/২৭৭) : জনৈক আলেম বলেন, জুম'আর খুৎবা চলা অবস্থায় সুন্নাত ছালাত আদায় করা হারাম। এ বক্তব্য কি সঠিক?

-শামসুযযামান
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: বক্তব্যটি ভিত্তিহীন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে সে যেন বসার পূর্বে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে' *(বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪)*। একদা রাসূল (ছাঃ)-এর জুম'আর খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় সুলাইক গাতফানী নামক জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সুন্নাত না পড়েই বসে পড়েন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, হে সুলাইক! দাড়াও এবং দু'রাক'আত ছালাত পড়ে বস। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের খুৎবারত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় ব্যতীত না বসে। *(মুসলিম হা/৮৭৫; মিশকাত হা/১৪১১)*।

প্রশ্ন (৩৮/২৭৮) : আমি দর্জির কাজ করি। মেয়েরা আমার নিকট থেকে টাইটফিট পোশাক তৈরী করে নেয়। এ জন্য কি আমি দায়ী হব?

-উজ্জ্বল মিয়াঁ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।
**[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : নগ্নতা প্রকাশক ও যৌন উদ্দীপক যেকোন পোষাক পরিধান করা হারাম *(মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪)*। একইভাবে তা তৈরী করাও হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা সৎ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর আর গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না *(মায়েদাহ ৫/০২)*। মেয়েদের টাইটফিট পোশাক তৈরী করে দেওয়া অন্যায় কাজে সহযোগিতার শামিল। অতএব এসব হ'তে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩৯/২৭৯) : আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ গ্রন্থে তাবূক যুদ্ধের ময়দানে রাসূল (ছাঃ)-এর সে সারগর্ভ ভাষণ সংকলিত হয়েছে, তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি?

-রেযওয়ানুল ইসলাম
তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তর : তাবূকের ময়দানে সমবেত সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্য রাসূল (ছাঃ) যে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেছিলেন তা বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৩/৪৭৩-৭৪; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৫/১৩-১৪; মুবারকপুরী, আর-রাহীক্ব ৪৩৫ পৃঃ)*। কিন্তু এর সনদ ছহীহ নয়। ভাষণটি সম্পর্কে ইবনু কাছীর বলেন, হাদীছটি 'গরীব'। এর মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক (نكارة) কথা রয়েছে এবং এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে' *(আল-বিদায়াহ ৫/১৪)*। আলবানী বলেন, এর সনদ 'যঈফ' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৫৯)*। আরনাঊত্ব বলেন, এর সনদ 'অতীব দুর্বল' *(যাদুল মা'আদ ৩/৪৭৪- টীকা)*।

সনদের বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও বক্তব্যগুলি বিভিন্ন 'ছহীহ' হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আকরাম যিয়া উমারী বলেন, তাবূকের এই দীর্ঘ ভাষণটি বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। যদিও এর বক্তব্যগুলি বিভিন্ন হাদীছ থেকে গৃহীত। যার কিছু 'ছহীহ' কিছু 'হাসান' *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫৩৪, বিস্তারিত দ্রঃ 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)', ৫৪২-৫৪৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৪০/২৮০) : 'মুরসাল' হাদীছ শরী'আতের দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য কি?

-ওমর ফারূক
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : যে হাদীছ কোন তাবেঈ মধ্যবর্তী রাবীর নাম না করে সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তাকে 'মুরসাল' হাদীছ বলে। 'মুরসাল' হাদীছ যঈফ হাদীছের শ্রেণীভূক্ত। এ জন্য জমহূর মুহাদ্দেছীনের নিকটে মুরসাল হাদীছ সাধারণভাবে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় *(তাদরীবুর রাবী ১/১৯৮)*।

তবে শর্তসাপেক্ষে 'মুরসাল' হাদীছ গ্রহণযোগ্য হতে পারে। যেমন ইমাম শাফেঈ সহ অপরাপর ইমামগণ উল্লেখ করেছেন– ১. রাবী উঁচু স্তরের তাবেঈ হওয়া। ২. রাবী যে রাবীর কাছ থেকে 'ইরসাল'টি করেছেন তাঁকে 'ছিক্বাহ' বা বিশ্বস্ত বলে উল্লেখ করা। ৩. বিশ্বস্ত অন্য কোন রাবী'র বিরোধিতা না থাকা এবং ৪. নিম্নোক্ত চারটি শর্তের যে কোন একটি থাকা– যেমন (ক) অন্য কোন মুসনাদ সূত্রে বর্ণিত হওয়া। (খ) অপর কোন মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হওয়া। (গ) ছাহাবীর কওল দ্বারা সমর্থিত হওয়া। অথবা (ঘ) অধিকাংশ বিদ্বানের মতামতের অনুকূলে হওয়া। এ সকল শর্ত পাওয়া গেলেই কেবল মুরসাল হাদীছ দলীল হিসাবে বিবেচিত হতে পারে *(আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৬/২০৬, তায়সীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ পৃঃ ৬০)*।